~ www.amarboi.com ~

অগ্রন্থিত কায়েস আহমেদ

[*অন্ধ তীরন্দাজ*, *দিনযাপন*, *নির্বাসিত একজন* ও *লাশকাটা ঘর* বহির্ভূত
অগ্রন্থিত রচনার সংকলন]

গ্রন্থন ও সম্পাদন

প্রশান্ত মৃধা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঐতিহ্য

~ www.amarboi.com ~

অগ্রন্থিত কায়েস আহমেদ
গ্রন্থন ও সম্পাদন : প্রশান্ত মৃধা

প্রকাশক
আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১৬
ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
তিনশত টাকা

AGRANTHITO KAYES AHMED
edited by Prasanta Mridha.
Published by Arifur Rahman Nayeem
Oitijjhya.
Date of Publication : February 2010.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright@2010 Anik Ahmed. All rights reserved,
including the right of reproduction in
whole or in part in any form.

Price: Taka 300.00 US$ 20.00
ISBN 978-9848863-23-7

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

কামাল বিন মাহতাব
শাকের চৌধুরী
শ্রদ্ধাভাজনেষু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই গ্রন্থন

কায়েস আহমেদের (১৯৪৮-৯২) আত্মঘাতী প্রয়াণের পরে এমন একটি গ্রন্থের সম্ভাবনা সহজে হয়ে ওঠার ছিল না এই জন্যে, খুব কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত হয় *কায়েস আহমেদ সমগ্র* (১৯৯৩)। এ বইটিই হয়ে উঠতে পারত কায়েস আহমেদের মুদ্রিত তাবৎ লেখার সংকলন, এক খণ্ডেই। তা হয়নি। যে কোনো কারণে হোক তা আর হয়েও উঠল না। সে-বই তো এক অর্থে কায়েস আহমেদের জীবৎকালে গ্রন্থিত সৃষ্টিশীল রচনারই সংকলন। অগ্রন্থিত রচনা সেখানে তেমন ছিল না, ওই সংকলন হয়ে ওঠার সেই মুহূর্তে তার সম্ভাবনাও খুব ছিল না, হয়ত। পরেও আর কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। কিন্তু যে কোনো সৃষ্টিশীল লেখকেরই গ্রন্থনের উপেক্ষায় ও অপেক্ষায় থাকে আরও লেখা। জীবদ্দশায় লেখকের অনুমোদনে ব্যর্থ আর নিজের পরিকল্পিত বইটির জন্যে বাকি প্রয়োজনীয় লেখা লিখে উঠতে না-পারা—এরই ফাঁক গলে থেকে গিয়েছিল এইসব রচনা। সেগুলো একত্র করে এই *অগ্রন্থিত কায়েস আহমেদ*।

এই বই হয়ে উঠল জিয়া হাশান, মাসুদ রহমান আর শুভেন্দু ইমামের সংগ্রহ আর সদিচ্ছায়, আর নিজের সংগৃহীত কিছু লেখা নিয়ে। সম্পাদক তাই এক অর্থে আয়োজক মাত্র। কেননা, তাঁদের সংগ্রহ থেকে কায়েস আহমেদের অনেকগুলো পুরনো লেখা হাতে তুলে দেয়ার পরে এই বই না-হওয়ার আর প্রায় কোনো কারণই থাকে না। থাকার কথাও না।

ফেব্রুয়ারি ২০০৬-এ প্রকাশিত *কামাল বিন মাহতাব সম্পাদিত ছোটগল্প নির্বাচিত সংকলন*-এর কাজ যখন এগিয়ে চলছে, ২০০৪-এর শেষ ও ২০০৫ জুড়ে—সেই সময়ে এই সংগ্রহ আর বাছাইয়ে নিযুক্ত থাকাকালীন জিয়া হাশান একদিন জানালেন, *ছোটগল্পের* প্রায় সব ক'টি সংখ্যা আছে তাঁর কাছে, আমি চাইলে কায়েস আহমেদের অগ্রন্থিত রচনার একটি সংকলন সম্পাদনা করতে পারি।

পিছনে ফিরে জিয়া হাশানের পক্ষ থেকে সায় দেয়ায় দুটো কারণ ভেবে নিতে পারি। ২০০৩-এ এমন যোগাড়যন্ত্র করে বের করেছিলাম আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অগ্রন্থিত রচনার এক সংকলন ; দ্বিতীয় কারণ : এর কিছু পরে, কায়েস আহমেদের পুরনো দুটো অগ্রন্থিত রচনা ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিকের পৃষ্ঠায়—জিয়া হাশান হয়ত এই থেকে নিজের কাজের ভার আমার হাতে চাপিয়ে দিলেন। এই লেখা দুটোর একটি, কামাল বিন মাহতাব সম্পাদিত *ছোটগল্পে* কায়েস আহমেদ গৃহীত হাসান আজিজুল হকের সাক্ষাৎকারসহ স্বাধীনতা পরবর্তী দুটো সংখ্যার খোঁজ আমাকে তখন দেন শুভেন্দু ইমাম।

আর, বেশ আগে, *ভোরের কাগজে* কায়েস আহমেদের অগ্রন্থিত একটি উপন্যাসের হদিস জানিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন মাসুদ রহমান। তাঁকে এমন একটি গ্রন্থের পরিকল্পনা ও বিন্যাসের কথা জানাতেই তিনি সাগ্রহে দিয়ে দিলেন *কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ* ও এর সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক রচনা।

~ www.amarboi.com ~

এই গ্রন্থনের মুখে জিয়া হাশান, মাসুদ রহমান আর শুভেন্দু ইমামের প্রতি জ্ঞাপন করছি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

২

মাঝখানে আরও কিছু কাজ থেকে যায়। সেই কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছেন জিয়া হাশান, নিজের কাজের মতো করে। কায়েস আহমেদের আত্মীয় বেলায়েত হোসেন নীলুর সঙ্গে যোগাযোগের সেতু তিনি রচনা করেন। সেই সূত্রেই কায়েস আহমেদের একমাত্র সন্তান অনীক আহমেদ এই সংকলন প্রকাশের অনুমতি দেন। হয়ত দূর থেকে এমন একটি গ্রন্থের প্রতীক্ষা ও প্রকাশের আগ্রহ আমাদের সকলের ভেতরেই ছিল, জিয়া হাশান সেখানে প্রধান আয়োজকের কাজ করেছেন। আর আরিফুর রহমান নাইমকে জানানোমাত্রই এই বই প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়ে তিনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এই গ্রন্থনে বিভিন্নভাবে যুক্ত থেকে, পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন : সুশান্ত মজুমদার, তুষার কর, আহমাদ মোস্তফা কামাল, জফির সেতু, মোস্তাক আহমাদ দীন, মাহবুব মোর্শেদ, আবদুল কুদ্দুস খান ও জাঈদ আজিজ প্রমুখ।

৩

পরিশিষ্টে কামাল বিন মাহতাব রচিত 'চলে যাওয়া' এবং সুশান্ত মজুমদারের 'খঞ্জ মানুষ ও মৃত্যুর উৎসব'— এই লেখা দুটো নেয়া হয়েছে এক কথায় সম্পাদকীয়র বিকল্প হিসেবে। দুটো লেখা দুই ধরনের। একটিতে ব্যক্তি কায়েস আহমেদ, অন্যটি কায়েস আহমেদের গ্রন্থিত কথাসাহিত্যের আলোচনা। সাহিত্যচর্চার একেবারেই সূচনা থেকে কায়েস আহমেদ *ছোটগল্প* সম্পাদক কামাল বিন মাহতাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের সম্পর্ক অটুট ছিল দীর্ঘ কাল। সুশান্ত মজুমদারের সঙ্গে কায়েস আহমেদের ঘনিষ্ঠতা ছিল আমৃত্যু। এই দুটো লেখাতে কায়েস আহমেদ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবেন। এই বিবেচনায় সম্পাদক নতুন কথা জুড়তে অনাগ্রহী। দুটো লেখাই নেয়া হয়েছে কায়েস আহমেদের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ সুশান্ত মজুমদার সম্পাদিত *কায়েস আহমেদ : নিরাবেগ বোঝাপড়া* (১৯৯৪) থেকে।

একটু তফাতে দাঁড়ালে মনে হয়, *অগ্রন্থিত কায়েস আহমেদ* নতুন কথার সূচনা করবে। এই বইয়ে এতদিন পাঠকের দৃষ্টির বাইরে আর জনরুচির বিপরীতে নিরন্তর নিরাবেগ বোঝাপড়ায় থাকা কায়েস আহমেদ নতুনভাবে আবিষ্কৃত হবেন। আমাদের তো জানা আছে, জীবন আর সাহিত্যের ভেতরে কায়েস আহমেদ কোনো ফাঁক রাখেননি। সেই পরিচিত কায়েস আহমেদকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে এই বই সম্পূরক হয়ে উঠলে এই উদ্যোগ সার্থকতা পাবে।

প্রশান্ত মৃধা

মাঘ ১৪১৬
ফেব্রুয়ারি ২০১০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচি

উপন্যাস

কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ ১৩

গল্প

ফেরারি বসন্তকে খুঁজে ২৯
প্রতারক জোস্‌না ৩২
অপূর্ণ তুমি ব্যর্থ বিশ্ব ৩৮
প্রতীক্ষিত লণ্ঠন ৪৩
নচিকেতাগণ ৪৭
পারাপার ৫৩
নৈঃশব্দ্যের ভার ৫৭
গোপাল কামারের তলোয়ার ৬২

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

ক্ষুধার্ত জাগুয়ার ৮১
ছোটগল্পের দুঃসময় ৮৮
আমি ও আমার লেখা ৯১
আমার লেখা ৯৩
কঠিন মাটি ও শক্ত ফ্রেম ৯৪
নিজের সঙ্গে আলাপ ৯৭
লিটল ম্যাগাজিনের সমস্যা ৯৯
হাসান আজিজুল হক ১০১
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১০৫
প্রতিকৃতি আত্মপ্রতিকৃতি ১০৮
স্বপ্ন আশার আসমানদারি ১১১
শিল্পের দাবি, শিল্পীর দায় ১১৪
ঘূর্ণির টান ও নিরাবেগ বোঝাপড়া ১১৯
সাহিত্যে বাস্তবতা ১২৫
রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী ১২৮

গ্রন্থালোচনা

চাবি খুঁজছি গো মহারাজ ১৩৫
আত্মজৈবনিক প্রতিকৃতি ১৩৮
'হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোন খানে' ১৪৩
চলো যাই পরোক্ষে ১৪৫

আমার বই
বুলবুলির পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতা

বোঝাপড়া ১৫১
বউ ১৫২
চোখ ১৫৩
পাখিরা সব জানে ১৫৪
কাকে খোঁজো ১৫৫
নিজের সঙ্গে কথা ১৫৬
দ্বৈরথ ১৫৭
দুপুর ১৫৮
কুষ্ঠব্যাধি ১৫৯

গৃহীত সাক্ষাৎকার

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : রংবাজ ফেরে না ১৬৫
শওকত আলী : অন্ধকারে ঘোড়সওয়ার ১৭৪
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : অফুরন্ত অন্ধকারে মরাচাঁদ ১৮২
হাসান আজিজুল হক : ক্ষমাহীন বিশ্বের স্থপতি ১৯০

পরিশিষ্ট

১ ক : চলে যাওয়া ‖ কামাল বিন মাহতাব ২০১
১ খ : খঞ্জ মানুষ ও মৃত্যুর উৎসব ‖ সুশান্ত মজুমদার ২২১
২ : পাঠপ্রসঙ্গ ২২৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ

ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে মেজো ছেলে তার বউকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেলেন জায়গাটা। কিছুটা অস্থিরতা বোধ করছেন, কেমন যেন একটু গ্লানি। অন্যমনস্ক হলেও খোলা জানালার দিকে তাকানো তাঁর মোটেও উচিত হয়নি— ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তাদের বিয়ে হয়েছে, এখন তো সব সময় সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে।

তা ছেলে বউ-এরই বা কী কাণ্ড, এমন অসময়ে, এই সন্ধ্যাবেলা দরজা জানালা খোলা রেখে— নাহ, দু'জনেই একদম পাগল, ছেলেমানুষ। যেন সস্নেহ প্রশ্রয়ই দিলেন মনে মনে।

ব্যাপারটাকে মনে মনে বিচার করে কিঞ্চিৎ স্বস্তিই পাচ্ছেন, যা হোক ছেলে বউ পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে ! না হলে এমন অসময়ে অপ্রয়োজনীয় কারণে এ দিয়ে পরস্পরের প্রতি মমতা, টান, ভালোবাসা যাই বলো না কেন প্রমাণিত হয়। অস্বস্তি কেটে গিয়ে তৃপ্তি বোধ করছেন তিনি। যেন আশঙ্কা ছিল এতদিন যেন এই মাত্র সে আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে।

অন্ধকারের দিকে চেয়ে মনে মনে বললেন, কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, কিংবা নিজের বিশ্বাসের উদ্দেশ্যেই ওরা যেন সুখী হয় !

হুঁ, সুখ ! বড় অদ্ভুত জিনিস, বড় লাজুক, বড় দাসী, পৃথিবীতে অশেষ দুঃখ। পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা-হানাহানি, দেশ ভাগ, তারপর ৭১-এর ন'মাস— জীবনে তো আর কম দেখলেন না। প্রফেসর চক্রবর্তী বলতেন, দেখো চৌধুরী ! সুখ এক ধরনের ইননোসেন্স, যেমন ধরো একটি শিশু, সবচেয়ে সুখী সে, কেননা সে পৃথিবীতে প্রথম এসেছে, এর জটিল রহস্য কিছুই জানে না, সে জন্যে তার হাসি এমন মন কেড়ে নেয়, কেননা সেই হাসির ভেতর লুকিয়ে রয়েছে তার ইননোসেন্স। অথচ তুমি, আমি, আমরাও একদিন শিশু ছিলাম, তা সত্ত্বেও এখন আর অমন করে হাসতে পারব না। কেননা আমাদের অভিজ্ঞতা— দিনে দিনে সময় কিছু সাধারণ বোধ আমাদের ভেতর দিয়ে দেয়, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, জগৎ জীবন এবং অনুভূতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। এই বোধ বা অভিজ্ঞতা

পুনরায় পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটু একটু করে আমাদের ভেতরের ইননোসেন্সকে গলা টিপে মেরে ফেলে কাজেই মানুষের দুঃখের শেষ নেই। তবু মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে, বেঁচে থাকতে হয়, এর মধ্যেই মানুষ একটু না একটু জায়গা করে নেয়। কোথাও না কোথাও তার ইননোসেন্সকে বাঁচিয়ে রাখে, হয়ত শিশুর মতো নয়, কিন্তু সে-ও এক ধরনের ইননোসেন্স, কিংবা তো তার খুব গভীরে সেই শিশুই থেকে যায়।

নিজের ছেলে, বউকে তাঁর এই মুহূর্তে মনে হলো দুটি ইননোসেন্স শিশু।

ভাবতে গিয়ে অদ্ভুত এক ধরনের স্নেহ এবং সুখ অনুভব করলেন আবার। ওরা বেঁচে থাকুক, সুখী হোক।

দেখলেন তিনি উঠোনোর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন ঘরের দিকে।

২

ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকলেন চুপচাপ। নিজের মেয়েটার কথা মনে হচ্ছে তাঁর মেয়েটা এখন রান্না ঘরে। মার কাজে সহযোগিতা করছে।

দু'ছেলের পর মেয়ে। মেয়েটা হবার পর ওর মার বাঁচার আশা ছিল না। এক দিকে রোগী এক দিকে কচি বাচ্চা। ছেলে দুটো তখন নিতান্তই ছোট। কী নিদারুণ অবস্থা ! আর মেয়েটাও হয়েছিল তেমনি জেদি। সারারাত ঘুমুত না। চিৎকার করে কাঁদত। কোলে নিয়ে পায়চারি করতে হতো রাত জেগে। দিনের পর দিন। সেই মেয়ে বড় হলো, কথা শিখল, বেণি দুলিয়ে স্কুলে যেতে লাগল, বি. এ.-ও পাস করল, তারপর... দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

— ওমা, আব্বা কখন ফিরলে ? একটুও জানতে পারিনি তো ?

আশফাক চৌধুরী মেয়ের দিকে তাকালেন, এই তো মা, অল্প কিছুক্ষণ আগে, বোস, তোর কথাই ভাবছিলাম।

— আমার কথা ? চা দেব আব্বা ?

— নাহ, চা খেতে এখন ভালো লাগছে না। বিকেলবেলা তো চা খেয়েই বেরিয়েছিলাম তারপর এর সঙ্গে, মানে তোর বন্ধু প্রণতির বাপের সঙ্গে দেখা, ভদ্রলোক দেখি নাতিকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়েছে।

— প্রণতি এসেছে শ্বশুর বাড়ি থেকে ? দেখেছ, আমার সঙ্গে দেখা তো করেইনি, খবরটা পর্যন্ত জানায়নি।

— আহ শোন তো আগে, আজই মোটে এসেছে বিকেলবেলা, সঙ্গে সঙ্গে দেখা করে কী করে ! তা ভদ্রলোক নাতিকে নিয়ে দেখি পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে বাদাম কিনছে, আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, তারপর বসে বসে গল্প করতে করতে সে আর বলিসনি, দু'বুড়ো মিলে বাদামগুলো সব... হা হা হা— কথা শেষ না করে হাসতে লাগলেন।

পুনরায় পাবে এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাপের সে হাসিতে মেয়েও যোগ দেয়, আহা বেচারি ছেলে মানুষের বাদামগুলো তোমরা সব খেয়েছ।

বেশ লাগছে। মেয়েকে নিয়ে সরল, সুন্দর সুখী, নির্মল একটা মুহূর্ত গড়তে পেরে মনটা ভরে যাচ্ছে। মেয়ের হাসি হাসি মুখটা দেখে তৃপ্তি পাচ্ছেন তিনি।

৩

রান্না ঘর থেকে শাশুড়ি— বউ সে হাসি শুনল। ও ঘর থেকে মেজো ছেলে। সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে ছোট ছেলে।

মেজো বউ মিলি শাশুড়িকে বলল, আব্বা এমন হাসেন মনেই হয় না বুড়ো হয়েছেন। শাশুড়ি কোনো উত্তর দেন না, মনে মনে ভাবেন, তাঁর বাপ বলতেন, ছেলেটার হাসি বড়ো পরিষ্কার অমন করে সবাই হাসতে পারে না। সে সেই কবেকার কথা ! বউ-এর মুখের দিকে তাকান এক পলক, ওর মতোই বয়স তখন কিংবা তার কিছু কম হবে। সেই সব দিন, কেমন— স্বপ্নের মতো মনে হয়। ভাবতে ভাবতে বুঝি আনমনাই হয়ে যাচ্ছিলেন।

ছোট ছেলে রান্না ঘরে ঢুকে বলে, আমার চা দাও।

— এতক্ষণ কোথায় ছিলে, সময় মতো এসে খেতে পারো না ?

মার কথার উত্তর না দিয়ে মেজো ভাবিকে বলে, কী, মেমসাহেব বুঝি খেয়ে ফেলেছ।

মিলি তখন মিটসেফ-এর ভেতর থেকে পাটিসাপটার বউলটা বার করতে করতে বলে— বয়ে গেছে আমার তোমার চা খেতে।

— ওহ, পাটিসাপাটা ? গ্র্যান্ড, ওয়ান্ডারফুল। পিঁড়ি টেনে বসতে বসতে বলে নারকেল দিয়েছ ?

— নারকেল তুই এনে দিয়েছিলি ? টিপুর কথাকেই ভেংচে মা বলেন, নারকেল দিয়েছ হচ্ছে এখন।

টিপু হতাশ করুণ মুখে বলে, নারকেল দাওনি ?

মিলি কৌতুক বোধ করে, হাসে মুখ টিপে, বলে, শুনছ তো নারকেল কোথা পাব ? আমরা বাজারে গিয়ে আনব ?

— ধুস, তা হলে খাব না।

বাসন ঠেলে উঠে পড়তে যায়।

— আছে রে বাঁদর খেয়ে দেখ না !

মার কথায় হাসি হাসি মুখে আবার বসে, বাসন টেনে নেয়।

তখন ছবি নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়ায়— এ্যাই তুই যে বাইরে থেকে এসে সোজা খেতে বসলি, হাত পা ধুয়েছিস।

— বারে, আমি কি জানি নাকি যে পাটিসাপটা, আমি মনে করি চা...

~ www.amarboi.com ~

— আমি মনে করি চা ? পাটিসাপটা না হলে হাত পা ধুয়ে খেয়ে বসতে হবে না ?

ঠোঁট টিপে হাসি চেপে শাসনের ভঙ্গিতে বলে।

টিপুর উত্তর এবং ওর বিপন্নতায় মিলিয়ে হেসে লুটোপুটি খাওয়ার অবস্থা।

মা নিঃশব্দে হাসেন, তোরা আর জ্বালাসনি বাপু...

৪

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছবি দেখল, জ্যোৎস্না থইথই করছে চারপাশে। বেনো জলের মতো সেই নীল নীল নরোম জ্যোৎস্না ঘরের ভেতর ঢুকেছে। মনে হয় যেন আঁজলা ভরে তোলা যাবে।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল তার। আব্বার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল, নদীর ধার থেকে মিলের রেল লাইনের উঁচু সড়কের ওপর উঠে এসেছিল তারা, আর এমনি আর জ্যোৎস্না উঠেছিল তখন। সেই জ্যোৎস্নায় রেল লাইনের গায়ে জমিয়ে রাখা নুড়ি পাথর দেখে ওর কৌতূহল হয়েছিল, অমন সাদাটে মসৃণ গোল গোল ধরনের পাথর সে কোনোদিন দেখেনি, সেই অজস্র নুড়ি পাথরের ওপর জ্যোৎস্না পড়ে তাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। লোভীর মতো পাথর কুড়িয়ে তার ছোট্ট ফ্রকের কোঁচড় ভরিয়ে ফেলেছিল। আব্বা বলেছিল, কী হবে ওসব ?

সে বলেছিল, কী সুন্দর ! আমার খেলা ঘরের রসগোল্লা-পান্তুয়া হবে।

আব্বার কথা মনে হতেই আজ সন্ধ্যার কথা মনে এল, সন্ধ্যা বেলা রান্না ঘর থেকে ফিরতে গিয়ে দেখেছিল, ছোট চোখ বন্ধ করে আব্বা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ শোয়া হয়ে বসে রয়েছে চুপচাপ। তাকে দেখে আব্বা বলেছিল, বোস, তোর কথাই ভাবছিলাম।

সে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। এমন হয়েছে তার মন, সামান্য একটুতেই সজাগ আর উৎকর্ণ হয়ে যায়। মনে পড়ে সে তখন প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলেছিল তোমায় চা দেব আব্বা !

তারপর কথা ঘুরে গিয়েছিল অন্য দিকে। প্রণতির কথা উঠেছিল, প্রণতির ছেলের কথা, বাদাম খাওয়ার প্রসঙ্গ এবং হাসি।

ব্যাপারটাকে ছবি আর একবার ভাবতে চাইল, উল্টেপাল্টে দেখতে চাইল কোথাও কোনো টুকরো পড়ে আছে কি না যা তার সঙ্গে অন্যভাবে সম্পর্কিত ! 'তোর কথাই ভাবছিলাম।' কী ভাবছিল আব্বা তার কথা। আচ্ছা এমন তো হতে পারে, প্রণতির ছেলেকে দেখে নিজের মেয়ের কথা মনে এসেছে আব্বার। প্রণতি তার বান্ধবী। প্রণতির বিয়ে হয়েছে। শ্বশুর বাড়ি থেকে প্রণতি বাপের বাড়ি ফিরেছে। প্রণতির বাবা নাতির হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে।

আর তার মেয়ে বি.এ. পাস করে সময় কাটে না বলে মাস্টারি নিয়েছে, তিনি একা একা বেড়াতে বেরোন সন্ধ্যায়।

~ www.amarboi.com ~

ম্লান একটুখানি হাসি ঠোঁটের ওপর খেলে যায়। বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে আসে। আব্বা সবাইকে সুখী দেখতে চায়। বড় ভাই ভাবি যেদিন এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল ঢাকায়, সেদিন আব্বা থম ধরে থেকেছিল সারাদিন। রাতের বেলা খেতে বসে বলেছিল, যা হোক, যেখানেই থাকুক, সুখে থাকুক।

৫

বাথরুম থেকে ফিরে ঘরের দরজা লাগিয়েই মিলিকে জড়িয়ে ধরে আলতাফ। আহ ! থমো না, তুমি কথা শেষ করতে পার না, আলতাফের মুখের ভেতর তার ঠোঁট চাপা পড়ে গেল।

এমনই হয়, মিলির জানা। বাথরুম থেকে ফিরে ঘরের দরজা লাগিয়ে আলতাফ এমনি করে জড়িয়ে ধরবে, এমনি করে সে কপট ধমক দেবে। আলতাফ কোনো কথা বলবে না। সাপটে ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে।

আজো তেমনি তাকে প্রায় শূন্য করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ফেলল।

৬

পাশাপাশি দুটো খাট একটু দূরত্ব রেখে। এ খাট থেকে আশফাক চৌধুরী আবছা অন্ধকারের ভেতর স্ত্রীকে ডাকলেন, ঘুমিয়ে পড়েছ ?

কোনো সাড়া পেলেন না। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলেন, দেখলেন, খোলা জানালার বাইরে জ্যোৎস্না, সেই জ্যোৎস্না স্ত্রীর শরীর এবং মুখের একাংশে এসে পড়েছে। আধো অন্ধকার আধো জ্যোৎস্নার ভেতর স্ত্রীকে দেখতে দেখতে তাঁর বিচিত্র অনুভূতি হতে লাগল, মনে হলো, এই যে প্রৌঢ়া মহিলাটি কিঞ্চিৎ স্থূল, এখন কাত হয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে, যাকে নিয়ে আজ দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর সংসার করছেন তাকে [লয়ে] বহুদিন ধরে ভালো করে চেয়ে দেখেননি, প্রথম জীবনের তরুণীটি, প্রায় কিশোরীই বলা চলে, ধীরে ধীরে বয়স বেড়েছে, শরীর শিথিল হয়ে এসেছে, চুলে পাক ধরেছে, ভারি অদ্ভুত লাগে তাঁর, মনে হয় এ রমণী কী যেন তিনি চেনেন না। চুপচাপ পড়ে পড়ে দেখতে লাগলেন, নিশ্বাসের শব্দ শোনেন এই নির্জন ঘরে স্ত্রী ঘুমুচ্ছে আর তিনি একা একা জেগে রয়েছেন, এর ভেতর যেন কিছু একটা অভাব অনুভব করলেন, যেন কী একটা ছিল, অনেক দিন গত, অন্যমনস্কতায় যেন তা কখন ছোঁয়া গেছে। তিনি জানেন না, কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান, ভীষণভাবে ইঙ্গিত কিছু। কেমন বিপণ্নতা বোধ করেন মনে মনে। ছেলেমেয়ের কথা ভাবলেন— ছেলেমেয়েরা যা বড় হয়ে গেছে। দু'ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। বড় ছেলে মোটা দরের চাকরি করে। রাজধানী শহরে বউ নিয়ে থাকে। মেজোটা আই. এ. পাস করে আর পড়ল না। তাকে দোকান করে দিয়েছেন। বউ নিয়ে বাড়িতেই থাকে। ছোট ছেলেটা নতুন কলেজে ঢুকেছে। একমাত্র মেয়ে ছবি। বি. এ. পাস করে মাস্টারি করছে, প্রয়োজনে নয়, শখেই বলতে হবে। মেয়েটার জন্যেই যা

পুনরায় পড়েছে এক হও

~ www.amarboi.com ~
একটু দুঃখ কিসে না কিসে চোট পেল মনে, একেবারে বেঁকে বসল। বহুবার চেষ্টা করেছেন বিয়ে দিতে রাজি করাতে পারেননি। তারপর ও প্রসঙ্গে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন, না, মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবেন না। ছেলেমেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর কোনোদিন তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। তবে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা হয়, নিজে বুড়ো হচ্ছেন, অনূঢ়া মেয়ে, যতই সে স্বাবলম্বিনীই হোক না কেন, তবু মেয়ে, তিনি চোখ বুজলে মেয়েটার কী অবস্থা হবে। এই চিন্তাটাই তাঁকে পীড়া দেয়, তাছাড়া বলতে গেলে তিনি সাকসেসফুল। অন্তত এদেশের অ্যাভারেজ সাকসেসফুল পিতার কথা ধরলে তিনি তা-ই।

কিন্তু তবু একটা কিছু তিনি যেন হারিয়ে এসেছেন, এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অজান্তে কখন কী যেন খোয়া গেছে তাঁর। স্ত্রীর দিকে তাকালেন আবার। তেমনি আবছা অন্ধকার এবং জ্যোৎস্নার ভেতর মুখের একাংশ দেখতে পাচ্ছেন। শরীরের স্থূল রেখাটা চোখে পড়ে। কী প্রগাঢ় নিশ্চিন্ত ঘুম !

প্রথম জীবনের কথা মনে পড়ে। ভীষণ ঘুম কাতুরে ছিল আমেনা, তাঁর স্ত্রী। কতদিন তিনি দেশলাইয়ের কাঠিতে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে খুনসুটি করেছেন !

চেয়ে থাকতে থাকতে এক ধরনের আবেগ অনুভব করলেন তিনি। খাট থেকে নেমে স্ত্রীর শিথানের কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন, আনু !

কোনো সাড়া পেলেন না। মনে মনে একটু হাসলেন, যেন প্রথম জীবনের স্মৃতিকে স্মরণ করেই।

এবার হালকাভাবে চুলের ওপর হাত বোলালেন, মুখের ওপর আরো একটু ঝুঁকে খুব নরম গাঢ় স্বরে ডাকলেন, আনু !

আমেনা বেগম চোখ মেলতেই দেখলেন স্বামীকে, অভ্যাস বশে গায়ে কাপড় চোপড় টেনে উঠে বসলেন, কী হলো ?

স্বামী আশফাক চৌধুরী হাসি হাসি মুখে চেয়ে রয়েছেন, না, ঘুম আসছিল না, তাই ডাকলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি !

ঘুম থেকে এইমাত্র জাগলেও আমেনা বেগম অবাক হয়েছেন বৈকি ! এত রাতে স্বামীর ঘুম আসছে না বলে একেবারে খাট থেকে নেমে তাঁর শিথানের কাছে এসে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে অমন স্বরে তাঁকে ডাকছিলেন, তাছাড়া সেই আধো অন্ধকার আধো জ্যোৎস্নায় স্বামীর চোখে মুখে কী দেখলেন কে জানে ! একেবারে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

স্ত্রীর সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আশফাক চৌধুরী নিঃশব্দে হাসলেন, বড় মর্মান্তিক হাসি ! স্ত্রীর বিছানার ওপর বসে আমেনা বেগমের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, স্ত্রীর একখানা শিথিল হাত তুলে নিলেন কোলের ওপর। আমেনা বেগমের বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটে না, বললেন, কী হলো তোমার ?

আশফাক চৌধুরী বাইরে জ্যোৎস্নার দিকে চোখ রাখলেন, তারপর স্ত্রীর হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে বললেন, আনু, আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বুড়ো হয়ে গেছি তাঁর কথা বুঝি কিঞ্চিৎ কেঁপে গেল। আমেনা বেগম স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন, কোনো কথা বললেন না, এবার আর বিস্ময় নয়, বুকের ভেতর ভার অনুভব করলেন তিনি। অতঃপর দু'জন একসঙ্গে জানালার বাইরে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে বসে থাকলেন চুপচাপ

৭

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল টিপুর। কান খাড়া করে শব্দটা শুনতে চাইল। বুবুর ঘরের দিক থেকে মনে হলো। বুবু দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছে। সে চুপচাপ পড়ে থাকল। হেঁটে যাওয়ার শব্দ হলো। বুবু রক থেকে উঠোনে নামল।

ছবির ঘর তার ঘর পাশাপাশি। বড় ভাই থাকতে এ ঘর ব্যবহার করত। সে তখন বুবুর ঘরেই শুত। বড় ভাই ঢাকায় চলে গেল, আর তাছাড়া সে এখন বড় হয়েছে, বড় বোনের সঙ্গে থাকতে তার নাকাচ হয়। বড় ভাই ভাবি এলে এ ঘর তাকে ছাড়তেই হয়। তখন সে আর বুবুর কাছে যায় না। ঢাকা বারান্দার এককোণে পার্টিশন দিয়ে দিব্যি ছোটখাটো একখানা ঘর বানিয়ে নিয়েছে সেখানে একটি চৌকি, বুক শেলফ, ছোট্ট একখানা টেবিল, একটা চেয়ার, তার খেলার জিনিসপত্র সাজানো।

হঠাৎ মনে হলো বুবু অনেকক্ষণ বাইরে বেরিয়েছে, এতক্ষণ পরেও ঘরে ঢোকার শব্দ না পেয়ে তার ভীষণ কৌতূহল হলো। আস্তে আস্তে দরজা খুলে সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে স্তম্ভিত হয়ে যায়। দেখে, রকের সিঁড়ির ওপর গালে হাত দিয়ে বুবু জ্যোৎস্না থইথই করা উঠোনের কোণের ডালিম গাছটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে রয়েছে।

ভীষণ কষ্ট হতে থাকে। বুবুকে সে সবচেয়ে ভয় করে আবার সবচেয়ে বেশি ভালোও বাসে। বুবুর ব্যাপারটা টিপু জানত। বুবু বড় দুঃখী।

এখন মনে হচ্ছে এতদিন সে তার স্বাভাবিক ধারণা দিয়ে যতটুকু বুঝেছে তা যেন কিছুই নয়, শুধুমাত্র ধারণা—আজকের এই নির্জন রাতে জ্যোৎস্নার ভেতর বুবুর এমন একাকী অসহায় ভঙ্গিতে বসে থাকার মধ্যে দিয়ে যেন এই প্রথম সে বেদনার অপার ব্যাপ্তিকে অনুভব করছে।

একবার মনে হলো যেমন করে বাইরে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে যায়, একবার মনে হলো পাশে গিয়ে বসে বুবুর মাথায় হাত রাখে। তার বুকের ভেতর টনটন করে উঠতে থাকে ; কিন্তু নড়তে পারে না। কী করবে ভেবে পায় না।

৮

দুপুরবেলা ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ শিশুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে দেখলেন বিকেল হয়ে গেছে। শুনতে পেলেন চাপা গলায় কেউ বলছে, প্রবাল চেঁচিও না, দাদু ঘুমুচ্ছে, উঠে মারবে !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুয়ে শুয়ে কথাগুলো শুনলেন, বুঝলেন, প্রণতি এসেছে ছেলে নিয়ে। শুয়ে শুয়ে কিছু চিন্তা করলেন, জরুরি কিছু যেন গুছিয়ে নিলেন মনে মনে। বিছানা ছেড়ে উঠে কাশলেন। তারপর বাইরে বেরুলেন ঘর থেকে, ওধারে রকের ওপর মাদুর পেতে রয়েছে সব। তাঁকে দেখে প্রণতি বলে, আদাব খালুজান, কেমন আছেন ?

—আর মা, বুড়ো মানুষের থাকা, তোমরা ভালো আছ তো ? ছবি ততক্ষণে উঠে লোটা ভরে সামনে এসে রাখে, তিনি, নিচু হয়ে লোটা নিতে নিতে বলেন, তোমার বাবার সঙ্গে কাল দেখা, সেখানেই জানলাম তুমি এসেছ, অবশ্য তোমার খোকাকে দেখেই বুঝেছি।

ছবি সঙ্গে সঙ্গে বলে, বাদামের কথা বললে না আব্বা ?

আশফাক চৌধুরী নিঃশব্দে হাসেন।

প্রণতি হাসি চেপে, চাপা ধমক দেয় এ্যাই ছবি !

আমেনা বেগম হাসতে হাসতে বলেন, সত্যিই তো বাপু, তোমরা বুড়ো মানুষ হয়ে কী বলে অমন করে বাচ্চা ছেলের বাদামগুলো সব খেয়ে নিলে !

এবার প্রণতি আর হাসি চাপতে পারে না।

আশফাক চৌধুরী লোটা হাতে হাসি মুখে যেতে যেতে শুনতে পান, ছবি প্রবালকে আদর করতে করতে বলছে, দাদুরা তোমার সব বাদাম খেয়ে নিয়েছে বাবু ?

টিপু বাইরে থেকে এসে থমকে যায়, বুবুর প্রবালকে আদর করা দেখে। প্রণতি তাকে দেখতে পেয়ে বলে, ওমা টিপু কত বড় হয়ে গেছে। দেখি দেখি এদিকে আয়। ছ'মাস আগে ওকে দেখেছি, এর মধ্যে এমন জোয়ান হয়ে গেছে।

টিপু খানিক লজ্জা পায়।

—বুবু, চা দে তো।

মিলি বলে, কী ভাগ্যি আজ সময়মতো লক্ষ্মী ছেলে চা খেতে এসেছে !

ছবি প্রবালের সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে বলে, যাও তো ভাবি, চা টা দিয়ে এসো তো, সেই সঙ্গে আব্বার চা টা-ও।

মিলি উঠে যায়।

আশফাক চৌধুরী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন— প্রণতি, যাবার আগে একবার দেখা করে যেয়ো তো মা। প্রণতি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়, আচ্ছা।

আশফাক চৌধুরী ঘরের ভেতর ঢুকে যান। প্রণতি এবং ছবির মধ্যে চোখাচোখি হয়। প্রবালকে নিয়ে হঠাৎ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে ছবি।

বেলা ক্রমে পড়ে আসছে। আজ আর বেড়াতে বেরুতেই ইচ্ছা করছে না। এক ঝলক হালকা বাতাস এল জানালা দিয়ে, বাইরে, জানালার ধারে পাতাবাহার গাছটায় দোলা লাগল। কাল রাতে ওখানে জ্যোৎস্না হয়ে ছিল। আজ শেষ বিকেলের কমলা রঙের রোদ।

দানবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমন সময় মিলি চা নিয়ে ঘরে ঢুকল আশফাক চৌধুরী বউ-এর মুখের দিকে চাইতে গিয়েও থেমে গেলেন মিলি চা'র কাপ, সিমাইয়ের পিরিচ টেবিলের ওপর রাখছে আশফাক চৌধুরীর মনে হলো কিছু বলা উচিত তাঁর, অথচ কিছু বলা যাচ্ছে না। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ভারি অস্বস্তিকর অবস্থা। বিছানার চাদর শুধু শুধু হাত বুলিয়ে সমান করেন, বালিশ দুটো নেড়ে চেড়ে রাখেন, মিলি ততক্ষণ গ্লাসে পানি ঢেলে টেবিলের ওপর রেখেছে। এবার চলে যাবে। আশফাক চৌধুরী একটু কাশলেন, দ্বিধাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন বুঝিবা।

অতঃপর মুখের দিকে না তাকিয়েই বলেন, ইয়ে হয়েছে, বউ মা, আলতাফ রাতে ফিরলে আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে বোলো তো

মিলি ঘোমটা তোলা মাথা অল্প একটু নেড়ে বলে, জি আচ্ছা।

খানিক অপেক্ষা করে তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আশফাক চৌধুরী যেন স্বস্তি বোধ করেন অনেকক্ষণ পর।

সিমাইয়ের পিরিচ টেনে নিয়ে খেতে শুরু করেন সিমাইয়ে মিষ্টি বেশ কড়া হয়েছে খানিকটা। তার মানে চা'র স্বাদটা মাটি হবে। সিমাই রেখে চা'র কাপে চুমুক দিয়ে তৃপ্তি বোধ করেন

চা তিনি দুধ ছাড়াই খান এ তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এক সময় প্রচুর চা খেতেন এখন কমিয়ে দিয়েছেন বয়স হয়েছে, সহ্য হয় না। রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আগে চায়ে লেবু দিয়ে খেতেন ময়মনসিংহে থাকতে ডা. আলম বলেছিলেন, লেমন-টি অ্যাভয়েড করবেন, জানেন তো লেবুতে এসিড আছে। সেই থেকে চা-এ লেবু বাদ দিয়েছেন।

প্রণতি ঘরে ঢোকে, কী খালুজান

আশফাক চৌধুরী টেবিলের ওপর কাপটা রাখতে রাখতে বলেন, এই যে মা প্রণতি, এসো বসো।

নড়ে চড়ে অল্প একটু পেছনে সরে গিয়ে খাটের ওপর হাতের ইঙ্গিতে বসতে বললেন

—তোমার খোকা কই ?

—ছবির কাছে !

আশফাক চৌধুরী বারান্দার দিককার জানালা দিয়ে দেখলেন, ছবি প্রণতির ছেলেকে কোলে করে উঠোনের ওপর পায়চারি করতে করতে হেসে হেসে কী যেন বলছে, থেকে থেকে বুকের ওপর সজোরে চেপে ধরে চুমু খাচ্ছে বারবার

সেদিকে চেয়ে তাঁর মুখ ক্লীষ্ট হয়, বুক ভার ভার ঠেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে মাথায় কাপড় তোলা প্রণতিকে দেখেন, পরিতৃপ্ত মাতৃত্বের আভামণ্ডিত স্থৈর্যময় মুখ মনে মনে ভাবলেন, মেয়েরা আসলে মা মা না হলে মেয়েদের পরিপূর্ণ রূপ খোলে না। খানিক ইতস্তত করেন তিনি, কথা হাতড়ান, কী দিয়ে শুরু করবেন ভাবেন ঘুম ভেঙে যেমন করে ভেবে রেখেছিলেন, তা যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

সুন্দরবার পড়েছে এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজের ওপর খানিকটা রাগই হয়, বুড়ো হলে কি মানুষ মনের স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে, গুছিয়ে কথা বলতেও ভুলে যায় ? প্রণতি তাঁর কথার অপেক্ষায় চুপ করে রয়েছে ভেবে বিব্রত হলো একটু যেন বলেন, বলছিলাম, তোমার বান্ধবীর কথা, ছবির কথা। কী যে হলো মেয়েটার, কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছে না। আমার বয়েস হয়েছে, আমি আজ আছি কাল নেই, তখন ওর কী হবে। হাজার শিক্ষিতা হোক, স্বাবলম্বিনী হোক তবু মেয়েছেলে ! ওর একটা ব্যবস্থা না দেখে যেতে পারলে আমি মরেও সুখ পাব না।

একটু থামলেন তোমরা এখনো ছেলেমানুষ, কণ্ঠস্বর একটু আর্দ্র হলো, বয়েস হলে বুঝবে ছেলেমেয়ে বড় হলে বাপ মায়ের যে কী দুশ্চিন্তা হয়। আবার একটু নাড়লেন, ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতায় আমি কোনোদিন হস্তক্ষেপ করি না, কিন্তু আমার তো একটা দায়িত্ব আছে, তারপর ধরো সমাজের পাঁচটা মানুষের সঙ্গে চলতে হয়, তারা সামনে না হোক পেছনে নিন্দে করে, বাপ হয়ে কেমন করে তা শুনি, আমার চেষ্টায় তো ত্রুটি নেই, কিন্তু তারা তো বুঝবে না, উপযুক্ত বাপের মেয়েকে বিয়ে না দিলে লোকে কথা বলবেই

একটানা কথা বলে তিনি থামলেন প্রণতি মাথা নিচু করে শুনছে, যেন একটু তৃপ্তি পাচ্ছেন তিনি, গোটা ব্যাপারটা তা হলে গুছিয়ে বলতে পেরেছেন মেয়েটাকে।

প্রণতি এবার মুখ তোলে, আমি তো ওকে অনেক বুঝিয়েছি, প্রত্যেক চিঠিতেই লিখি, যা হবার হয়ে গেছে, সেই কথা মনে করে নিজের জীবনকে এইভাবে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু ওর সেই এক কথা। আশফাক চৌধুরী উৎকর্ণ হন, কী বলে মেয়েটা জানতে আগ্রহী হন প্রণতি একটু থামে। চিন্তা করে নেয়, ছবির কথাগুলোই গুছিয়ে নেয় মনে মনে, ও বলে যা একবার ভেঙে গেছে তা হয়ত জোড়া লাগানো যায় ; কিন্তু আশফাক চৌধুরী চুপ করে থাকেন, ভাবেন, তাঁর আত্মজা, জন্ম দিয়েছেন তিনি, এতটুকু মাংসের একটা পিণ্ডের মতো, রাত জেগে কোলে নিয়ে পায়চারি করে করে কান্না থামিয়েছেন, সেই মেয়েকে তিনি পিতা হয়েও যেন নাগাল পাচ্ছেন না, কী জটিল, কী গভীর, কত রহস্যময়

ক্লান্ত বোধ করেন প্রণতি চুপ করে আছে। আশফাক চৌধুরী মুখ তুলে তাকান, একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ধীরে ধীরে কথা শুরু করেন, আমি আর কী বলব। আমার আর কী-ই বা বলার আছে তবু তোমাকে বলি, তুমি ওর ছেলেবেলার বন্ধু, তুমি একটু বুঝিয়ে বোলো। কী বলব বা, মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক, এত পুরনো খেলা। তবু মানুষ আশা করে, আশায় বেঁচে থাকে, এই আর কী !

প্রণতি শোনে, জীবন সায়াহ্নে এসে দাঁড়াল এক ক্লান্ত বৃদ্ধের অসহায়তাকে উপলব্ধি করে মনে মনে বিপন্ন বোধ করে কিছু বলতে না পেরে

~ www.amarboi.com ~

আশফাক চৌধুরী বোধ হয় বুঝলেন, হঠাৎ সুর পাল্টে বললেন, ঠিক আছে মা, আছ তো কিছুদিন, মাঝে মাঝে এসো তোমার খোকার সঙ্গে তো আলাপ করা হলো না কাল ওর বাদাম খেয়ে নিয়েছি। অনেকক্ষণ পর হাসলেন প্রণতি হেসে বলে যাই, পাঠিয়ে দিচ্ছি

স্ত্রী এবং মেজো ছেলেকে প্রণতির সঙ্গে আলাপের বিষয়বস্তুর আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিভ্রাট বাঁধল

আলতাফ বলে, না, এ ছবির একগুঁয়েমি, কোনো মানে হয় না, আমরা এতগুলো মানুষ বলছি আমাদের কথার একটা দাম নেই, ওর কাছে ? ওর জেদটাই বড় হলো ? কবে কী একটা হয়েছে না হয়েছে সেই ধরে বসে থাকতে হবে ? অমন আজকাল হর হামেশাই হচ্ছে তাই বলে কি সব সন্ন্যাস নিয়ে বসে আছে ? তারা ঘর সংসার করছে না ? তুমি লাই দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছ আব্বা।

—চুপ করো, বাজে বোকো না।

চমকে ওঠেন আশফাক চৌধুরী। স্ত্রী কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। আশফাক চৌধুরী বিরক্ত হয়েছেন, অবাকও কম হননি মনে করেছিলেন আলতাফ একালের ছেলে, ব্যাপারটা বুঝবে, অথচ সে তার ধার-কাছ দিয়েও গেল না, গৎবাঁধা সাধারণ স্থূল কতগুলো কথা বলল !

—বুঝেছি তোমাদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

ইজি চেয়ারে চোখ বন্ধ করে পড়ে পড়ে ভাবছিলেন তিনি। গোটা ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখছেন আলতাফ যা বলছে তা হয়ত ঠিক, এমন ঘটনা হয়ত অনেকই ঘটে, তারা সবাই সন্ন্যাস নেয় না, বিয়ে করে সংসারী হয় সব ঠিক। কিন্তু ছবির কথাটাকে তো উড়িয়ে দিতে পারছেন না। আলতাফ যা বলছে তা বাইরের দিক থেকে হয়ত সত্যি, কিন্তু বাইরের সত্যটাই তো সব নয়—একজনের কাছ থেকে চোট পাওয়ার পরও অন্যের সঙ্গে যারা ঘর বাঁধে, তারা কি সত্যিই দাগটা মুছে ফেলতে পারে, চলতে ফিরতে কি সত্যি বাঁধে না ?

এখানেই তিনি আটকে যাচ্ছেন। তখন প্রণতিকে তিনি পিতার দায়িত্বের কথা বলেছিলেন, কিন্তু কিসের দায়িত্ব ? সন্তানের সুখ, নিশ্চিন্ত— তার মানে তিনি তাঁর মেয়ে ছবিকে ফিরে দিলেন, সমাজের চোখে, মানুষের কাছে তিনি পিতার দায়িত্ব পালন করলেন ; কিন্তু মেয়েটা দাগটা মুছতে পারল না, চলতে ফিরতে, বাধতে লাগল, ওসব ? দায়িত্ব কী তার পালন করা হলো ?

ছেলের কথাবার্তাতে তিনি আর এক কারণে বিচলিত হয়েছেন— বোনের প্রতি ভাইয়ের এ ধরনের উষ্মা তাঁর ভালো লাগেনি মোটেও, তাঁর অবর্তমানে ছেলের সংসারে তাঁর দুঃখী মেয়েটার অবস্থানের ভয়ংকর অসহায় চিত্রটি কল্পনা করে বিপন্ন বোধ করেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রান্না ঘরের কাজ গুছিয়ে আমেনা বেগম এসে দেখেন স্বামী চোখ বন্ধ করে ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে পড়ে রয়েছেন তিনি ঘরে ঢোকার পরও কোনো ভাবান্তর হয় না দেখে শব্দ করেই দুধের গ্লাসটা রাখেন।

— দুধটা খেয়ে নাও।

— হুঁ, খাই

স্বামী তেমনিভাবে থেকেই উত্তর দেন।

কী করবেন তিনি ভেবে পান না এই তো জ্বালা হয়েছে তাঁর। এক দিকে মেয়ে, এক দিকে স্বামী, এক দিকে ছেলে ; মাঝখানে পড়ে তাঁর অসহায় অবস্থা। মেয়েকে জন্ম দিয়েছেন, মানুষ করে বড় করেছেন, উপযুক্ত কোথায় মেয়ের বিয়ে দেবেন, জামাই হবে, নাতি-নাতনি হবে, তাদের নিয়ে স্বাদ আহ্লাদ মেটাবেন— তা নয় কী থেকে যে কী হলো মেয়ে একেবারে বেঁকে বসল, সেই নিয়ে সমস্ত সংসার জুড়ে অশান্তি ছেলে মুখ ভার করে উঠে গেল স্বামী গুম হয়ে বসে রইল, এখন তিনি কোথায় যান।

ছবির ঘরের দরজায় এসে ধাক্কা দিল টিপু, বুবু।

ছবি ভেতর থেকেই জিজ্ঞেস করে, কীরে, টিপু ?

— দোর খোল।

দরজা খুলে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে ছবি বলে কী হয়েছে ?

— আমি তোর কাছে শোব

ছবি একটু অবাক হয় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকায়। টিপু ততক্ষণে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

— কী ব্যাপার বল দিকি ; ভয় পেয়েছিস ও ঘরে ?

টিপু কোনো উত্তর দেয় না সে কথার— যাক, এবার থেকে তোর ঘরে শোব রোজ।

অবুঝ শিশুর মতো লাগে তাকে। ছবি হাসে, তা শুবি শো, কিন্তু কী হয়েছে বলবি তো ?

— কী আবার হবে, কিছুই হয়নি

বলতে বলতে হাতে করে আনা বালিশটা গায়ের ওপর থেকে এক পাশে সটান শুয়ে পড়ে। ছবি চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে থাকে তারপর এক সময় ভাইয়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে দরজা লাগিয়ে।

রাত কটা হলো কে জানে টেবিলের ওপর রাখা রিস্টওয়াচটা উঠে আর দেখতে ইচ্ছা করে না অনেক দূর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসে। আর তারা দু ভাই বোন পাশাপাশি চুপচাপ শুয়ে থাকে। জেগে আছে, কিন্তু কথা বলে না কেউ।

টিপু ভাবে, বুবু কী ভাবছে, কে জানে, অবাক হয়েছে নিশ্চয়ই, হয়ত ভাবছে টিপু হঠাৎ কোনোভাবে ভয় পেয়েছে একলা একলা ও ঘরে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনেকক্ষণ পর টিপু কপালে, মাথায়, বুকে হাতের স্পর্শ পায় করুণ হাসি মাখা গলায় ছবি বলে, টিপু বুবুকে পাহারা দিতে এসেছিল, বুবু যদি সুইসাইড করে !

টিপু তেমনি চুপচাপ পড়ে থাকে কোনো কথা বলে না। তার বুক, গলা বোঝাই হয়ে আসছে।

জেগে জেগে ভাবছেন তিনি, সেই তখন থেকে। স্ত্রী যখন দুধের গ্লাস এনে বলে, দুধটা খেয়ে নাও

তারপর টুকরো টুকরো কথা শুরু হয়েছিল। গোটা অবস্থাটা মনে মনে গুছিয়ে নেন। হুঁ, কথাটা শুরু হয়েছিল এমনিভাবে— আচ্ছা তুমি কী বলো তো ! জোয়ান ছেলে বিয়ে হয়ে গেছে, তাকে অমন করে ধমক দিলে ? মেয়ে তো তোমার একার নয়, আমারও, আমি মা, আমি তো তোমার মতো এমন করছি না

হুঁ, তখন থেকেই চিন্তাটা মাথায় এসেছে। আরো কী-কী কথা হয়েছিল মনে নেই সব ! হয়ত চেষ্টা করলে মনে করতে পারবেন। কিন্তু চিন্তাটা মাথার ভেতর ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে শুরু করেছে তখন থেকেই, হ্যাঁ, মেয়ে তার একার নয়, তবু একা একা তিনি এত বিচলিত হচ্ছেন, কেন মেয়ের মতামতকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন।

মেয়েটা হবার পর ওর মা ভীষণ অসুখে পড়ে। সেই সময় রাতের পর রাত জেগে মেয়েকে কোলে নিয়ে পায়চারি করে কান্না থামিয়েছেন, সময় মতো দুধ খাইয়েছেন, ছেলেবেলা থেকেই মেয়েটা তার নেওটা সে জন্যে ? তিন ছেলের মধ্যে ছবি-ই তাঁর একমাত্র মেয়ে সে জন্যে ? ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা বা স্বাধীনতার ওপর কোনোদিন জোর খাটাননি। সবকিছুকে সহৃদয়ে সহানুভূতি দিয়ে দেখে এসেছেন। সে জন্যে ?

না, মনে হয় এসব নয় হয়ত এসব কারণগুলোও যুক্ত, কিন্তু প্রধান নয় আরো কিছু একটা মনের খুব নির্জনে, খুব গভীরে, অনেক স্তরের নিচে চাপা পড়ে থাকা খুব সূক্ষ্ম, তীব্র, কিন্তু অস্তিত্বময়, কোনো বোধ যেন জড়িয়ে আছে

হাতড়াতে থাকেন কী যেন একটা আছে, অনুভব করছেন কিন্তু বুঝতে পারছেন না তাঁকে যেন নেশায় পেয়ে বসে। কোনো অজানা রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত কোনো মানুষ যেমন, তেমনি চাপায় একটু উত্তেজনা বোধ করেন

দেখলেন স্ত্রী ঘুমুচ্ছে। কাত হয়ে, শিথিল, নিশ্চিন্ত, প্রগাঢ় ঘুম। দেখতে দেখতে তিনি ভাবনার ভেতর চলে যেতে থাকেন। হুঁ, তাঁর স্ত্রী, পঁয়ত্রিশ বছর তার সঙ্গে সংসার করেছেন। প্রথম জীবনেই সেই যা দিনগুলো পেরিয়ে এখন শিথিল, কিঞ্চিৎ স্থূল, চার সন্তানের একজন প্রৌঢ়া বয়সী জননী। ভাবতেও কেমন অবাক লাগে। মনে হয় খুব অন্যমনস্কতার ভেতর দিয়ে সময়গুলো পেরিয়ে এসেছেন তিনি যেন কিছু বুঝতে না বুঝতেই সব শেষ হয়ে গেল। যেন কতগুলো

শুভ্রবার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্রক্রিয়া— যেমন ঘুম, আহার, বিশ্রাম এবং আনুষঙ্গিক কতগুলো মৌলিক প্রক্রিয়ার মতো একটানা একঘেয়েভাবে কেটে গেল সময়গুলো। জীবনাচরণের একান্ত প্রয়োজনীয় অদ্যতিরোধ, উপর্যুপরি ব্যবহৃত সেই প্রক্রিয়ার মতো, আর কিছু নয়।

ভাবতে গিয়ে থমকে যান হঠাৎ মাথার ভেতর বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ঝলসে ওঠে ভীষণভাব— ঠকে গেছেন তিনি, মনে হয়, এই যে মহিলা, পঁয়ত্রিশ বছর যে তাঁর স্ত্রী হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে এ মহিলাটি তাঁর না হয়ে অন্যের স্ত্রী হতে পারত, অন্যের সংসারে গিয়ে এমনি করে সন্তানের জন্ম দিত, তাঁর মতোই অন্যের সঙ্গে দিনের পর দিন এক সঙ্গে থাকতে থাকতে সামাজিক এবং পারিবারিক কতগুলো অনুশাসনের মধ্যে বেঁচে থাকার কতগুলো স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে আবর্তিত হতে হতে গড়ে ওঠা কতগুলো অভ্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, (যেমন তাঁকে এই নিগড়ে বেঁধে ঘুরিয়েছে আজ পঁয়ত্রিশ বছর) কেবলমাত্র ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে এই-যা। অর্থাৎ বিশেষভাবে, একান্তভাবে তাঁর কেউ নয়, শুধুমাত্র কতগুলো অভ্যাস, নিজের থেকে কিছুই দেয়নি তাঁকে

অথচ তাঁর খুব গভীরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তীব্র একটি তৃষ্ণার্ত প্রত্যাশায়, একটি উন্মুখ বাসনা প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করেছে, মহিলাটি চেয়েও দেখেনি।

বুকের ভেতরে একটি বেদনা চিনচিন করে উঠল। তাঁর মেয়ে ছবি, ভাবলেন তিনি, হুঁ, তাঁর মেয়ে, প্রত্যাশায় লালন করেছিল, সাধ গজিয়ে উঠেছিল যার ভেতরে, স্বপ্ন পত্রপল্লবে গড়ে উঠেছিল, সেই স্বপ্ন তার পরিপূর্ণতা না পেলেও, তার স্মৃতি আছে, সেই স্মৃতির মধ্যে দিয়ে সে ব্যথার মতো একটি মানুষকে স্পর্শ করতে পারে, সেই ব্যথার ভেতর দিয়ে প্রতি মুহূর্তে সে অনন্তকে পাচ্ছে। আশফাক চৌধুরী ভাবলেন, তাঁর তেমন কোনো স্মৃতিও নেই। অতএব সেই অনন্তকে তিনি কোনোদিনও পাবেন না। কিন্তু স্পষ্ট যেন দেখতে পেলেন, আপনার সেই বেদনার সঙ্গে তার অসম্পর্কিত সেই বাসনাটি একাকার হয়ে মিশে রয়েছে।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ধীরে ধীরে সমস্ত শরীর তাঁর শিথিল হয়ে আসছে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেন আর শরীর সংলগ্ন নয়। মাথার ভেতর গয়না মোড়া বেল্টের মতো প্রচণ্ড গতিতে স্রোত চলছে মনে হলো এ ঘরের বাতাস ভীষণ অপর্যাপ্ত। নিশ্বাস তাঁর বন্ধ হয়ে আসছে বুকের ভেতর ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার ধপ ধপ শব্দ উঠছে।

চোখের সামনে থেকে আলো নিভে আসতে থাকলে তিনি প্রাণপণে ডাকতে চাইলেন, পারলেন না, খাটের ওপরে শুয়ে থাকা আমেনা বেগমকে মনে হলো যোজন যোজন দূরে পড়ে থাকা একটি স্তূপের মতো স্থাবর, প্রাণহীন, নিরেট ভারি কোনো বস্তুর মতো চেতনার প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে মনে হলো জ্যোৎস্না অন্ধকার হয়ে আসছে আর তার ভেতর বহু দূরে পড়ে থাকা চোখের সামনের বস্তুটি সেই জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে !

আমার বই
পুনরায় প্রকাশ এক হও

~ www.amarboi.com ~
গল্প

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফেরারি বসন্তকে খুঁজে

—ক'টা বাজল ?

—সাড়ে নয়। শুকনো গলায় উত্তর এল

ব্যস্ত হয়ে উঠল আনোয়ার। ট্রেন আসছে কি না দেখবার চেষ্টা করল সারা প্লাটফর্মের মুখ উৎকণ্ঠিত। ক'বার অস্থির পায়চারি করল, ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়াল দু'মুহূর্ত, আবার গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল—গাড়ির মুখ দেখা যাচ্ছে কি না। মনে মনে শঙ্কিত হলো হিসেব করল ; এখনো দেড় ঘণ্টা সময় হাতে আছে।

কিন্তু গাড়ি যদি আসতে আজ আরো দেরি করে ? যদি—আর ভাবতে পারে না।

না, না, সে আজ কোনো অশুভ চিন্তা করবে না। হতাশা নয় আজ শুধু প্রত্যাশা। যা অশুভ, যা অসুন্দর তাকে সে ভুলবে। বিগত দিনের সেই শূন্য হাহাকারটাকে আজ সে মনে ঠাঁই দেবে না। স্মৃতি যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, সে তার মনের দরজা বন্ধ করে দেবে।

আই. এ. পাস করার পর বাবা যেদিন বললেন : আমার যতটুকু সাধ্য আমি করেছি, এবার তোমার দায়িত্ব, আমায় রেহাই দাও, আমি ক্লান্ত। সেদিন থেকেই বাস্তবের সাথে আনোয়ারের গাঁটছড়া বাঁধা পড়ল। জীবনের নিষ্ঠুর চেহারা দেখে দিনে দিনে সে শিউরে উঠেছে

কিন্তু মানুষের হৃদয়হীনতা, পরিচিত জনের প্রবঞ্চনা, তার দু'বছরের ঘৃণাহত বেকার জীবনের সব যন্ত্রণা স্মৃতির পাতায় লেখা থাক, অনুভূতির তারে তাকে সে আজ আর ঝঙ্কৃত করবে না। যা একদিন তার কাছে হাস্যকররূপে মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়ে এসেছে সেই আজন্ম লালিত মূল্যবোধগুলোকে আজ আবার পরম সোহাগে সে মনে ঠাঁই দেবে।

বুকপকেটে হাত দিয়ে দেখল ইন্টারভিউ লেটারটা বুকের সাথে লেগে আছে—ছেলেবেলায় মা'র হাতের স্নিগ্ধ পরশের মতো।

যে ছেলেটি রাস্তার মোড়ের চা'র দোকানে বসে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখত, তাকে আর সেখানে দেখা যাবে না। যাকে চোরের মতো ঘরে ঢুকতে হতো ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাকে সবাই সমীহ করবে বস্তুত এ ক'দিনে সে একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছে— যে মা সব সময় কপাল সিঁটকে থাকতেন, তার মুখে বহুদিন আগের হারিয়ে যাওয়া দীপ্তি উদ্ভাসিত হতে দেখেছে যে মিনু কথায় কথায় ঝাঁঝিয়ে উঠত, সে আজকাল গুন গুন করে গান গায় জানালার ধারে অকারণ দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে যেখানে সাদা সাদা সজনে ফুল পড়ছে ঝুর ঝুর করে ওর চোখে তখন যেন কোনো সুদূরের স্বপ্ন ভাসে দিপু, হিরু, বাবা সবার ভেতরই একটা অপ্রত্যাশিত খুশির গুনগুনানি। আনোয়ার দেখেছে, অবাক হয়েছে, খুশি হয়েছে এবং রোমাঞ্চিত হয়েছে এক টুকরো কাগজের দামে ফিরে আসা পুরনো দিনের ভালোবাসায়।

প্লাটফর্মের দিকে তাকাল— উৎকণ্ঠা, বিরক্তি আর সমালোচনার এক সম্মিলিত অভিব্যক্তি। শেড্‌হীন প্লাটফর্মে গাড়ির অপেক্ষায় অস্থির মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আনোয়ার আজ দু'বছর পর এই প্রথম করুণা অনুভব করল। গোটা চারেক কুচো বাচ্চা নিয়ে এক ভদ্রলোকের বেসামাল অবস্থা, বছর দেড়েকের সর্বকনিষ্ঠটি দুধ খাবার জন্যে মাকে জ্বালাতন করছে, বউটা এত লোকের সুমুখে কেমন যেন সঙ্কুচিত, জবুথবু হয়ে— একটা টিনের বাকসের ওপর বসে আছে। আনোয়ার চোখ ফিরিয়ে নিল ওপাশে বটগাছটার নিচে এক বুড়ি আর এক বুড়ির সাথে গল্প জমিয়েছে

ধুধু মরুর মধ্যে শ্যামলতা বলতে, স্নিগ্ধ মরূদ্যান বলতে ওই বছর পাঁচেকের শিশু বটগাছটা। প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য ; আগে যারা এসে দখল করতে পারে তারাই ; বাকি সিংহভাগ যাত্রী কড়া রোদের নিচে দাঁড়িয়ে ট্রেনের অপেক্ষা করে, কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করে, ট্রেন আসে, লোকজন নামে-ওঠে, চলে যায়।

স্টেশন মাস্টারের বাড়ির পশ্চিম ধারে পলাশ গাছটা থেকে টুপটাপ পলাশ ঝরছে— যেন হৃদয় ছোঁয়ানো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। পাঁচিলের ধারে স্তূপীকৃত কয়লার ঘেঁস, সূর্যের তীর্যক আলো পড়ে চিকচিক করছে।

ফসল কেটে নেয়া রিক্ত মাঠ থেকে শুকনো বাতাস আসছে। হঠাৎ মনে হলো গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ; তাড়াতাড়ি সরে এসে দেখল— না : মনের ভুল।

প্লাটফর্ম ততক্ষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ এরি মধ্যে কর্তৃপক্ষের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে শুরু করেছে। আনোয়ার কেমন যেন দিশেহারা হয়ে উঠল ; এতক্ষণ তবু যা হোক একটু আনমনা ছিল— আবার সেই অস্থির উৎকণ্ঠা। সূর্য এবার আরো ওপরে ওঠে এসেছে, চোখ মুখ জ্বালা করছে, গলাটা শুকনো মনে হচ্ছে।

টিউবওয়েল থেকে মুখটা ভিজিয়ে নিল, দু' ঢোঁক পানি খেল। ক'টা বাজে জানতে ইচ্ছে করছে, একজনকে জিজ্ঞেস করল ; হন্তদন্ত হয়ে যেতে যেতে কী বললে বোঝা গেল না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। মেজাজটা খিঁজলে উঠল।

আর বসে থেকে কোনো লাভ নেই, দশটা বাজে, অফিসে গিয়ে কথা শোনার চেয়ে বাড়ি যাই চলুন, কাল না হয় একটা দরখাস্ত পুটআপ করা যাবেখ'ন।

পুনরায় পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আঁতকে উঠল আনোয়ার— দশটা ! উঃ আর এক ঘণ্টা— বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল, মুখটা কেমন তেতো তেতো মনে হচ্ছে

—ঐ তো গাড়ির ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, না ? ওপাশ থেকে একজন বলে উঠল সারা প্লাটফর্ম হুমড়ি খেয়ে পড়ল দেখার জন্যে। বুকের ভেতর পেন্ডুলামটা দ্রুততালে চলছে।

—গাড়ি নেহি আয়েগা, লাইন খারাপ হ্যায়

ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো সবাই ফিরে তাকাল পয়েন্টসম্যান বললে, লাইন খারাপ হ্যায়, গাড়ি আজ তিন বাজে আয়েগা।

টলে পড়ে যাচ্ছিল— কোনোরকমে ল্যাম্পপোস্টটা ধরে টাল সামলাল আনোয়ার মাঠটা ঘুরছে, পলাশ গাছটা দুলছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে যাত্রীরা কলরব করতে করতে ফিরে যাচ্ছে। সে বসে পড়ল। ওপাশ থেকে হাওয়ার ঝাপটায় একরাশ কয়লাকুচি ওর চোখে মুখে এসে পড়ল। সামনের দিক দেখতে চেষ্টা করল, পারল না

চোখ চাইতে পারছে না। উষ্ণধারা বেরিয়ে এল মনে হলো যেন রক্ত বেরিয়ে আসছে। পলাশ গাছটা আর দেখা যাচ্ছে না।

শুধু শুকনো হাওয়ার অট্টহাসি। দু'হাতে কান চেপে ধরল তবু সে হাসি উত্তাল হয়ে উঠছে। মনে হলো প্লাটফর্মটা ফাঁকা, সব যাত্রী ফিরে গেছে। কেউ নেই শুধু সে একা সেই নির্জন প্লাটফর্মে একাকী বসে এক সময় ওর মনে ভয় ঢুকে গেল : এখন সে কী করে পথ চিনে বাড়ি ফিরে যাবে !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতারক জোস্না

প্রথম প্রথম খারাপ লাগত। বিরক্তিকর ঝাঁকুনিতে তেল মবিলের গন্ধে শরীরময় একটা বিচ্ছিন্ন অনুভূতি এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। পথটার সঙ্গে আজ তিন বছরের অন্তরঙ্গ পরিচয়।

বাসটা পোলের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্টার্ট নিচ্ছে না। ছোকরা অ্যাসিস্টেন্টটা বনেট তুলে পানিভরতি বালতি রেডিয়েটরের মুখে উপুড় করে দিল, স্টার্টারটা বার কয়েক ঘোরাল, কয়েকটা ধাতব শব্দ হলো মাত্র, গাড়ি স্টার্ট নিল না। বিড়বিড় করে গালাগালি করতে করতে রেঞ্চ হাতে ড্রাইভার নেবে গেল। যাত্রীদের ভেতরও নেবে পড়েছে কেউ কেউ। ধারে কাছে কোনো লোক বসতি নেই দুপাশে বিস্তৃত মাঠ। জানলার ধারে অঞ্জলি চেয়ে রইল। আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা, মাঠের মাঝখানে দীর্ঘদেহী নিঃসঙ্গ তালগাছ। দূরে, আরো দূরে মাঠের শেষে নীলচে ধূসর অরণ্য নিঃশব্দ। একটা উদাস আর সুদূরপ্রসারী অনুভূতি তার চেতনায় সঞ্চারিত হচ্ছিল যাত্রীদের টুকরো টুকরো কলরব, রেঞ্চের ঠুকঠাক আওয়াজ তাকে ব্যাঘাত করল না, বরং দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট শব্দের মতো তা আরো মাধুর্য ও কারুণ্যে ভরে দিল।

এমন পরিবেশ ভেবে যেতে ভালো লাগে যা হোক একটা কিছু নিয়ে শুধু ভেবে যাওয়া। কিন্তু অঞ্জলি এই মুহূর্তে সবকিছু ভুলতে চাইল যে জ্বালা, যে নিঃসঙ্গ শূন্যতাবোধ, যে কান্নাটা তাকে নিরন্তর রক্তাক্ত করে তাকে ভুলে এই অখণ্ড নির্জনতায় ধীরে ধীরে একাকার হয়ে নিমজ্জিত হতে চাইল সে।

বাতাসের ভেতর বসে থাকা লোকগুলোর চোখে মুখে একটা চাপা বিরক্তি আর উৎকণ্ঠা ছায়া ফেলেছে। যারা নিচে নেবেছে তাদের ভেতর কেউ কেউ খোলা বনেটের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। পোলের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা অঞ্জলির তন্ময় মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছে, দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টাও করল, তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গীকে কী যেন বলে হাসল। সঙ্গীও হাসল। অঞ্জলি সে সব লক্ষ করল না। কেউ কোথাও নেই, এই থমকে যাওয়া দশটা ছুঁই ছুঁই

~ www.amarboi.com ~

বেলা আর নির্জন প্রকৃতির মাঝখানে শুধু সে, জন্ম জন্ম ধরে বসে আছে জীবনের সমস্ত দায়ভাগ থেকে মুক্ত হয়ে, এমনি একটা একান্ত ইচ্ছা সে প্রার্থনার মতো বিড় বিড় করে আবৃত্তি করল মনে মনে।

... অঞ্জু, তুমি এত অবুঝ হচ্ছ কেন ? আমাকে তুমি বিশ্বাস করছে পারছ না ? .... না, এরপর আর কোনো মেয়ের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। ... কিন্তু আমি কী করতে পারি বল ? বিমানের কণ্ঠে বিপর্যস্ত নাবিকের হতাশা। ... এ কথা বলতে তোমার লজ্জা করল না ?... অঞ্জু !...

উ, অসহ্য। কী ভীষণ গরম ! অঞ্জলির হাতে ধরে থাকা খাতাগুলো শূন্যে দুলল। যেন ছোঁ মারতে আসা এক ঝাঁক চিলকে তাড়াতে চেষ্টা করল।

বাসের ভেতর সবাই উঠে এসেছে। কন্ডাকটর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। অ্যাসিস্টেন্ট স্টার্ট দিচ্ছে। একটা আওয়াজ ভেসে আসছে পেছন থেকে।

অঞ্জলি দেখল মাতালের মতো টলতে টলতে একটা বাস আসছে ধুলো উড়িয়ে। অ্যাসিস্টেন্ট বাসের গায়ে থাপ্পড় দিয়ে জানিয়ে দিল খবরটা। কপালে কটা ভাঁজ পড়ল ড্রাইভারের, চোখ দুটো আরো একটু তীক্ষ্ণ হলো, নিচের ঠোঁটের ওপর সামনের দাঁতগুলোর চাপ পড়ল। স্টিয়ারিং কাঁপছে।

বিড়বিড় করে গালাগালি করতে করতে কন্ডাকটর একবার নিচু হয়ে জানলা দিয়ে লক্ষ করল পেছনের গাড়িটাকে। যাত্রীদের টিকেট কাটার জন্যে তাগাদা দিল তারপর। নতুন যাত্রীদের কেউ কেউ টিকিট কাটল। কন্ডাকটর পয়সা গুনে ব্যাগে পুরল।

লোকগুলোর ভেতর এখন কেমন একটা ঝিমধরা আবেশময়তা। সামনে বসে থাকা বুড়োটা ঘুমুচ্ছে পেছন দিকে হেলান দিয়ে। মাথাটা বিশ্রীভাবে দুলছে। ভাঙাচোরা মুখটাতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ কেমন করুণ, অসহায়।

পোলের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটো এখন অঞ্জলির মুখোমুখি। চেয়ে রয়েছে। কী বিশ্রী। একেবারে অভদ্রের একশেষ। মেয়েমানুষ দেখলেই যেন গিলতে চায়। রাগ ধরল, হাসিও পেল। কাঙাল, লোভী কুত্তা। মনে মনে গালটা এসে গেল। শান্তিদি বলত : মেয়েমানুষ দেখলেই পুরুষগুলো মনে করে : আহা একে নিয়ে যদি বিছানায় শোয়া যেত। ...

শান্তিদির মুখে কিছু আটকায় না। ভীষণ ঠোঁটকাটা মেয়ে। কলেজজীবনে কোন ছেলে নাকি কালনাগিনী বলেছিল।... শান্তিদি, তুমি সুখী হও। জীবনে তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ। কেউ তোমাকে বোঝেনি, জানেনি, চেনেনি। নিজেকে তুমি আড়াল করে রাখতে। কিন্তু আমি জানতাম প্রতি মুহূর্তে তুমি কী যন্ত্রণায় পুড়তে। শান্তিদি, তুমি সুখী হও। শান্তিতে থাক।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অঞ্জলি বাইরে চোখ রাখল। দ্রুত অপসৃয়মাণ পৃথিবী দেখতে লাগল। কেমন যেন নেশা ধরে। নিজেকে নেশার ভেতর সঁপে দিতে চাইল। অতীতের মায়াবী হাতছানি থেকে মুক্তি পেতে চায় সে।

দিনটা খুব ঝকঝকে। পরিষ্কার। অঞ্জলি ভাবল : বাসটা আবার খারাপ হয়ে যাক। থেমে পড়ুক। সব যাত্রী ফিরে যাক। সে, এখানে, এই সময়টার কোলে বসে থাকবে। আহা মুহূর্তটাকে যদি ধরে রাখা যেত ! সময় বড় নিষ্ঠুর গো ! ছোটবেলায় পড়া কবিতার লাইন মনে পড়ল। Time and tide wait for none... কেমন একটা অসহায়তার অস্বস্তি ওকে অস্থির করে তুলল।

... বিমানের চোখের মণি জ্বলছে,... গলার স্বর কাঁপছে... অঞ্জু, লক্ষ্মীটি আজ আর আমাকে... না, না, বিমানদা, তা হয় না... অঞ্জু প্লিজ...

সেদিনও এমনি ঝকঝকে দিন ছিল। বাড়ির সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটার মাথা দপদপ করে জ্বলছিল। সমস্ত বাড়িটা কী নিঝ্ঝুম ! ঠান্ডা ! বিমানের চোখ জ্বলছিল। স্বর কাঁপছিল। অঞ্জলির কণ্ঠে মিনতি। বিমান তখন বধির, বর্বর, আদিম।

হু হু কান্নায় ভেসে যেতে চাইল অঞ্জলি। কিন্তু বুকের ভেতর কালনাগিনীটা ফুঁসছে। কান্নার বদলে এখন চোখের ভেতর একটা ঠান্ডা, মিহি, ধিকিধিকি আগুনের শিখা।

২

হাসিনার গলা শোনা যাচ্ছে। কাকে যেন ধমকাচ্ছে।

... খুব সুন্দর একটা প্ল্যান করে ঢাকার বনানীতে বাড়ি করব, তুমি দেখো।... আর তো মোটে এক বছর। তারপরই...

পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলো মূর্ছিত হয়ে ঢলে পড়েছে মেঝের ওপর। জানালার পাশে কলা পাতার দুলুনি। ঘুণধরা আলমারিতে সাজানো বই। আকাশ কেমন মেঘ মেঘ করেছে। হাওয়া পড়ে গেছে। গুমোট। ব্লাউজের নিচে ব্রেসিয়ারের ফিতেটা আলগা করে দিল। একটু জল খেতে পারলে হতো। নাহ্ থাক, উঠতে ভাল্লাগছে না। হেনা অমিতারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই সিনেমা হলে। অঞ্জলিকে বলেছিল, মাথা ধরার অজুহাতে এড়িয়ে গেছে। আসলে সকালবেলার সেই অস্থির জ্বালাটা, বুকের ভেতরের সেই দিশেহারা হাহাকারটা তখনো তাকে খ্যাপা ঘোড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।

হেনা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আজকাল—অঞ্জলি ভাবল : চোখে মুখে কেমন একটা আনমনা ভাব, একটা উদাস খুশির গুঞ্জন ওকে আলোড়িত করে।

~ www.amarboi.com ~

তার ছায়া নকশা কাটে মুখে। মুগ্ধ হতে গিয়েও একটা যন্ত্রণা অঞ্জলির বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে একটা কথা জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়। পারে না। সহকর্মিনী বন্ধু হলেও জিগ্যেস করতে সঙ্কোচ হয়। কেমন বাধো বাধো ঠেকে। কথাটা ভাবতে গেলেই একজোড়া জ্বলজ্বলে ঘোর লাগা চোখ মনে পড়ে, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর কানে বাজে। একটা দস্যু দুপুর স্মৃতির রোদে ঝলমল করে ওঠে। কখনো কখনো মনে হয় : আহা বেচারি ছেলেমানুষ, একটু সাবধান করে দিই। সচেতন হবার জন্যে উপদেশ দিই। তারপরই কী ভেবে পিছিয়ে গেছে মনে মনে ; কিন্তু একটা মেয়েলি কৌতূহল বারবার খুঁচিয়েছে তাকে।

ইস্কুল থেকে যখন ফিরল বেলা তখন যাই যাই করছে। প্রবীর বসে বসে মার সাথে গল্প করছিল। মিনতি ঘুর ঘুর করছিল। প্রবীর এলেই করে। জিয়োমেট্রি বোঝার জন্যে বায়না ধরে। মাকে তখন উঠতে হয়। কিছুদিন ধরে দেখছে অঞ্জলি। হেনার কথা মনে পড়ল। খুব শিগগিরি নাকি ওরা বিয়ে করবে।... ছেলেটাকে অঞ্জলি দেখেছে কয়েকবার। শ্যামলা। একহারা ছিপছিপে। ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজ। চোখের দৃষ্টি নম্র। মুখে কেমন একটা কিশোরসুলভ কমনীয়তা। তবু সেই সন্দেহের সাপটা বিশ্বাসের ঝাঁপি থেকে মুখ বার করে।

মিনতি, তার ছোট বোন, যে ফ্রক ছেড়ে সবেমাত্র শাড়ি ধরেছে। গতবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে, এবার আবার দেবে, তাকে এখন প্রবীর জিয়োমেট্রির থিয়োরাম বোঝাছে। মা বলছিল : ছেলেটা খুব ভালো, বড় ভদ্র, বড় অমায়িক। অঞ্জলি শুনেছে, কিছু বলেনি। সাপটাকে মাথা চেপে ঝাঁপিতে আবার ঘুম পাড়িয়েছে।

'ভালো, ভদ্র, অমায়িক' কথাগুলো অস্ফুট উচ্চারণ করল। দুর্গাপুর স্টিল ফ্যাক্টরির বিমান ভট্টাচার্যও 'ভালো, ভদ্র, অমায়িক'...

... বিমান তুমি অমার্জিত লম্পটের মতো এলে না কেন ? মুখোশ কেন পরেছিলে, আমাকে এত স্বপ্ন দেখা শেখালে কেন ? তোমার কত সাহস সেদিন আমি দেখেছিলাম। ডাক্তার চৌধুরীর ক্লিনিকের সেই দুঃস্বপ্নে ভরা মুহূর্তগুলো পায় পায় টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল... তোমার উপায়হীন অসহায় মুখ দেখে আমার কান্না এসেছিল। বিমান তুমি ঝড়ের মতো প্রমত্ত হলে না কেন ? বিমান, উহ্ বিমান...

... দূর, তুমি যেন কী... দিদি ও ঘরে ... না না প্লিজ, আমার ভয় লাগে ...

মিনতি, প্রবীরকে এই দুধটুকু দে তো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অসুস্থ বাবার বরাদ্দ দুধ থেকে মা প্রবীরকে খেতে দিচ্ছে। অঞ্জলি শুনল সব।

মিনতির ভয় লাগে। কিসের ভয়। ছেলেমানুষ হলেও বোকা নয়, সহজে ধরা দেবে না। কিন্তু কতদিন ? যে লোভের আগুন ওকে ঘিরে জ্বলছে তার আঁচ থেকে ও কতদিন বাঁচিয়ে রাখবে নিজেকে ? তবু মিনতির কাছে সে যেন হেরে গেছে কোথাও— অঞ্জলি ভাবল।

আগামীকাল এসো কিন্তু প্রবীরদা, এগারোর থিয়োরামটা সম্পূর্ণ হলো না... যাও দুষ্টু ...

প্রবীর চলে গেল। মিনতিকে ডাকব। না, থাক। এখন বাবার ঘরে, তেল মালিশ করছে হয়ত, হাঁপানি কদিন থেকে বেড়েছে, সেই সঙ্গে ব্লাড প্রেসারটাও। বিধু এখনো আড্ডা দিয়ে ফেরেনি। কখন ফেরে কে জানে। মিনতি এতক্ষণে শুল। দরোজা বন্ধ করার আওয়াজ এল। ওর কি আজ ঘুম হবে। কদিন থেকে এমন চলছে ? আর প্রশ্রয় দেয়া যায় না। কোনদিন কী একটা অঘটন করে বসবে।

৩

জানালার বাইরে জোস্‌না। ... "আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে"... উঃ, ভগোবান, স্মৃতি এত মুখর হয় কেন ?

বাড়িটা এখন নিঝ্‌ঝুম। বিধু খেয়ে দেয়ে শুয়েছে। মিনতি কি ঘুমুচ্ছে ? ওর ভয় লাগে। হেনা, হেনারও কি ভয় লাগে ? শান্তিদি তুমি এখন কী করছ ?... তোমার অনেক দুঃখ... মদখোর দাদা... লম্পট, ফেরার স্বামী... অসহায় বউদি, তার অবোধ ছেলেমেয়ে... শান্তিদি, তোমার অনেক জ্বালা।

অঞ্জলি দেখল কুয়োতলায় ম্লান জোস্‌নায় ডালিম গাছটা দাঁড়িয়ে আছে একা। একা আর অসহায়। সে দিকে চেয়ে চেয়ে অঞ্জলির মনে হলো সেও ডালিম গাছটার মতো অসহায়। নিঃসঙ্গ।... শান্তিদি সুখে-দুঃখে তার সংসার নিয়ে আছে।... অমিতা কলকাতায় যাবে।... হেনার হয়ত বিয়ে হবে শিগগিরি... মা বাবা, সংসারের পোড় খাওয়া দুটি মানুষ অনেক জ্বালা, অনেক যন্ত্রণার ছাপ চোখে মুখে, তবু ওরা কাছাকাছি।... বিধু নিজের গন্ধে নিজেই বিভোর।... মিনতি প্রবীরকে নিয়ে মেতেছে।... কিন্তু তোমার কী রইল ?... তুমি কী নিয়ে বাঁচবে ?... তোমার দুঃখের কাছাকাছি তো কেউ নেই।... মা-বাবা-ভাই-বোন, পরিচিত বন্ধুবান্ধব সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তুমি একা, নিঃসঙ্গ, বানচাল জাহাজের

~ www.amarboi.com ~

দিশাহীন নাবিক, তুমি কী পেলে ?... খুব সুন্দর একটা প্ল্যান করে ঢাকার বনানীতে বাড়ি করব, তুমি দেখো।... আর তো মোটে একবছর। তারপরই....

বিমান, উ, বিমান। তুমি আমায় এত স্বপ্ন দেখা শেখালে কেন ?

বিলীয়মান রাতের ক্লান্ত জোস্‌না বড় বিষণ্ন। নীলাভ ম্লানতায় মোড়া বিধুর প্রকৃতি কি কথা বলে ? শিশিরের শব্দ কি গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায় রূপকথা শোনায় ? রূপকথা... রূপকথা... রূপকথা ?

ডালিম গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় অঞ্জলির মনে হলো : পাতার ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট, কচি, নীলচে আভার সাদা হাত তাকে ডাকছে। বাতাসে জোস্‌না দোল খায়। অঞ্জলি দেখল হাত দুটো ক্রমাগত তাকে ডাকছে। একটা নরম, তুলতুলে, অবোধ, অসহায় হাত। অঞ্জলি তার নাড়ির কোথায় যেন একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল।

সেই নীলচে আভার সাদা হাত দুটোর আকর্ষণে ক্রমশ আত্মহারা অঞ্জলি, টলতে টলতে দোর খুলে বেরিয়ে এল। পাতার ফাঁক দিয়ে তখন দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কোলে আসার ভঙ্গিতে। নরম তুলতুলে, নোনতা নোনতা গন্ধ, অবোধ অসহায় দুটি হাত। ডালিম গাছটা কি রুদ্ধশ্বাস ? দোল খাওয়া জোস্‌না খিল খিল হাসে। উদ্বেলিত দুটি হাত জোস্‌নায় কাঁপে।

—কী হলো রে বিধু ? কুয়োতলায় কী যেন পড়ার আওয়াজ হলো দেখ তো।

অঞ্জলির দু'চোখ বেয়ে তখন স্মৃতি-বিস্মৃতি-আশা-ভালোবাসা-সুখ-দুঃখ ঝরে ঝরে পড়ছিল।

বাতাসে জোস্‌না দোল খায়। শিশিরের শব্দ কি রূপকথা শোনায় ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপূর্ণ তুমি ব্যর্থ বিশ্ব

১.

বিকেলের মরে যাওয়া হলদে আলোটা এতক্ষণ খেলা করছিল নোটন পায়রার মতো, একসময় জানালা গলে উড়ে গেছে। অন্ধকার এখন বেড়ালের মতো ঘরের ভেতরে হেঁটে বেড়াচ্ছে নিঃশব্দ পায়ে। শুয়ে শুয়ে অপূর্ণবাবু অনুভব করলেন তিনি বড় একা, বড্ডো বেশি নিঃসঙ্গ সবাই কেমন যেন দূরে চলে যাচ্ছে ; অথবা, অপূর্ণবাবু নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন, কোনটা ?

বাইরের জগৎটা তাঁকে ডাকে মাঝে মাঝে। তাঁর ভেতরে তখন একটা আক্রোশ মাথা কোটে। অক্ষম পা দুটো বিছানার ওপর ঠোকেন। কান্না পায়। ভেতরে ভেতরে তিনি ছেলেমানুষের মতো ফুলতে থাকেন অভিমানে। তারপর একসময় তা নিস্তেজ হয়ে আসে ক্লান্ত বিকেলের মতো। তখন ইচ্ছা না থাকলেও তিনি জানালার বাইরে রোদের ঝিলিমিলি দেখেন, পেয়ারা গাছে কচি পাতার কাঁপন দেখেন, হাওয়ায় ভেসে আসা মানুষের কথা শোনেন, অথবা এক গ্লাস জল খান মীরাকে ডেকে। তারপর ক্লান্ত ডাইনোসরের মতো নির্জীব পড়ে থাকেন। কখনো কখনো দীর্ঘশ্বাসের মতো শেলি আওড়ান : I fall upon the thorns of life ! I bleed !

অন্ধকার জমাট বাঁধছে এখন পর্যন্ত এ ঘরে কেউ আলো দিয়ে যায়নি। হেঁসেলে রান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এ ঘরে ইরা-মীরা কী নিয়ে যেন তর্ক করছে। মায়া এখনো ফেরেনি মেয়েটা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।... অপূর্ণ, তোমার মরে যাওয়া উচিত।... তুমি একটা অপদার্থ, ব্যর্থ, পঙ্গু, বৃদ্ধ জানোয়ার। তোমার মরে যাওয়া উচিত। মায়া এখনো ফেরেনি। ইরা-মীরার গলা শোনা যাচ্ছে। রান্নাঘরে কাজের ব্যস্ততা। বিশুটা কোথা কোথা থাকে। ছায়ার নাটকের মহড়া। অরুণ নেই, বিকাশ ফেরার। অপূর্ণ, তোমার মরে যাওয়া উচিত।

... আমি কিছু করতে পারলাম না। সারাটা জীবন শুধু ব্যর্থতার পুজো করে গেলাম।... আমি একটা অপদার্থ। আমার মরে যাওয়াই উচিত।... অপূর্ণবাবু বিড়বিড় করে বললেন : আমার মরে যাওয়াই উচিত। বিমলাকে কোনোদিন সুখ

পুনরায় পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিতে পারলাম না। ছেলেমেয়েরা জীবনের হাতে মার খাচ্ছে। শিবুটার পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মায়ার রক্ত জল করা পরিশ্রমের কটা টাকার ভরসা। ছায়া নাটকে নেবেছে, যা পায় তাতে ওর ঠাঁট বজায় রাখতে গিয়েই ফতুর।... লোকের কথা শুনতে হয় : শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক মেয়েকে নটী বানাল !... বড় ছেলে রাজনীতি করতে গিয়ে ফেরার।

বিমলার দিকে তাকানো যায় না।... বিমলা, আমায় তুমি ক্ষমা কর। ... আমি একটা অপদার্থ।... তোমায় কোনোদিন সুখ দিতে পারিনি।... আমায় তুমি ক্ষমা কর বিমলা।... মায়া কি এল ? ছায়া কি আজ নাটকের রিহার্সাল দিতে গেছে ?... আগে শিবু সঙ্গে যেত, আজকাল যেতে চায় না। বললে কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। কেন ?

বিমলা কেমন দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। চেনা যায় না। ভয় লাগে।... আমার স্ত্রীকে আজ যেন আমি চিনতে পারছি না। আমার তিরিশ বছরের সুখ-দুঃখের একান্ত সঙ্গী আজ আমার কাছে দুর্বোধ্য, তাকে ভয় লাগে।... বিমলা তুমি আমায় ক্ষমা কর।

... সারা জীবন আমি সোনার হরিণের পেছনে ঘুরে মরলাম। তিরিশ বছর ধরে তোমায় একটু একটু করে হত্যা করেছি আমি।... আমায় ক্ষমা কর বিমলা।... আমি একজন ব্যর্থ, অক্ষম পুরুষ।... আমায় ক্ষমা কর।... তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে গেছ।... কথা কম বল, অন্যমনস্ক থাক। তোমাকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো মনে হয় আজকাল।

অরুণ যেদিন সুপুরি পাচার করতে গিয়ে বর্ডার পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল, সেদিন তুমি কাঁদনি।... তোমার মুখের দিকে সেদিন আমি তাকাতে পারিনি।... নিজেকে আমার অপরাধী মনে হয়েছিল।... মনে হয়েছিল আমিই অরুণকে খুন করেছি।... সেদিন তোমাকে আমি ভয় পেয়েছিলাম।... সেদিন থেকে তুমি গম্ভীর হয়ে গেছ।

অপূর্ণবাবু দেখতে পেলেন : বেপরোয়া, বিপর্যস্ত অরুণ উপুড় হয়ে পড়ে আছে ... তিনি চোখ বুজলেন ; কিন্তু অরুণের রক্তাক্ত শরীরটা অন্ধকারের ভেতর জ্বল জ্বল করতে লাগল। অপূর্ণ বাবু ভাঙা গলায় ডাকলেন : মীরা আলোটা দিয়ে যা।

২.

কার্তিক সেনের মণ্ডপ থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘরের দেয়ালে অন্ধকার কাঁপছে। বাতাসে কি শিউলি ফুলের গন্ধ ?... অরুণের রক্তাক্ত শরীর। নির্জনতা ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে।... শিউলি ফুলের গন্ধ... মাইকের উন্মত্ততা... ঢাকের আওয়াজ... অপূর্ণ, তোমার মরে যাওয়া উচিত।... অন্ধকার ফুঁসছে।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপূর্ণ তুমি ভয় পেয়েছ, তোমার সন্তানকে তুমি ভয় পেয়েছ।... আততায়ী পিতা, তুমি ভয় পেয়েছ।... আশ্চর্য, অপূর্ণ তুমি ভয় পাও, আজকাল তুমি ভয় পাও ?... অথচ বুলেট বিদ্ধ তাপস মুখার্জীর রক্তাক্ত শরীরকে লুটিয়ে পড়তে দেখেছ তুমি।... কোন্নাগরের ছবি বউদির কথা মনে পড়ে ?... বারুদের গন্ধে ভরা দিনগুলো কি ভুলে গেলে ?... বিনয় বসু... সুধীর গুপ্ত... Veranda Fighting... সব ভুলে গেছ অপূর্ণ, তুমি সব হারিয়ে ফেলেছ, তোমার মরে যাওয়াই উচিত।

মীরা আলো দিয়ে গেছে। লম্বা লম্বা ছায়া কাঁপছে চুন খসে পড়া দেয়ালে। সেদিকে চেয়ে অপূর্ণবাবু, দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, মনে হলো : তাঁর ভেতরটাও অমনি চুন খসে পড়া পলেস্তারাবিহীন এবড়োখেবড়ো, স্যাঁতসেঁতে। অনেক আগাছা, অনেক চির খাওয়া ফাটল।... অপূর্ণ তোমার মরে যাওয়া উচিত।

খোকা, তোকে বড় হতে হবে, অনেক বড়, অনেক... বাবার বুক ফুলে ফুলে উঠছে। সাদা চোখ দুটো অপূর্ণর মুখের দিকে নিবদ্ধ।... তুমি আমার বড় ছেলে, তোমার ওপর আমার... বাবা হাঁপাচ্ছে। ঠোঁট চেটে নিল জিভ দিয়ে : তোমার ওপর আমার অনেক ভরসা।... বাবার চোখের দৃষ্টি অপূর্ণর দিকে, নির্ভরতা খুঁজছে, আশ্বাস পেতে চাইছে।... অন্ধকার কাঁপছে... পার্টি ছাড়া তুমি কি আর কিছুই বোঝ না অপূর্ণদা— দীপার ঠোঁটে থরথরে অভিমান, চোখে চিকচিকে কান্নার আভাস।... দাদা, আপনি পত্রপাঠ মাত্র চলিয়া আসিবেন, মার অবস্থা খুব খারাপ। আপনাকে তিনি দেখিতে চাহিতেছেন। মোটেই দেরি করিবেন না।... অপূর্ণ তুমি একবার দেশে যাও, লক্ষ্মী ভাই আমার, একবারটি তোমার মাকে দেখে এস, ভগবান না করুন, কিছু যদি একটা অঘটন ঘটে যায় তো সে দুঃখ সারা জীবনেও ঘুচবে না।... না, না, তা হয় না বউদি, তুমি বুঝতে পারছ না, এই মুহূর্তে কোনো মতেই যাওয়া সম্ভব নয়, এখন আমার অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব।... মা, মাগো, আমায় তুমি ক্ষমা কর মা... বাতাসে অন্ধকার ফুঁপিয়ে উঠছে।

বাইরে এখন অনেক আলো, উল্লাস, উন্মত্ততা। অন্ধকারের নির্জনতা কেঁপে উঠছে ঢাকের শব্দে। মাইকে কেটে যাওয়া রেকর্ডের বেসুরো খসখসে আওয়াজ। শিবুটা কোথা ? প্রতিমার সুমুখে নাচছে হয়ত। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। প্রতিমার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মায়া কি এখনো ফেরেনি ? ছায়াটা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। সিনেমায় চান্স পাবার জন্যে চেষ্টা করছে নাকি আজকাল। অপূর্ণবাবু কিছু বলতে গিয়েও ভয় পান। কর্তৃত্বের অধিকারটা তিনি কবে যেন হারিয়ে ফেলেছেন। কে যেন কেড়ে নিয়ে গেছে। নিজের স্বেদ ও রক্তে গড়া সৃষ্টিকে শাসন করতে তিনি আজ ভয় পান।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

... এক কড়ার মুরোদ নেই তার আবার মানসম্মান। লজ্জা করে না ? ভবিষ্যতের কথা তো তুমি কোনোদিন ভাবনি, সারাটা জীবন আমাকে জ্বালিয়েছ, এখন বিছানায় পড়ে পড়ে... বিমলার গলায় কান্না।

বাড়িতে নানা ধরনের লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে তারপর। কথা আর হাসির টুকরো টুকরো আওয়াজ অপূর্ণ বাবুর স্যাঁতসেঁতে ঘরটায় আছড়ে পড়েছে। অন্ধকারের ভেতর কালো একটা ভালুকের লোমশ থাবা দুলতে দেখেছেন তখন তিনি। কিন্তু বিমলার কথাগুলো জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো তাকে কুঁকড়ে দিয়েছে।

ছায়ার দিকে আজকাল তাকানো যায় না। বাপ হয়ে তাকানো যায় না। কী যেন এক সর্বনাশ ক্ষুধা ওর চোখ মুখে নিয়ত জ্বল্‌জ্বল্‌ করে। তখন ওকে অপরিচিত মনে হয়। চেনা যায় না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত উগ্র অপরিচিত। অপূর্ণ বাবুর ভয় লাগে। ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায় তিনি রক্তাক্ত হন মনে মনে। অপমানের জ্বালায়, অক্ষমতার দীনতায় বুক ঠেলে কান্না উথলে ওঠে।... অপূর্ণ, তোমার মরে যাওয়া উচিত।

৩.

সকালবেলা যখন বিভূতি বাবু এসেছিলেন আকাশে তখন আলো ছিল। বাইরে কাক ডাকছিল। অপূর্ণ, তোমার সামনে বিভূতি উকিলের মুখ বড় বেশি উজ্জ্বল আর মসৃণ মনে হচ্ছিল। বিভূতি বাবু সোপান মাড়িয়ে মাড়িয়ে তাঁর কৃতিত্বের এক একটি মণিময় মহলে তোমায় নিয়ে যেতে থাকলে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলে, আর হাঁটতে পারছিলে না, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, হাওয়া বড় অপ্রতুল এবং আলোর প্রখরতা চোখ ঝলসে দিচ্ছিল। এখন বিভূতি বাবু নেই, তবু সকালটাকে মনে মনে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে অনায়াসে আনতে পার... কিন্তু বিভূতিবাবুর সকালকে তোমার সন্ধ্যায় এনে কী লাভ, অপূর্ণ ! নিজেকে নিজের কাছে বড় উলঙ্গ করে দেয়, লজ্জায় তখন অন্ধকারে লুকোতে অস্থির হয়ে উঠতে হয়...

বিভূতি বাবু যখন তোমার হাত ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর রাজ্যপাট দেখাচ্ছিলেন তুমি তখন সভয়ে বিমলাকে খুঁজছিলে, বিমলা লক্ষ করছে কি না, অথবা শুনছে। বিমলার নাগাল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছিলে, অথচ দেখো অপূর্ণ, এখন তুমি সেই বিমলাকে, যে তোমার বিচিত্রতম সুপ্ত বোধগুলোকে প্রতিনিয়ত জাগ্রত করেছে, তাকে নিভৃত অন্ধকারে শিশুর মতো আকুল হয়ে পেতে চাইছ।... লজ্জা অপূর্ণ, লজ্জা। বরং তোমার মরে যাওয়াই ভালো !

হারিকেনের লাল আলো কাঁপলে দেয়ালে অপূর্ণ বাবুকে এখন সত্যিই ডাইনোসরের মতো মনে হয়। হাজার বছরের ক্লান্ত, অথর্ব, নিজেকেই নিজের কাছে অপরিচিত ঠেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন তিনি ইরা, মীরা, মায়া, ছায়া, তাঁর স্ত্রী বিমলা, শিবু, সবাইকে ডাকলেন একে একে। কোনো সাড়া পেলেন না। প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলে তিনি সভয়ে আবার দেয়ালের দিকে তাকালেন, হ্যাঁ, ঠিক তেমনি... সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠছে এখন, হাত দিয়ে দেখলেন গায়ের চামড়া খসখসে আর শক্ত হয়ে উঠছে। সমস্ত মুখগুলোকে কল্পনা করলেন তিনি, ঝাপসা, অবয়বহীন কতগুলো রেখার জটিল সমষ্টি ; নড়ে না, কথা বলে না, স্থির ! তখন চিৎকার করে উঠতে চাইলেন, আমি অপূর্ণ বলছি... আওয়াজ বেরুল না, একটা গোঙানির মতো কিছু ধ্বনি গলার ভেতর থেকে কেঁপে উঠলে তিনি মুখের ওপর হাত এনে অনুভব করলেন মুখটা লম্বা আর শক্ত হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো সামনের দিকে ঝুলে এসেছে এবং ভীষণ অমসৃণ। হাত পা, সমস্ত শরীর ভারি আর বিপুল হয়ে উঠছে।

তিনি আবার চিৎকার করে বলতে চাইলেন : আমি শ্রী অপূর্ণচন্দ্র রায়, এই বাড়ির কর্তা, বিমলার স্বামী, ছেলেমেয়ের বাবা... আমি...

হঠাৎ সেই বিপুল নৈঃশব্দ্যের ভেতর থেকে কান্না আর বিলাপ নবজাত শিশুর মতো কঁকিয়ে উঠলে তিনি সচকিত হয়ে শুনছেন : হায় হায় রে, সাঁতার জানে না, কেন নৌকায় চড়তে গেল... বিমলা কাঁদছে, ভীষণ ক্লান্ত ; কিন্তু কাঁদছে, অরুণ মরার সময় কাঁদেনি, এখন কাঁদছে।... অপূর্ণ বাবু বলে উঠতে চাইলেন : আমি এখানে ; কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেলেন, মনে পড়ল তিনি এখন একটা কুৎসিত জন্তু, এবং মনে হতেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে ব্যস্ত হলেন।... শিবু, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নদীতে ডুবে মরেছে। তিনি তার পিতা ; কিন্তু ওরা সবাই এখনই তাঁকে এ খবর দিতে এসে যখন দেখবে তিনি ডাইনোসর হয়ে গেছেন, তখন ওদের চোখের কান্না শুকিয়ে গিয়ে জিঘাংসা জ্বলে উঠবে।

দ্রুত হাতে হারিকেন নিভিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর অন্ধকার ডানা মেললে অপূর্ণ বাবু সেই প্রাগৈতিহাসিক আঁধারের ভেতর অথর্ব দেহটা নিয়ে আত্মগোপন করার জন্যে আকুল হয়ে উঠলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতীক্ষিত লণ্ঠন

অবশেষে এসেই গেল। জনাই বাজারে শম্ভুর দোকানে বসে চা খেতে খেতে অ্যাসিস্ট্যান্ট অলোককে বলেছিল, তেরপলটা ঢেকে দে।

অলোক অবাক হয়ে যায় এবং তখন ক্রুদ্ধ স্তরটা তাকে কুঁকড়ে দেয় : লে শালা, হা করে চেয়ে আছে ! আবে হাঁদাকান্ত, যা বলি কর।

মেজাজটা তার খারাপই। সেই সকাল থেকে।

তখন নিম গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। কোথা থেকে ইঁদুর ধরে এনে পাঁচিলের ওপর কাকটা আছড়াচ্ছিল সেই সকালবেলা। তখন তুই চলে গেলি উঠোন কাঁপিয়ে, আর মনটা আমার ফাঁকা হয়ে গেল। দুপুর বেলা সুখলাল এসে বকবক করে গেল অনেকক্ষণ। সাঁঝবেলা গানের আসরে যেতে বলে হাত ইশারায় বোতল দেখিয়েছিল। আমি গেলাম না।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে আকাশের দিকে চেয়ে সে থমকে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর বিড়বিড় করে গালাগালি করল। তখন অলোক আসে এবং এখন জনাই বাজার থেকে ফিরছে খগেন কোলের দোকানের মাল নিয়ে। কথা ছিল আগামীকালের।

কিন্তু আমার মনটা খারাপ সেই সকাল থেকে। তুই চলে গেলি। তখন নিমপাতা ঝরছিল আর মনটা আমার ফাঁকা হয়ে গেল। কাকটা কী মনে করে ইঁদুরটাকে মাটিতে ফেলে উড়ে গেল ডেকে ডেকে। ইঁদুরটা মরা। সমস্ত শরীরটা তার ঠোঁটের ঘায়ে ছেঁড়া খোঁড়া। একটা চোখ নেই। কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। সরু সরু দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে। সাদার গায়ে লালের ছোপ। প্রায় ঝুলে থাকা চোখ ছেয়ে আছে আতঙ্কে, যন্ত্রণায়। আমার তখন খারাপ লাগছিল। ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা, দখিন জলার মতো। আর তার ভেতর যেন বাতাস পাক খাচ্ছিল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ি বের করলুম।

তারপর জনাই বাজার। পাল মশাই অবাক হয়ে বললেন, কিরে আজই এসে গেলি, তোর না কালকে আসবার কথা !

— না বাবু, আজকেই এসে গেলুম কাল একটু অন্য কাজ আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাল মশাই তখন বিকেল বেলার জলযোগ করছিলেন বাতাসা দিয়ে। বললেন, তা এখনই নিবি ? লোকজন তো দেখছি না : ও ভজা, ভজারে এবং তখন বনমানুষের মতো ভজা দাঁড়ায়।

খগেন বাবুর চালটা গাড়িতে তুলে দে তো। লখা কোথায় ?

লক্ষণকে পাওয়া গেল না। অগত্যা ভজাকেই সব তুলতে হয়। বাইশ বস্তা চাল। তখন ভজা যেন বৃষ্টিতে ভেজা কালো পাথর।

জানলার বাইরে মুখ রেখে ইস্কুল দেখছিল অলোক। সামনে খেলার মাঠ। সবুজ ঘাস। গোল পোস্ট। ছড়ি হাতে মাস্টার ক্লাসে ঢুকছে। বাতাস উঠল। আর ধুলো। আর তার ভেতরটা এলোমেলো হয়ে যায় যুদ্ধ হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু এখনো তাঁর বিপদ, শান্তি হয় নাই। দুইজন মোগল, একজন খোরাসানি, একজন মুলতানি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

তখন হু হু করে বৃষ্টি এসে যায়।

শ্মশানঘাটের পোলের কাছে আসতে না আসতে চারপাশে সন্ধ্যা নেবে গেছে। আর তুমুল বৃষ্টির ভেতর বাতাসের গোঁ গোঁ শব্দ। কাঠের দোকানের ঝাঁপের ভেতরে আলো। ভিজে বাতাসে পোড়া গন্ধ আসে নাকে। গাড়ি তখন পোলের ওপর। নিচে খালের পানিতে হুড় হুড় শব্দ। আর থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা, বিদ্যুতের চমক। বৃষ্টি আর গাড়ির একটানা আওয়াজ। বাকি সব সুনসান।

পোড়া ভাত খাচ্ছিস, দেখিস তোর বেঁতে বৃষ্টি হবে। কে বলে। আমি আর বাঁচব নাগো কানের কাছে কে ফিস ফিসিয়ে ওঠে। মা আর একটু সাবু দিই। এই আর এক ঢোঁক।

মা, বৃষ্টির দিনে তুই চলে গেলি ! একা আমার ভয় লাগে। শ্মশান থেকে ফিরে এসে ভুল করে তোকে ডেকে ফেলেছিলাম। মা, খুড়ি আমাকে কষ্ট দেয়। মা, তুই আমায় ফেলে চলে গেলি কেন ? মাগো তুই যদি আবার ফিরে আসতিস !

এবং আরো চেপে বৃষ্টি নাবে ! বাতাস তুখোড় হয় দাঁতাল শুয়োরের মতো গাড়িটা গোঁ গোঁ করে ছুটে চলেছে যেন একের পর এক অন্ধকারের দরজা খুলে দিচ্ছে কেউ।

আচ্ছা, রক্তের ভেতর কি কান্না ওঠে ? এই যে এখন পোলের নিচে খালের পানিতে শব্দ হচ্ছে ! মনে হয় যেন আমার রক্তের ভেতর কেউ কাঁদছে।

শম্ভুর দোকানে বসে গুপী বলছিল, তোমাকে আজ বিলিতি খাওয়াব, থেকে যাও। কিন্তু আমার ভেতরটা তখন দখিন জলা। বাতাস পাক খাচ্ছিল, আমি চলে এলুম।

বিষ্টু নাপিতের স্বামীর ঘর না করা নষ্ট মেয়েটাকে ওরা পাঠিয়েছে। মেয়েটার জোয়ানি বটে। ওরা তখন ভাদ্র মাসের কুকুরের মতো ছোঁক ছোঁক করছিল। আমি চলে এলুম। আর এখন বৃষ্টি হচ্ছে।

আমার বই
পুনরায় পাঠকে এক হও

~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টির ঝাপটা মারছে এদিক থেকে, ওদিক থেকে। আর ক্ষয়ে যাওয়া স্যান্ডেলের মতো রাস্তায় গাড়িটা তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো ছুটছে।

অলোকের যেন ঘুম পেতে থাকে। কাল সারারাত ঘুম হয়নি। খালি কেঁদেছে। কোনো কারণ নেই, কিন্তু উথলে উথলে উঠছিল।

এখন চুপচাপ বসে বসে ঘুম আসে। জাহান ভাই কোনো কথা বলছে না চুপচাপ। আর আমার খারাপ লাগছে। জাহান ভাইয়ের হাত স্টিয়ারিং হুইলে ঘুরছে। চোখ সামনের উইন্ডগ্লাসে। উইন্ড গ্লাসে বৃষ্টির কণা যেন কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর দুটো আঙুল সেই ঘাম মুছে ফেলছে। চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন গা শির শির করে ওঠে। মনে হয় অন্ধকারের ভেতর কোথাও থেকে দুটো শীর্ণ আঙুল ওঠে এসে উইন্ডগ্লাসের ওপর আঁচড়াচ্ছে।

তখন শ্মশানের কথা মনে আসে, আর চারপাশে অন্ধকার। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

মা, তোর আলতা পরা পা টুকটুক করছিল আর ওদের কাঁধে তুই উঠলি। চারপাশ থেকে তখন হরিধ্বনি উঠল। ফুল ঝরল। আর আমার ভেতরে আমি লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে থাকলাম। তখন আবার হরিধ্বনি উঠল। মা, যেন তুই নয় আমি, শূন্যে ভাসতে থাকলাম। হারাণদার হাত ধরে আমি তখন খালি পায়ে তোর পেছনে পেছন হাঁটছিলাম। তোর টুকটুকে পা, লাল পেড়ে নতুন শাড়ি। মনে হচ্ছিল তুই বিয়ের পিঁড়িতে চড়েছিস।

এবং এখন আস্তে আস্তে তার ভেতর কাঁটা দেয়া ভয়টা কেটে গিয়ে একটা নির্বোধ ব্যথা মোচড় দিচ্ছে। শক্ত সিটের ওপর থাকতে থাকতে তার মনে হয় এখনই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে রাস্তায়।

তখন কোথা বাজ পড়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে, চকিতে আলো শিউরে ওঠে, আর তার ভেতর জাহানের নির্বিকার মুখ, অল্প অল্প ঘাম ভ্রুর পাশে, কপালে, চোখের নিচে আর গালের ওপরে। এবং গাড়ি ছোটে। ঝড়, বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত ছুটতে থাকে। বুনো শুয়োরের মতো, ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো। আর অলোক বসে থাকে। জাহান বসে থাকে। চুপচাপ। কেউ কোনো কথা বলে না। স্টিয়ারিং হুইল একটু একটু ঘোরে। পা দুটো ওঠানামা করে থেকে থেকে। আর ওরা বসে থাকে। বসে বসে বৃষ্টির শব্দ শোনে।

গাড়ি বাঁক নিচ্ছে। বুড়ো শিবতলায় ঝুরি নাবা বটগাছের ডাল রাস্তার ওপর মাথা নিচু করে ঝুঁকে আছে। তার পাশে পানা পুকুর। ব্যাঙ ডাকছে, বিরীজ তাঁতির বাঁশ বাগান, ফুরোতে চায় না, ফুরোতে চায় না। তারপর এক সময় হু হু করে ফাঁকা ডাঙা জমি। নন্দীদের পানের বরোজ পেরিয়ে যেতে থাকে।

তখন সামনে আওয়াজ ওঠে। হেড লাইটের আলো এসে পড়ে আর সাঁ করে ঢাকা জিপটা ভিজে মুরগির মতো বেরিয়ে যায়। তারপর আবার আগের মতো বৃষ্টি, হাওয়া, অন্ধকার আর গাড়ির শব্দ এবং ওরা দুজন বসে থাকে চুপচাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বউ, ক্যাতা আনলি নি, ছেলে শোবে কোতা ?

লকলকে আগুনের লাল আভাটা দূরে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে চমকে চমকে ওঠে, আর শোঁ শোঁ বাতাসের মতো তরঙ্গিত কোলাহল ভেসে আসে। ছাদে, বারান্দায় লোক গিজগিজ করে। কুন দিকে যাবে গো, সিঁড়িটা দেখিয়ে দাও না বাবা। কোতা গেলি গো, কানা মানুষ কুন দিকে যাই, অ বউ। বাতাসের বেগ বাড়ছে। পাক খাচ্ছে, মোচড়াচ্ছে।

সকাল বেলা তুই চলে গেলি আর এখন অন্ধকারের ভেতর আমি গাড়ি চালাচ্ছি। নিয়ামতকে তুই... আর আমি তোকে মারলাম, আর তুই চলে গেলি। তখন কাকটা কোথা থেকে একটা ইঁদুর এনে আছড়াচ্ছিল, ছিঁড়ছিল। নিমপাতা ঝরে পড়ছিল আর আমার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল। আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর এখন ঝড় বৃষ্টির ভেতর ঘরে ফিরছি। কিন্তু তুই ঘরে নেই। বার বার খালি সেই ছেঁড়া খোঁড়া ইঁদুরটার কথা মনে পড়ছে আমার।

অলোক গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুলছে। জাহান একবার ওকে দেখল। মাথাটা সামনে ঝুঁকে এসে প্রায় বুকের ওপর ঝুলছে। ঢাকল না কিংবা ধমক দিল না।

বরং হঠাৎ এখন তার মায়া জাগছে। আর সেই রক্তের ভেতর থেকে, কান্নার ভেতর থেকে একটা মমতা সারা চেতনায় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে অলোক নয়, সে বসে আছে। সেই ছেলেবেলার জানু। বাবার পাশে গাড়িতে বসে মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে।— গোলাপ ছড়ি, গোলাপ ছড়ি, পিপারমেন্ট লজেন্স, কোকো খান, তানসেন গুলি।— খোকা খুকুর 'হাসিখুশি' নিয়ে যান, ভালো ভালো রঙিন ছবিঅলা ছড়ার বই নিয়ে যান। অন্ধকার যেন বাতাসের পায়ে মাথা কোটে, সিঁড়িটা কুন দিকে বাবা, আমি কানা মানুষ। অ বউ। গাড়ি এখন বেগমপুর পোস্ট অফিস পেরিয়ে যাচ্ছে, তারপর পুণ্যময়ী বিদ্যামন্দির। পেরিয়ে গেল। অলোক মাথা তুলল। জাহানের দিকে চাইল। তারপর সামনের দিকে ভ্রু কোঁচকালো। এখনো বৃষ্টি। আর গাড়িটা যেন কতদিন থেকে চলছে ! কতদিন থেকে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসে আছে, কোনো কথা নেই। আর হু হু করে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়ি চলছে। এদিকে দোকান-পাট প্রায় নেইই, যা দু-একটা ভাঙা চোরা আছে, তা-ও এখন বৃষ্টিতে ঝাঁপ বন্ধ করা এবং এক সময় চারপাশে তুমুল ঝড় বৃষ্টি আর নির্জন অন্ধকারের ভেতের গাড়ি থেমে যায়। সামনে সাদা রেল গেট, বন্ধ। তারপর অন্ধকার দখিন জলা থেকে হাওয়া উঠে আসছে হা হা করে। জাহান হর্ন দেয়। বৃষ্টি আর বাতাস যেন সেই শব্দকে ছেঁড়া কাগজের মতো অন্ধকারের ডাস্টবিনে ফেলে দেয়।

এবং সেই অঝোর বৃষ্টি, ক্রুদ্ধ হাওয়া, সামনে পেছনে আর পাশে অন্ধকার নিয়ে ওরা দু'জন বসে থাকে, কখন লণ্ঠন হাতে বুড়ো গেটম্যান থিরুমল এসে বন্ধ গেট খুলে দেবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নচিকেতাগণ

সরু একটা বাথরুম, এর মধ্যে ১৬ জন মানুষ, শোয়া তো দূরের কথা ছড়িয়ে বসাও যায় না, পা গুটিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দিনরাত বসে থাকতে থাকতে ঘাড়, পিঠ, কোমরে টনটনে ব্যথা। ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসে কিন্তু গোসলহীন অভুক্ত শরীর, অবিরাম টেনশন, অসাচ্ছন্দ্য থেকে থেকে জাগিয়ে দেয়। একটি মাত্র দরজা, সব সময় বন্ধ, জানলা নেই, দেয়ালের একদিকের মাথায় শিলিং ছোঁয়া একটা ১০ ইঞ্চি বাই ৮ ইঞ্চি ফাঁকা ভেন্টিলেটার। এর মধ্যেই ১৬ জন মানুষের প্রস্রাব পায়খানা ; দুর্গন্ধের চেয়ে অস্বস্তিটাই মারাত্মক।

গত বুধবার ভোর ছ'টার দিকে আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল এখানে। জিপের পেছনের সিটে আমার দুপাশে দুজন রাইফেলধারী মিলিটারি, মুখোমুখি দুজন। সামনে, ড্রাইভিং সিটে একজন, তার পাশে আর একজন— বোধহয় অফিসার লেভেলের কেউ হবে। আমি তার মুখের এক পাশটা দেখতে পাচ্ছিলাম, মসৃণ গাল, জুলফির নিচে টকটকে ফর্সা-গালে নীলচে আভা। এত সকালেই এমন শেভ-করা মুখ।

মুখোমুখি সৈনিক দু'জন আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, অস্বস্তিতে আমি চোখ রাখলাম বাইরের দিকে।

রাস্তায় লোকজন খুব কম, ১টা বাস চলে গেল, ২টা রিকশা, ১টা কুকুর, ২ জন মানুষ। রাস্তা মোড় নিল — বাঁ দিকে পার্ক ডানদিকে পানির ট্যাংক, ৩টি রিকশা, ১টা বেবি ট্যাক্সি, ১ জন বৃদ্ধ ভিখারি, ডানদিকে কোর্ট বাঁদিকে চার্চ, ডান দিকে ট্রেজারি বাঁদিকে সিনেমা হলো, জিপ এগিয়ে যাচ্ছে, এই পরিচিত রাস্তা পরিচিত বাড়িঘর, গাড়ি, মানুষজন— এক সীমাহীন অর্থহীনতার ভেতর দিয়ে আমি চলেছি।

আমি আবার সৈনিক দুজনকে দেখলাম, তারা তেমনিভাবেই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। একজনের মুখে খুব সূক্ষ্ম একটু হাসির আভাস, কিন্তু তার চোখ দুটি আগের মতোই ধারালো এবং স্থির।

নড়েচড়ে বসতে গিয়ে খেয়াল হলো আমি কাঁপছি, আমার হাঁটু দুটো, তার ওপর রাখা হতো দুটো ভীষণভাবে কাঁপছে।

সুনিবার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার পাশের দুজনের মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারাও ব্যাপারটা নিশ্চয়ই লক্ষ করে আসছে এতক্ষণ ধরে।

আমি মাথা নিচু করে চোয়ালের দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে ধরলাম ; কিন্তু আমার এত যে পরিচিত শরীর, সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে এখন আমার সবচেয়ে আপন, তাকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছি না।

হাঁটুর ওপর রাখা হাত দুটো হাতের আঙুলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, থেকে থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম পড়ছে। অনুভব করলাম, এই সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি ঘামে সমস্ত শরীর আমার ভিজে গেছে।

কে যেন কেশে উঠল। কেমন ঘড় ঘড় আওয়াজ। কে হতে পারে ? আনিস ? দুলাল ? আজাদ ? আতিক ?

কেউ কাউকে চিনতাম না, তবু সবাই সবার চেনা হয়ে গেছে।

সকাল হলে দরজা খোলার শব্দ হয়, সময়টার জন্যে আমরা উৎকর্ণ থাকি ; প্রত্যেকেই ভাবি আজ আমাকে নেবে কিন্তু সবাইকে নেয় না, কোনোদিন ৮ জন, কোনোদিন ১২ জন, আবার কোনোদিন ৪ জন ৫ জনকেও নিয়ে যায়।

রাতের বেলা তারা ফেরে টলতে টলতে। আমরা যারা থেকে যাই, সারাদিন নানান কথার মধ্যেও ভাবি, যে ক'জন গেল সবাই ফিরবে তো ?

রাতের বেলা যখন ফেরে তখন মনে মনে গুনি। না, এ ক'দিনে একজনও মারা যায়নি, নতুন কাউকেও আনেনি ওখানে ; আর আনবে কোথায় ?

প্রথম যেদিন আমায় আনল ১০ জন ছিল সেদিন। আমাকে ভেতরে আটকিয়ে দিয়েই সেন্ট্রি দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে।

এতক্ষণ আমি যেন অন্য কারো শরীর কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেছি। দরজা বন্ধ হতেই সে শরীরের ভার আর বইতে পারলাম না, হোগলা বিছানো কোনো মেঝেতে অপরিচিত মানুষগুলোর মধ্যেই লুটিয়ে পড়লাম। ঘরের ভেতর চলে যেতে যেতে কারু কথা যেন শুনতে পেলাম : ভয় পেয়েছে। কিন্তু ভয়েরও রূপভেদ আছে। এমন হতো, আজকে এখন এই রাতে বলা হলো, কাল সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে তোমাকে বাইরে পাঁচিলের ধারে দাঁড় করিয়ে রেখে মারা হবে। তাহলে সেটা যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণে প্রতি মুহূর্তের যে ভীতি তার সঙ্গে এই যে, ততদিন সঙ্গীদের নিয়ে যাচ্ছে, টারগেট করছে, অত্যাচার করছে (এবং সবই নেপথ্যে) তারপর আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সেন্ট্রি দরজা বন্ধ করে চলে গেলে আমরা সেইসব সঙ্গীদের সেবা করছি, এর মধ্যকার ভীতি যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বলা যায়, ভয় করেও এই অপরিচিত দৈনন্দিনতার মধ্যে ভয়ের বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠছে, আমার প্রথম দিনের ভীতির সঙ্গে যার ফারাক অনেক। তার মানে কি ভয়ের একটা নির্দিষ্ট সীমা জেনে গেছি আমরা ? কিন্তু আমার নিজের ব্যাপারে স্থির-নিশ্চিত হতে পারছি না এখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেননা সেই যে এখানে নিয়ে এসেছে আমাকে, এর মধ্যে একদিনও কোনো জিজ্ঞাসাবাদ নেই, কোনো নির্যাতন নেই, শুধু বসে থাকা। আড়াই দিন পরপর রুটির ছেঁড়া ধারগুলো, আর পচা ডাল। এই একঘেয়েমি, টেনশন, ক্লান্তি, শরীর ব্যথা, ভার হয়ে থাকা মাথায় সর্বক্ষণের দপদপে যন্ত্রণা নিয়ে নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে ইচ্ছা করে, মনে হয় প্রচণ্ড চিৎকারে এই চারপাশের দেয়াল ধসিয়ে দিই।

কী করতে চায় এরা আমাকে নিয়ে ? আমার ছোট ভাই দীপু জুনের শেষ দিকে হঠাৎ বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে ৭/৮ দিন পর একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি ২০/২২ বছরের ছেলে এসে খবর দিয়ে যায় দীপু মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, মা তাকে বসিয়ে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, ছেলেটির বোধহয় সারাদিন খাওয়া হয়নি, মা ছেলেটির হাত ধরে খেয়ে যেতে বলেছিল, ছেলেটি দাঁড়ায়নি, খবরটা দিয়েই চলে গিয়েছিল।

ততদিনে মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা ঢাকা শহরের এখানে ওখানে বোমা ফাটাতে শুরু করেছে। এক সময় আমাদের এমন হলো যেদিন বোমার আওয়াজ শুনতে না পাই সেদিন মনটা বিমর্ষ হয়ে থাকে। কিন্তু আমি তো সেই ছেলেটিকে ছাড়া কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে দেখিনি, পরিচয় তো দূরের কথা। আমার প্রতিদিন প্রতীক্ষায় থাকলেও দীপু আজ পর্যন্ত পাঁচ মিনিটের জন্যেও বাড়িতে আসেনি কখনো। অন্তত গত বুধবার সকাল ছটা পর্যন্ত ; এর মধ্যে এসে গেছে কি না জানি না। আচ্ছা এমনকি হতে পারে, বাড়িতে এসে দীপু আমার কথা জেনেছে, আমি দীপুকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, বেবী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, গাল বেয়ে পানি নামছে। দীপু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। আব্বা চেয়ারে চুপ চাপ বসে থাকতে থাকতে ধীরে শান্ত গলায় বলল, ওকে দেরি করিয়ে দিয়ো না।

দীপু কী করছে এখন ? এমন কি হতে পারে, আমরা যে এখানে আছি এ খবর সে জেনেছে, সঙ্গীদের নিয়ে প্ল্যান করছে কীভাবে এই থানাটিকে হঠাৎ করে অ্যাটাক করা যায় ; খুব কঠিন কাজ, কিন্তু আমি তো তাঁর ভাই।

দূর, এসবই ছেলেমানুষী চিন্তা। কিন্তু আমাকে এখানে কেন ? যাদের ধরে নিয়ে এসেছে তাদের দু-তিনজন ছাড়া কারু বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই। তবু আমি ছাড়া আর সবাইকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, জেরা করছে, অত্যাচার করছে কম বেশি, কিন্তু আমার ব্যাপারে নীরব। আজ পাঁচ পাঁচটা দিন-এ-ও কি এক ধরনের শাস্তি। অত্যাচারের রূপ দ্যাখো আর টেনশনে ভোগো।

শাহীন খুব জুলিয়াস ফুচিকের রেফারেন্স দেয় কথায় কথায়। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় মনটা কল্পনায় ঠাসা। ওকে ধরেছে মালিবাগের কোনো রেস্টুরেন্ট থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জেরা, মারধর ওর ওপর দিয়েও গেছে বার কয়েক, কিন্তু ওর কথা হলো, জুলিয়াস ফুচিক কত অত্যাচার সহ্য করে মরেছে, সে তুলনায়...

ওর বোধহয় ভেতরে ভেতরে একটা বিশ্বাস ছিল যে, ও যখন মোর‍্যাল সাপোর্ট ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নয়, তখন ওকে ছেড়ে দেবেই, দুদিন আগে আর পরে। তাই অমন জুলিয়াস ফুচিক আওড়ায়। বেচারা নব্য যুবক, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পরেই এক লাফে বোধহয় 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' পড়েছে। কিন্তু সে বিশ্বাস কি ওর এখনো অবশিষ্ট আছে ? তাহলে ও মুখ দিয়ে অমন ঘড় ঘড় আওয়াজ করছে কেন, অমন কেঁপে উঠছে কেন থেকে থেকে ?

গত রাতে আতিক ভাইকে যখন ফেরত দিয়ে গেল তখনো আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। এমনিতেই আতিক ভাইয়ের ওপর টর্চারটা বেশি হয়। নিজে একদিনও তাঁর ওপর অত্যাচারের কোনো বর্ণনা করেননি, কিংবা সহজে দেখতেও দেন না।

তাঁর বাড়ির উঠোন খুঁড়িয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ট্যাংকভরতি অস্ত্র পেয়েছিল একটি ছেলের বিশ্বাসঘাতকতায়।

আতিক ভাই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, জেল খেটেছেন, '৫২-এর পর এদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। কিন্তু তবু ২৫ মার্চের পরও দেশ ছেড়ে যাননি। দিন কয়েক স্তব্ধ হয়েছিলেন, তারপর এক সময় যোগাযোগ স্থাপিত হয়, ধীরে ধীরে তাঁর বাড়ি হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি, অপারেশন করে এসে ছেলেরা তাঁর বাড়িতে উঠত, কিংবা এখান থেকে প্ল্যান হতো অপারেশনের, নতুন নতুন ছেলেদের রিক্রুট করে খেলাঘর ক্যাম্পে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন তিনি। বাড়ির লোকজন বহুবার তাকে বলেছে ওপারে চলে যেতে। তিনি যাচ্ছি যাব করে করে থেকে গেছেন। ভেতরে ভেতরে বোধ হয় দেশত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাছাড়া এখানেও তো অনেক কাজ, কাউকে না কাউকে থাকতে তো হবেই ! এসব কথা আজাদের কাছ থেকে শুনেছি, ফিজিক্স-এ এম. এসসি. ফার্স্ট পার্টের ছাত্র, আতিক ভাইয়ের কাছাকাছি বাড়ি।

আমি বলেছিলাম, এসব কথা যে বলছেন এটা কি ঠিক হচ্ছে ? টর্চারের মুখে কেউ যদি বলে ফেলি ?

আজাদ বলেছিল, প্রথমত, এসব প্রশ্ন আপনাদের কাউকে জিজ্ঞেস করবে না, বিকজ ইউ আর নট রিলেটেড উইথ হিম ইন দিস কনসার্ন। সেগুলো, যা জানার ওরা সবই জেনেছে, এখন এসব কথা বললে নিজের তো কোনো লাভ হবে না, বরং নিজেকে অহেতুক জড়ানো হবে। আমরা কে বাঁচি কে মরি জানি না, বিষয়টা জানা দরকার, সকলে হয়ত না-ও মরতে পারি, কারো না কারো স্মৃতিতে

~ www.amarboi.com ~
ব্যাপারটা থেকে যাবে, কেননা ইট ইজ সিওর, আতিক ভাইকে ওরা স্পেয়ার করবে না, হি উইল বি কিলড্, কিন্তু সেটা খুব যন্ত্রণাদায়ক, তাঁর জন্যে এবং আমাদের জন্যেও— এ তো বুঝতে পারছেন।

কাল রাতে যখন তাঁকে রেখে গেল আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলে তিনি শুধু বললেন, থাক, ঠিক আছে। তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। আমরা আর কোনো কথা বলিনি। খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল বোধহয়, থাকতে না পেরে এক সময় আমাকে বললেন, একটু শুই।

আমি তাঁর মাথাটি আমার কোলের ওপর রাখতেই দেখতে পেলাম আতিক ভাইয়ের একটি চোখ উপড়ে নিয়েছে, দুহাতের প্রত্যেকটি আঙুলের মাঝখান থেকে কেটে ফেলে দিয়েছে।

আমার ভেতর কী হলো বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলাম, লুক শাহীন। শাহীন ও অন্য সকলে আমার দিকে চমকে তাকাল, আমি আতিক ভাইয়ের চোখ এবং হাতের দিকে আঙুল নেড়ে শাহীনের উদ্দেশে তেমনি গলায় বললাম, হিয়ার ইজ ইওর জুলিয়াস ফুচিক।

হতভম্ব বিস্ফারিত চোখে সকলে তাকিয়ে আছে আতিক ভাইয়ের দিকে। শাহীনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ঝুলে পড়েছে, ওর অজান্তেই খাবি-খাওয়া মাছের মতো ঠোঁট দুটো নড়ছে অবিরত।

রাত শেষ হয়ে আসছে, একটু পরেই ভোরের আলো এসে পড়বে ভেন্টিলেটরের ফাঁকে, সেই আলোর সঙ্গে আসবে চড়ুইটা, কদিন থেকেই লক্ষ করছি আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ছোট পাখিটা এসে ডাকাডাকি করে ভেন্টিলেটরে বসে ; দেখে অপরিসর এই বাথরুমটায় তালগোল পাকিয়ে কজন মানুষ পড়ে আছে। কী বোঝে কে জানে খানিকক্ষণ লাফালাফি ডাকাডাকি করে আবার উড়ে যায় বাইরে। আমি তার অবাধ উড়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি, ভেন্টিলেটরের ওপারের ফাঁকা আলোকিত শূন্যতা বিশাল পৃথিবীটার আভাস দেয়।

আতিক ভাই নিথর হয়ে পড়ে আছে, কী অবলীলায় ওই বীভৎসতার দিকে তাকাতে পারছি। সমস্ত রুমটা জুড়ে এই যেসব পড়ে আছে, যেন অবহেলায় পড়ে থাকা লাশের স্তূপ।

শাহীন চোখ মেলল। চল্লিশ পাওয়ার বাল্বের আলোয় ওর ফ্যাকাসে মুখ আরো ফ্যাকাসে লাগছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের চোখে হাত দিয়ে দেখে, হাত দুটো চোখের সামনে মেলে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঙুলগুলো দেখে নিয়ে আবার কাত হলো। মুখে গোঙানির শব্দ শরীরটা মৃদু মৃদু কাঁপছে।

বাল্ব নিভে গেল। বাইরে ফর্সা হয়ে এসেছে। ভেন্টিলেটরে আলোর রেখা এসে পড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেন যেন বারবার মনে হচ্ছে আজ আমাকে নিয়ে যাবেই ?

কী, করবে ? পা ওপর দিকে বেঁধে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে চাবকাবে ? শরীরে সিগারেটের ছ্যাঁকায় ছ্যাঁকায় দগ্ধ করবে ? আজাদের মতো আমারও আঙুলের নোখ উপড়ে নেবে ? নাকি আঙুল কেটে ফেলে দেবে আতিক ভাইয়ের মতো ? অথবা এই আমার চোখ, যে চোখ দিয়ে এখন সঙ্গীদের দেখছি, ভেন্টিলেটর দিয়ে আসা আলো দেখছি, এই চোখ আমার থাকবে না ? কিংবা...

চড়ুইটা এসেছে।

কী দেখছ তুমি পাখি ? দেখছ কতকগুলো বন্দি মানুষ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে আছে।

কিন্তু তুমি কি জান, এরা তোমার চেয়ে স্বাধীন ? ওই দেখো, আতিক ভাই, চোখ উপড়ে নিয়েছে, দুহাতের সবগুলো আঙুল কেটে ফেলে দিয়েছে : তার প্রতি মুহূর্তের আর্তনাদের মধ্যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ওই যে শাহীন ভয়ে গোঙাচ্ছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে, ওর প্রতিটি গোঙানি, শরীরের প্রতিটি কম্পনের মধ্যে আছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। যারা এখন ঘুমিয়ে আছে, তারা কেউ-ই পরাধীন নয়।

এই যে আমি, আমার বুকের ভেতর আতঙ্ক গুরুগুরু করে উঠছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাকে একটি দেয়ালের ধারে দাঁড় করিয়েছে, আমার সামনে একটি উদ্যত রাইফেল। আমি সেই রাইফেলের নলের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে যেতে যেতে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছি, আর আমার মুখ দিয়ে জন্তুর মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে, সেই ভীতির মধ্যে স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা তেমন করে স্বাধীনতাকে তুমি কখনো অনুভব করবে না।

বাইরে ভারি বুটের শব্দ দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। চড়ুইটা উড়ে গেল, আমি শূন্য দৃষ্টি মেলে তার সেই অবাধ উড়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দরজা খোলার শব্দ পেলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারাপার

আকবর আলীকে আমি বেশ কিছুদিন ধরে খুঁজছি কোথায় যে গেল লোকটা।

আকবর আলীর বয়স ৩৫-ও হতে পারে, ৪০-ও হতে পারে রোগা, শ্যামলা, পোড়া পোড়া রং, মাথার চুল ভীষণ অবিন্যস্ত, দাড়িতে সপ্তাহে একবারও ক্ষুর বা ব্লেড পড়ে কি পড়ে না।

চোখে কালো ফ্রেমের খুব মোটা কাচের চশমা, ফলে সেই কাচের ভেতর দিয়ে ভাঙা-গালের শীর্ণ মুখে চোখ দুটোকে খুব তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল এবং বড় দেখায়।

রোগা-পাতলা আকবর আলীর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মোটা। খোঁচা দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে তার হলদে দাঁত বের করে আকবর আলী যখন গমগম করে হাসে তখন মনে হয় তার ভেতরটায় একটুও ময়লা নেই। কিন্তু যখন চুপচাপ বসে থাকে তখন তার চশমার ভেতর তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বল-জ্বল চোখের দিকে তাকালে যে কোনো মানুষকে অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে।

আকবর আলীর সঙ্গে পরিচয় আমার বেশি দিনের নয়। এক রেস্টুরেন্টে আলাপ হয় প্রথম। অল্প দিনেই বুঝেছিলাম, লোকটা বেশ রগচটা। কোনো বিষয়কে নাকচ করে দেয়ার সময় বিরক্তিতে তার রোগা মুখ কুঁচকে গিয়ে আরো কখনো তার অভিব্যক্তিকে এত তেজি করে দিতে পারে আকবর আলীকে দেখার আগে আমার জানা ছিল না।

আপনারা বুঝতেই পারছেন, এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। প্রথম দিকে এতটা কৌতূহল ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আর নিছক কৌতূহল ছিল না আমার সাথে বলা যায় বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই সেই মানুষ হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে গেল ব্যাপারটা প্রথম আমি জানতে পারি আকবর আলীর মেসে গিয়ে।

বেশ কিছুদিন থেকে লোকটার সঙ্গে দেখা নেই। একদিন ছুটির বিকেলে আকবর আলীর মেসে গিয়ে জানতে পারি, সপ্তাহ খানেক আগে সে মেস ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, কী বৃত্তান্ত মেসের লোকজন কিছুই জানে না। জানার গরজও নেই তাদের। লোকগুলো আকবর আলীর ওপর বেশ চটা মনে হলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি তার খোঁজে গেছি জেনে আমার দিকে এমন করে তাকাতে লাগল—মনে হচ্ছিল, আমাকে দেখে তারা কৌতুক বোধ করছে। ভাবটা এই রকম—ও, তুমি আকবর আলীর বন্ধু ! অর্থাৎ আকবর আলীর বন্ধু যখন তখন আমিও একটা পাগল। এখানে আমি একদিনই এসেছিলাম। আকবর আলীই নিয়ে এসেছিলেন আমাকে। (সরু, স্যাঁতসেঁতে গলির ভেতর খুব প্রাচীন নোনা ধরা একতলা বাড়িতে মেস।)

আকবর আলীর রুমটা একটা গুহা বিশেষ। বাইরের খোলা বারান্দার চেয়ে ঘরের মেঝেটা নিচু। ভেতরে ঢুকলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। শুধু একটা চাপা গন্ধ সেটা পুরনো দেয়ালের গন্ধ হতে পারে, আবদ্ধতার গন্ধ হতে পারে কিংবা দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা আকবর আলীর জামা কাপড়ের গন্ধ হতে পারে অথবা আকবর আলী যে এ ঘরে দীর্ঘদিন ধরে আছে তার অপরিচ্ছন্ন শরীরের গন্ধ এ ঘরের হাড়মাংসের ভেতর ঢুকে গেছে তার গন্ধও হতে পারে।

উঁচু সিলিং থেকে ঝুলন্ত তারের ডগায় একটি চল্লিশ পাওয়ারের বাল্ব। আকবর আলী সেই বাল্ব জ্বালিয়ে ঘরের একটিমাত্র জানালা খুলে বলে, বসুন।

এতক্ষণে বোঝা গেল, ঘরে একটা সরু তক্তপোষ আছে। সাদার ওপর সবুজ স্ট্রাইপের একটা চাদর অত্যন্ত পাতলা এবং শক্ত গদির ওপর বিছানো। চাদরের সাদা রং ময়লায় ময়লায় খানিকটা হলদেটে রং ধরেছে, সেই চাদরের ওপর চল্লিশ পাওয়ারের আলোয় আরো মলিন দেখায়।

বালিশের পাশে এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা সস্তা মলিন মশারি মাথার দিকে দেয়াল ঘেঁষে বেতের একটা বুক শেলফ—তাতে এলোমেলোভাবে কিছু বই, ছেঁড়া-খোঁড়া পত্র-পত্রিকা।

আকবর আলী আমাকে বসিয়ে রেখে একটা মগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কালাম কালাম বলে কাকে যেন ডাকাডাকি করল কোনো সাড়া না পেয়ে নিজেই চলে গেল চা আনতে

আমি দিনের বেলায়ও বাতি জ্বালানো ড্যাম্প ঘরে ভ্যাপসা গরমের মধ্যে বসে বসে জীর্ণ দেয়াল, পোড়া সিগারেটের টুকরো, দেশলাই কাঠি, খালি সিগারেটের প্যাকেট এবং ধুলোয় ভরা মেসের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম, আকবর আলীর উপযুক্ত আস্তানাই বটে।

চা খেতে খেতে আকবর আলী হঠাৎ প্রশ্ন করল, আচ্ছা আমাকে দেখে কী মনে হয় আপনার ? এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি। লোকটাকে আমি মোটামুটি জেনে গেছি। ঠিকঠাক মতো উত্তর না দিলে চটে যাবে।

কিন্তু চট করে কী বলা যায় ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বললাম, খুব ক্লান্ত দেখায় আপনাকে

আহ সে কথা নয়, ও তো যে কোনো লোককেই দেখাতে পারে। আমাকে কি পাগল মনে হয় আপনার ?

এবার প্রশ্ন শুনে খুব থতমত খেয়ে যাই—না, না, না, পাগল মনে হবে কেন ? কী যে বলেন ?—বলি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভারি অস্বস্তি বোধ করতে থাকি।

মনে হয় না ? আকবর আলী তার মুখটা আমার দিকে এগিয়ে এনে যেন খুব গোপনে খুব গোপন কোনো কথা বলছে, এমনভাবে বলল, আসলে কিন্তু আমি পাগল ছিলাম, জানেন ? তার চাপা ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, তার চোখ-মুখের অভিব্যক্তি—সব মিলিয়ে আমি ঘাবড়ে গিয়ে আকবর আলীর দিকে একটু বোকাটে ধরনের হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম।—বিশ্বাস হলো না। জানেন, একবছর আমি মেন্টাল হসপিটালে ছিলাম।

আকবর আলীকে যে রকম জানি তাতে নিজের সম্পর্কে এমন করে বলা ঠিক মানানসই মনে হচ্ছে না। কিন্তু সে বলতেই থাকে—একদিন, বুঝলেন তখন শীতকাল। আলনায় আমার বড় ভাইয়ের একটা কালো কোট ঝোলানো ছিল। কোটটাকে হঠাৎ মনে হলো একটা খুব বড় আকারের বাদুড়। মনে হলো আলনায় পা আটকে আমার দিকে তাকিয়ে ঝুলছে। আমি যত বার ভাবলাম ওটা বাদুড় নয় ততবার দেখলাম বাদুড়টা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বুঝলেন, এরপর থেকে আমার মাথার ভেতর খুব হালকা কিন্তু ভারি একটা ব্যথা শুরু হলো। তারপর একরাতে খোলা জানালার দিকে চেয়ে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখতে পেলাম জানালার বাইরে শূন্যতার ওপর একটি জানালা, সেই জানালায় একটি নীল পর্দা, পর্দার ফাঁকে একটি মেয়েলি হাত, সম্পূর্ণ হাত নয়, পাঁচটা আঙুল নিয়ে কব্জি পর্যন্ত হাতের একটা অংশ। দীর্ঘ ফর্সা মোমের মতো মোলায়েম সে আঙুলে কী যে লাবণ্য। ফুলের পাপড়ির মতো আঙুলগুলোর যেন রেণু মাখানো। সেই আঙুলে হাত ছোঁয়ালেই পাউডারের মতো রেণু লেগে যাবে হাতে।

বুঝলেন, আমি মেয়েটির মুখ দেখার জন্য রোজ অনেক রাত পর্যন্ত জানালার ধারে বসে থাকতাম। একদিন মনে হলো হাতটা আমাকে ডাকছে। বুঝলেন, স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই নেপথ্যসুন্দরী হাত নেড়ে ডাকছে আমাকে।

জানালার কাছে বসে বসে মনে হলো, আমি এসব জানালার বাইরে। আমার সামনে শূন্যতার ওপর সেই জানালা আর সেই হাত। আমি হাত বাড়াতে গিয়েই দেখলাম জানালা নেই, সেই বাদুড়টা ঝুলে আছে আমার দিকে তাকিয়ে।

তারপর আমি পাগল হয়ে গেলাম। বাড়ির লোকজন আমাকে পাবনা মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি করে দিল। সেখানে একবছর ছিলাম। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকবর আলী সেই জ্বলজ্বলে চোখে এমনভাবে তাকাল আমার দিকে, মনে হলো, তার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলে এখনই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম না, না, না, বিশ্বাস হবে না কেন, কিন্তু এখন তো আপনি একেবারেই সুস্থ।

শেষ কথাটা আকবর আলীকে খুশি করার জন্যে বললাম আকবর আলী আমার কথায় কান না দিয়ে বলল : কিন্তু পরশুদিন, বুঝলেন, পরশুদিন রাতে আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, একজন মানুষ তার ভেতরে কতজন মানুষের চরিত্র ধারণ করতে পারে ?

আলো নেভানো ছিল, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখলাম, জানালার গায়ে সেই বিশালদেহী বাদুড়টা ঝুলে আছে আমার দিকে তাকিয়ে।

এই পর্যন্ত বলে আকবর আলী হঠাৎ চুপ করে গেল।

আমি চুপ করে আছি, আকবর আলী মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছে।

এ নিস্তব্ধতা পাথরের মতো চেপে বসেছিল। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে শুনতে সমস্ত শরীর আমার ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

এই ঘর থেকে, আকবর আলীর সান্নিধ্য থেকে বাইরে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বুক ভরে বাতাস নেবার জন্যে যখন আমি অস্থির হয়ে উঠছি মনে মনে, তখন আকবর আলী আমার দিকে তাকাল। আচ্ছা, পাগল আর সুস্থ মানুষের ভেতর আসলে কি কোনো পার্থক্য আছে ?

এ প্রশ্নে আমি এবার খুব অসহায় বোধ করতে থাকলাম।

আকবর আলী বলল : প্রশ্নটা নিয়ে ক'দিন ধরে খুব ভাবছি, আমি যখন পাগল ছিলাম, তখন আমার মনে হয়নি আমি পাগল। এখন আপনি বলছেন আমি সুস্থ। কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না কেন আমি পাগল নই

আকবর আলীর স্বরে এমন কিছু ছিল, মনে হলো, এই অপরিসর, অপরিচ্ছন্ন ঘরের দেয়ালে সরে গেছে, মাথার ছাদ নেই। তারাভরা আকাশের নিচে, ফাঁকা প্রান্তরের ধারে, কোনো পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে সে

আকবর আলীর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা

আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে, আকবর আলী কেমন আছে এখন

সে কি তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়েছে ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নৈঃশব্দ্যের ভার

সাঁঝের মুখোমুখি গোলাগুলির আওয়াজ গলির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বাড়িটা একেবারে রাস্তার ধারে একতলায়, রান্নাঘরের ভেতরে এখন ৮/৯ জন মানুষ। এখান থেকে মূল দরজা বেশ অনেকটা দূরে, রাস্তা থেকে উঠে সেই দরজা দিয়ে ঢুকলেই সামনে একখানা ঘর, ঘর পেরিয়ে ভেতর দিকে আর একটা দরজা, সেই দরজার একপাশে আর একখানা ঘর এবং এ পাশের দেয়াল মিলিয়ে একটা গলিপথ সৃষ্টি হয়েছে, সেই পথের হাত দশেক দূরে আর একটি দরজা, তারপর চৌকো মতো ফাঁকা জায়গা, এখানে একটা কামরা হতে পারত, হয়ত আলো-বাতাস বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক জায়গাটা ফাঁকা রাখা হয়েছে, তারপরই অত্যন্ত সরু গলি সোজা চলে এসেছে রান্নাঘরে। গলির মুখে ঢুকতে বাঁ দিকে দোতলায় উঠে যাওয়ার সংকীর্ণ সিঁড়ি।

রান্নাঘর থেকে সোজা, গলিপথের শেষে, চৌকো জায়গাটার পর যে দরজা সেটা খোলা। সকলের দৃষ্টি এখন সেখানে

বাড়ির মূল দরজা বন্ধ, সামনের ঘরের ভেতরের দরজাও, তবু একদিকে তাকালেই হা করে থাকা দরজা গিলতে আসে।

এই বাড়িতে হাবিবরা আজ ২০/২১ বছর বসবাস করছে এখান থেকে দরজাটির দূরত্ব কত ? হাত পঁচিশেক হাবিবের বাপ বলে : 'দরজাটা খোলা রাখছে কে ?' হাবিবেরই প্রথম নজরে আসে ব্যাপারটা, অতএব দায়িত্বটা তার, এই ভাবনায় হাবিব আরো মুশকিলে পড়ে পিতার কথার কোনো জবাব দেয় না

একটা জিপ আসছে খুব ধীরগতিতে, মানুষগুলোর সমস্ত অনুভূতি এখন কানে এসে জমেছে। জিপটা আসতেই থাকে হাবিবের মা— রোগা কাঠির মতো শরীর, কাঁচাপাকা অত্যন্ত কোঁকড়ানো চুল, সব সময় উস্কোখুস্কো পাগলির মতো, হাবিবের কানে ফিসফিস করে : 'ওই, অখন কী করবি ?'

হাবিবের ঘাড় মাথা স্থির, চোখ দুটোও। সে শুধু হাতটা অল্প একটু তোলে। মা তাতেই চুপ করে যায়। কিন্তু তার দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে

দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা মাদুর যেমন ধীরে-ধীরে মেঝের ওপর হড়কে নেমে যেতে থাকে, হাবিবের মা তেমনিভাবে বসে পড়ে

সুন্দরবার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেঝের ওপর : বসেই বিড়বিড় করে : 'ইল্লা আন্তা সোভানাকা... ওই, ক্যাওয়াড় ধাক্কাইলে কী করবি ?'

— 'আহ্, দে তো পাগলটারে বাইর কইরা দে।' হাবিবের বাপ দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলোকে চিবোয়

জিপটা থামে হাবিব দেখে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বুলা চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে

— 'হাবিব, হাবিব !' দরজায় মৃদু টোকা পড়ে হাবিব দরজার দিকে এগোয় রান্নাঘরের এই পেছন দিককার দরজার দু'পাল্লাতেই ওপর দিকে শিক লাগানো ছোট্ট ঘুলঘুলির মতো জানালা, সে দরজা না খুলে সে ঘুলঘুলির একটা পাল্লা খোলে।

— 'আমি, দরজা খোল !'

হরেন্দ্র ঘরে ঢোকে। পেছনে তার দশ বছরের ভাইপো।

— 'আপনি আইলেন ক্যা ?'

হরেন্দ্র কথাটা যেন শুনতে পেল না, কিংবা কথাটার ভেতর যে কোনো গূঢ় অর্থ থাকতে পারে তা-ও ভাবল না।

— 'তোমরা সব এইখানেই আছ, ভালো করছ।' কথা বলতে বলতে হরেন্দ্র ঘরের ভেতরের মানুষগুলোকে দেখে

দরজা লাগিয়ে ফিরে তাকাতেই দেখে, এক বাবা ছাড়া আর সবাই মেঝের ওপর একে ওপরকে আঁকড়ে ধরার মতো করে বসে আছে।

এর মধ্যেও সে একটু অবাকই হয় সে শুধু এক মাকে বসতে দেখেছিল। মা কখন বসল ? হরেন্দ্রকে দরজা খুলে দেবার সময় ? এই অল্প সময়ের মধ্যে সবাই এক সঙ্গে বসে পড়ল, না মা বসার আগেই সবাই একে-একে বসে গেছে, সে লক্ষ করেনি

বাবা, মা, নিজের বোন, চাচাতো ভাইবোন, তার ওপর এখন হরেন্দ্র এবং তার ভাইপো— ছোট্ট একটা ঘরের ভেতর এতগুলো মানুষ অথচ কোনো শব্দ নেই

হরেন্দ্র কথা বলত, কিন্তু ঘরের পরিবেশ এবং জিপ থামার শব্দ তাকে থামিয়ে দিয়েছে।

তবু হাবিবকে দরজা বন্ধ করতে দেখে সে বলেছিল : 'বন্ধ কইরো না, খুইল্যা রাখ।'

তার মানে প্রয়োজন পড়লে হরেন্দ্র দৌড়ে পাঁচিল টপকে মেথর প্যাসেজে নেমে যাবে।

ফিকে ফিকে ভাবটা সরে গিয়ে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে, বসে থাকা দাঁড়িয়ে থাকা মুখগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে ক্রমে। তবু এখনো চেনা যায়। হাবিব

আমার বই
পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সবগুলো মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ভাবে, দরকার পড়লে হরেন্দ্র তার ভাইপোকে নিয়ে ভাগবে, কিন্তু সে ?

চাচা-চাচি এখন ওপরের ঘরে।

গোলাগুলির আওয়াজ যখন দূর থেকে ক্রমে কাছে আসতে আসতে গলিতে ঢুকল সকলের সঙ্গে চাচাও এখানে এসে ঢুকেছিল, খানিকক্ষণ পর ওপরে উঠে গেছে। হাবিব কিছু বলেনি, হাবিবের বাবাও নয়। বলে কোনো লাভ হতো না।

যাবার সময় স্ত্রী ছেলেমেয়েকে বলেছিল : 'চল উপরে যাইগা।'

ছেলেমেয়েরা সাড়া দেয়নি, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিঃশব্দে স্বামীর পেছনে পেছনে চলে গেছে।

বাবার পেছনে মার চলে যাওয়ার দিকে এক পলক তাকিয়ে মাথা হেঁট করে ছেলেমেয়েরা। হাবিবের চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। বাবা হয়ত ছেলেমেয়েদের সামনে লজ্জা পায়। কেননা হাবিব দেখে বাবা শূন্য মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে

হরেন্দ্র বাড়ির লোকজনকে কাপাসিয়ায় তাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে দিন পনেরো আগে

দোকান ফেলে হরেন্দ্র যেতে পারে না। হরেন্দ্র'র জন্যে তার বুড়ি মা'ও থেকে গেছে। ভাইপোটি তার ঠাকুর মার বড় ন্যাওটা। ঠাকুর মাকে ফেলে সে কোনোমতেই যাবে না। হরেন্দ্র'র দাদা বীরেন্দ্র অগত্যা ছেলেকে রেখে নিজের এবং ছোট ভাইয়ের পরিবার নিয়ে চলে গেছে।

এসব কথা হতে পারত এতক্ষণ। কিংবা গতকাল পর্যন্ত মানুষ যেমন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছে সেই ধরনের আলোচনাও হতে পারত, কিন্তু এতগুলো মানুষ নিয়েও অন্ধকার ঘরটা পোড়োবাড়ির মতো খাঁ-খাঁ করছে।

হাবিবের বাপের পা ব্যথা করছে বোধ হয়। তিনি এক পা থেকে আর এক পায়ে শরীরে ভার চালান করছেন থেকে-থেকে। হাবিব একবার বলতে চায়, 'আপনি বসেন।'

কিন্তু বসেন না। ইচ্ছাই হয় না

বুটের শব্দ হচ্ছে। এমনিতেই রান্নাঘর এত দূরে যে, রাস্তায় খুব হইচই না হলে কোনো শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু এখন ভারি বুটের প্রতিটি পদক্ষেপ একটা-একটা করে গোনা যাচ্ছে। সংখ্যায় বেশি নয়, কয়েক জোড়া পা যাওয়া-আসা করছে এদিক থেকে ওদিকে।

গোলাগুলির শব্দ অনেক আগে গলি বেয়ে দূরে চলে গেছে।

—এখন শুধু কয়েক জোড়া পদক্ষেপ, সুশৃঙ্খল, আত্মবিশ্বাসী এবং গম্ভীর। বোঝা যায় যাওয়া আসার দূরত্বটা ছোট হয়ে আসছে ক্রমে।

হাবিব বমির শব্দ শুনতে পায়। শব্দ চেপে চেপে বমি করছে কে যেন।

হাবিবের বাপ চাপা গলায় ধমকে ওঠে : 'আস্তে !'

পুনরায় পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই ধমকে কোনো কাজ হয় না হাবিব প্রস্রাবের গন্ধ পায়।

এখন যদি বাইরে যাওয়া যেত। কোনো ফাঁক জায়গায়, যেখানে প্রচুর হাওয়া, মাথার ওপর আকাশে অসংখ্য তারা ! হাবিব তারার নাম মনে করতে চায়। কিন্তু এই ইচ্ছাও থাকে না।

আস্তে আস্তে সে বসে পড়ে। খুব অবিশ্বাস্য মনে হয় তার, এই যে সে বাবা-মা ভাইবোন পড়শি মিলিয়ে এতগুলো মানুষ নিয়ে রয়েছে এই ঘরে। কারুর মুখ দেখা যচ্ছে না, তবুও আছে, অথচ মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে যেতে পারে। আহ্, ব্যাপারটা যদি হঠাৎ হতো, কোনো কিছু জানি না, মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তাহলে খুব ভালো হতো।

হরেন্দ্র'র মা হরেন্দ্রকে বলেছিল, 'তরা দুইজন যা গিয়া, আমি বুড়ো মানুষ, আমারে কিছু কইবো না।'

হরেন্দ্র মুহূর্ত-কয়েক ভেবে ভাইপোর হাত ধরে বলে : 'তাড়াতাড়ি চল্।' গোপাল একটু ইতস্তত করে, একবার ঠাকুর মা'র দিকে তাকায় ঠাকুর মা তার মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে : 'গোবিন্দ, গোবিন্দ !'

সেই গোপাল এখন উবু হয়ে বসে থাকা কাকার হাঁটুতে মুখ-মাথা ঠেকিয়ে গায়ের সঙ্গে সেঁটে বসে আছে।

হরেন্দ্র মৃদু স্বরে ডাকে : 'গোপাল !' কাকার এই ডাকে গোপাল ফুঁপিয়ে ওঠে। হরেন্দ্র বলে : 'চুপ, চুপ !'

কাকা আর সে পাঁচিল টপকে যেমন করে এখানে এসেছিল, ঠাকুমারে কি তেমুন কইরা আনন যায় না এইখানে ! গোপাল এই কথাগুলো বলতে চায়, পারে না।

বুটের আওয়াজ থেমে যায়। দরজা ধাক্কানোর শব্দ হতে থাকে। মা হাবিবের কাঁধে ঝাঁকুনি দেয়, 'অই, ক্যাওয়াড় ধাক্কাইতাছে !'

নিচু হয়ে থাকা সবগুলো মাথা জেগে ওঠে। কারুরই চোখ-মুখ দেখা যায় না অন্ধকারে। কিন্তু হাবিবের কল্পনা করতে কোনো অসুবিধে হয় না

বাবা শুধু বলে : 'দরজাটা '... হাবিব খোলা দরজার দিকে তাকায়

—'হরেন্দ্র গো ক্যাওয়াড়ে !' মা এমন ফিসফিস করে বলে যেন হরেন্দ্র বা তার ভাইপো শুনতে না পায়।

দরজা ধাক্কানো চলতেই থাকে। হরেন্দ্র মাথা উঁচু করে... চেয়ে আছে সামনের দিকে। ঠিক সামনের দিকেও নয়, তার চোখের কোনো দৃষ্টি নেই। তাছাড়া সমস্তটাই অন্ধকার। সে কান দিয়ে শব্দ এবং দৃশ্য দুটোকেই একসঙ্গে পেতে চাইছে।

হাবিবের মা ছেলের উঠে দাঁড়ানো রেখাটি দেখতে পায়।

—'কই যাস !' মা-ও উঠে পড়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—'ক্যাওয়ারডা বন্ধ করুম।'

হাবিব রান্নাঘর থেকে বেরোয়। যেন চোখ বেঁধে তাকে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমনভাবে সে এগোতে থাকে।

হরেন্দ্রদের বাড়ির দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যায়। গোপাল কঁকিয়ে ওঠে : 'ঠাকুমা গো...'

হাবিব ঠোঁট কামড়ে ধরে। এখন শুধু একটি শব্দের প্রতীক্ষা। শব্দটি অবাঞ্ছিত মোটেই কাম্য নয়। কিন্তু অমোঘ।

পেছনে পিতা। হাবিব আবার ঠোঁট কামড়ায়। কিছু দরকার। সে এখন কিছু চায় না। দেহের ভেতর সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। রগ টনটন করছে তার। সে শুধু শব্দটি শুনতে চায়। শব্দটি হলে সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে শরীর আরামের নিশ্বাস ছাড়বে। পিতা-পুত্র দরজার কাছাকাছি এসে যায়। হাবিবের পা টলে। সে দরজা লাগাবার জন্যে এখানে এসেছে একথা বহুদূরের কোনো স্মৃতির মতো ঝাপসাভাবে মনে আসে। আর এ সময় কড়াং করে হাবিবের প্রত্যাশিত শব্দটি উচ্চারিত হয়।

কোনো আর্তনাদ শোনা যায় না। কোথাও কোনো শব্দ জাগে না। আর চারপাশে কী বিপুল নৈঃশব্দ্য ! হাবিব সেই নৈঃশব্দ্যের কাছে ধীরে ধীরে নতজানু হতে থাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোপাল কামারের তলোয়ার

এ কাহিনী খুবই পরিচিত, একান্ত সাদামাটা। তবু এ মানুষের কাহিনী— মানুষের কাহিনী কখনো পুরনো হয় না।

গোপাল বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের এক উপজেলা সদরের লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দা।

বংশগতভাবে সে কামার।

বাড়ি বলতে পুরনো আমলের দু'কামরা মাটির ঘর। খোলার চাল

প্রয়োজনের তাগিদে ঘর একখানা তুলতে হয়েছে গোপালকে ; সে ঘর, মাটিরও নয় ; ইটেরও নয়, বেড়ার। সেখানে থাকে কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণ ওরফে নারু।

ঘরের ভেতরে, চারপাশে বেড়ার গায়ে সিনেমা পত্রিকা থেকে হলিউড, বোম্বে, লাহোর, কলকাতা, ঢাকার তাবৎ নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র ভঙ্গির ছবি সাঁটা, তাতে বেড়ার ঘরের আবরু এবং শোভা যেমন বজায় হয়েছে, তেমনি শ্রীমান নারু তাদের উষ্ণ সান্নিধ্যে পরম তৃপ্তিতে নিশি যাপন করে।

বাজারের এক ধারে বিশাল এক ছাতিম গাছের নিচে গোপালের কামারশালা। গোপালের বাপ পঞ্চানন কর্মকারও এখানে বসে কাজ করত।

আগে ছিল গোলপাতার ছাউনি, গোপালের বিয়ের বছর চারেক আগে এক চৈত্র মাসের দুপুরে কীভাবে না কীভাবে আগুন লেগে বাজারের অনেকগুলো ঘর পুড়ে গিয়েছিল— সেই থেকে গোলপাতার জায়গায় টিনের চাল বহাল হয়েছে, সে টিনও জীর্ণ হয়ে এখন বাতিলের পর্যায়ে। বর্ষা বাদলে মাটির মেঝে চষা মাঠ হয়ে যায়। সামনের দিকটা দেয়াল— সমান খোলা। বাঁশের বাতার খোপ খোপ ঝাঁপই বলো আর দরজাই বলো, দু'পাশ থেকে সে দুটোকে ঠোঁটে ঠোঁটে সেঁটে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে এ মাথায় ও মাথায় এবং মাঝখানে শেকল দিয়ে তালা লাগিয়ে গোপাল রাতের বেলা বাড়ি ফেরে।

কামারশালার ভেতরটায় ছায়া ছায়া শীতলতা। সেখানে কর্মক্লান্ত হাপর, হ্যামার, হাতুড়ি, সাঁড়াশি, কাঠ কয়লার স্তূপ রাত দশটার পর ঘুমিয়ে পড়ে। একটি

~ www.amarboi.com ~
বড় জালার নিচের অংশটা ভেঙে হাঁড়ির মতো করা, তার পানিতে মশককুল মনের সুখে বংশবৃদ্ধি করে সারারাত।

রাত বাড়তে থাকলে বাজার লোকালয়, মাঠ-প্রান্তর আর মানুষের থাকে না। আগুনের মালসা মাঠের ওপর দিয়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে এসে বাজারের শেষ মাথায় তেঁতুল গাছে গিয়ে ওঠে। সেখান থেকে কালো লিকলিকে ঠ্যাং বাড়িয়ে দিয়ে আর এক প্রান্তে যোগেশ পালের কাঠের গোলার অদূরে, বটগাছের ডালে দোল খায়। কেউ কেউ কটকট করে হাসতে হাসতে বাজারের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ডিগবাজি খেতে খেতে চলে।

একরাতে গোপালের বাপের হাত থেকে মাছ নেবার জন্য ঐ তেঁতুল গাছের ডাল থেকে সটান হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। গোপালের বাপ শিবনাথের আখড়া থেকে গাঁজা টেনে ফিরছে, মেজাজই তার আলাদা তখন ! মাছ চাইলেই হলো !

পঞ্চু কামার হাঁকাড় দেয়, কুন শালারে...

তারপর অবশ্য আর কিছু মনে নেই তার। দশদিন পর যখন বিছানা ছেড়ে উঠল সেদিন তার মনে পড়ে, খাল থেকে হাঁক পেড়ে যে তাকে থামিয়ে তীরে নৌকো ভিড়িয়ে নামমাত্র দামে পাঙাশ মাছটা দিতে দিতে বলেছিল, মাছখান বড় সরেস রে, খায়ে দেহিস—সে ছিল দামোদর জেলে তিরিশ বছর আগে যে মরে গেছে কলেরায়।

ছাতিম গাছটির পায়ের ঢালুর নিচে নালা। নানারকম আগাছায় সারা বছরই প্রায় ঢেকে থাকে। দু'পাশ ঝাঁপানো আগাছায় ঢাকা সেই শুকনো খটখটে নালা দিয়ে আষাঢ়-শ্রাবণে বর্ষার ঢল ঘুরতে ঘুরতে ছোটে মাঠ-প্রান্তরের দিকে।

ছাতিম গাছের কাছে দাঁড়ালেই অদূরে বিস্তৃত ক্ষেতখামার, সেই সঙ্গে লী লী করা দিগন্ত রেখার খানিকটা নজরে আসে। মাঠের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে উঠেছে বিশাল বিশাল ইলেকট্রিক পোস্ট, তার মাথায় কাছির মতো টানা তারের লম্বমান প্রবাহ।

ছাতিম গাছের গোড়ায় পোড়া কয়লা আর ছাইয়ের স্তূপ। প্রস্রাবের বেগ ধরলে গোপাল এই গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে বসে।

গোপালের পূর্বপুরুষরা শোনা যায় ছিল রাজা প্রতাপাদিত্যের অস্ত্রশালার কারিগর। ঢাল তলোয়ার থেকে কবে তারা কাস্তে, বটি, দা, খুন্তিতে নেমে এসেছে সে কথা গোপাল জানে না। বাপের কাছ থেকে এইটুকু কেবল শুনেছে, তাদের আদি নিবাস ছিল পূর্ণিয়ায়।

ক'দিন ধরে অজানা অদেখা সেই সব পূর্বপুরুষের কথা খুব মনে হচ্ছে গোপালের। মনে হওয়ার অবশ্য কারণও আছে।

নাতির ফরমায়েস, তলোয়ার বানিয়ে দিতে হবে তাকে। বয়েস তার বছর নয়েক। ক'দিন আগে সে মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে যাত্রা দেখে এসেছে— 'বর্গি এল বঙ্গে'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই থেকে ঝোঁক ধরেছে, তলোয়ার বানিয়ে দাও। যে সে তলোয়ার হলে চলবে না, আলীবর্দি খাঁর মতো তলোয়ার চাই।

হাট থেকে তার মামা পাতলা টিন কাটা ছেলে ভুলানো তলোয়ার একখানা কিনে দিয়েছিল যদিও, কিন্তু আলীবর্দি খাঁর সংলাপের সঙ্গে একবার ঘোরাতেই সে তলোয়ার দুমড়ে গেছে, অতএব তলোয়ার খানা হওয়া চাই মজবুত।

সোজা আর লম্বা হওয়া লাগবি, এই দ্যাহো তোমারে আঁকোয়ে দেহাই্। খাতার ওপর পেন্সিল দিয়ে সে ডিজাইনও করে দিয়েছে। ধরবার জায়গায় নিচির দিকি এম্বা চাঁদের মতন করে দেবা বুজিছ তো ? আর শোনো, তরোয়ালের মুখটা করবা চোক্‌খা।

এই নিয়ে দাদা-নাতিতে বেশ খানিকটা দরকষাকষি হয় : হ্যাঁ, চোক্‌খা তরোয়াল দিয়ে তুমি একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাও।

নাতির বায়না মেটাতে টিনের পাত চাই, টিন কাটা কাঁচি চাই। গোপালের কাজ লোহা নিয়ে, তার সব ভারি ভারি যন্ত্র।

গোপালের স্ত্রী শৈলবালা ধমকায়, ছ্যামড়ায় যত আদেখলা বায়না, আর উনিও আছেন তেমনি, নাতি কোল উনিও ন্যেইচে উঠলেন।

— ন্যেইচে উঠতি দেখলি আবার কোয়ানে, বুজোয়ে-সুজোয়ে কোনো মতে...

— উরে চালাক, ফাঁকি দিতি তাও আমারে ?

নিজে বোকামিতে নাতির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে গোপাল হাসে, হ্যাঁরে পাগল, তরোয়াল দিয়ে তুই করবিডা কি ক'দিন ?

— বর্গি মারব।

— বর্গি মারবি ? বর্গি কোয়ানে ?

— কত্তো বর্গি ! চারদিকি বর্গিতে এহাবারে গিজগিজ করতিছে !

ছেলেমানুষি খেয়ালেই বলে কথাগুলো ; কিন্তু সামনের দিকে হাত প্রসারিত করে এ মাথা থেকে এ মাথা তর্জনী দিয়ে এমন করে দেখায়, যেন উঠোনের ধারে শৈলবালার সিম শসা থেকে শুরু করে তার পেছনে কলা, পেঁপে ও অন্যান্য গাছপালা শ্রীমান তপনকুমারের তলোয়ারের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে তলোয়ার এসে গেলেই শুরু হয়ে যাবে তুমুল যুদ্ধ।

শৈলবালা আতঙ্কে হা হা করে ওঠে, খবরদার ওসব তরোয়াল মরোয়াল বানা দেবা না, ছ্যামড়া আমার গাছপালা সব নিকেশ করবি।

আলীবর্দি খাঁ বর্গি ঠেকালেও গোপাল নাতি ঠেকাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত টিনের পাত, টিন কাটা কাঁচি— সবই আসে। গোপালের ছেলে নারুই সব যোগাড় করে এনে দেয় কোথা থেকে। সে এখন পারে না কি ? চেয়ারম্যানকে জেতাবার জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছে না সে !

~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে নারু থাকে না বড় একটা। সময় কোথা তার ? শার্ট প্যান্ট, হাতে ঘড়ি : চল বউদি, গুরুর বই দেখোয়ে আনি।

—গুরু কিডা ? ছবিরানি হাসিমুখে ভ্রূতে টঙ্কার তোলে।

—গুরু তো একজনই, অমিতাভ বচ্চন। আমরা ভিসিআর চালু করিছি। টিকিট সিস্টেম। তোমার জন্য ফ্রি। পয়সা লাগবি না।

—ওমা তাই ! ছবিরানি একেবারে খুকি হয়ে ওঠে।

ছবিরানির স্বামী সহদেব খালিশপুরে মিলে চাকরি করে, বাড়িতে আসে পনেরো দিন অন্তর।

ন'বছরের তপনের পর ছবিরানির আর কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি এ পর্যন্ত ! লম্বা ঠাস বাঁধুনির শরীর লাস্যে কলকল করছে সব সময়। তার ইচ্ছা সে সহদেবের সঙ্গে খালিশপুরে থাকবে। এখানে এই ঝুপসী অন্ধকারে রাত জেগে বসে বসে কুপির আলোয় শাশুড়ির সঙ্গে ঠোঙা বানিয়ে আর কত কাল ! শ্বশুর লোহা পিটিয়ে আর ক'পয়সা পায়। ঘর ভিটেটুকু ছাড়া এক ছটাক জমি নেই। কী ভবিষ্যৎ আছে এ সংসারের ! বলতে গেলে গোটা সংসারটা চলে সহদেবের ওপর। তাহলে ?

কিন্তু সহদেব রাজি হয়নি। বৃদ্ধ বাপের ক'পয়সাই বা রোজগার। নারুর কোনো জ্ঞানবুদ্ধিই হয়নি। ওর হাতে বুড়ো বাপ-মাকে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে না। সহদেব তো আর সাধ করে মিলের মজুর হয়নি। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে যাওয়া মানে আর একটা সংসার।

দু'সংসারের বোঝা টানার হিম্মত সহদেবের নেই।

কিন্তু অবুঝ মেয়েমানুষকে এসব বোঝাতে যাওয়া ঝকমারি।

সে স্ত্রীকে বলে, তুই পাগল হইছিস। মিলির বস্তিতে মানুষ থাহে ? নরক, নরক ! ছবিরানি নরক দেখেনি। মিল-কারখানা মানে সিনেমা-থিয়েটার, হিমানি— পাউডার, বিজলিবাতি। নিজের আলাদা সংসার। স্বাধীন, নির্ঝঞ্ঝাট।

—আসলে তুমি নিতি চাও না। তোমার ফুর্তিতে কোম পড়বি।

—ফুর্তি আবার দেখলি কোয়ানে ? খাটতি খাটতি পিরান যায়, উনি দেখেন ফুর্তি !

—পুরুষ মাইনষেগের কতা কিছু কওয়া যায় ?

—অ, তুই এই সবই ভাবিস !

—আমি কী ভাবি না ভাবি তার দাম দিতিছে কিডা !

খুব ভেতরে সহদেব খানিকটা জ্বালা অনুভব করে। কী কষ্ট করেই না সে থাকে !

আর ই মিয়ামানুষ সে কথা ভাবেই না বলে কি না ফুর্তিতে কোম পড়বি !

আমার বই
পুরানো পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছবিরানি পাশ ফিরে শুয়ে আছে, তার দীঘল শরীরের খাঁজে খাঁজে নোনা ঢেউয়ের থমথমে নিস্তব্ধতা। সহদেব সেদিকে হাত বাড়ায় : তুই এত বোকা ক্যানো ক'দিনি ?

এ কথায় কতটা মমতা আর কতটা মোহ বলা মুশকিল। ছবিরানি নড়ে না। সহদেব এবার পেছন থেকে সাপটে ধরে গালের ওপর গাল ঠেকিয়ে বলে, এরাম চ্যাম্পিয়ন বউ থাকতি কুনো পুরুষ বাইরে ফুর্তি করে না, বুঝলি ?

ছবিরানি বলে— ছাড়ো আর সোয়াগ লাগবি না !

সেই ছবিরানি ভিসিআর-এর নামে খুকি হয়ে উঠবে না তো কে হবে ?

গোপাল ভিসিআর দেখেনি। ছিল নাকি এসব ?

নোনা লাগা কালচে টিনের হুমড়ি খেয়ে পড়া খান কয়েক দোকান ঘর, চার খুঁটির ওপর গোলপাতার ছাউনির কখানা চালা ঘর, বাঁকের মুখে বটতলায় দু-তিনটে গরুর গাড়ি, বলদগুলো তার ছায়ায় বসে জাবর কাটে, একটা মাত্র রাস্তা খালপাড় পর্যন্ত। সে রাস্তাও কাঁচা। পাকা বলতে এক ফোঁটা থানাটি।

দূরে দূরে গাছপালায় ঠাসা এক একখানা গ্রাম। চারদিকে নিচু ফসলের জমির বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝখানে দ্বীপের মতো বাজারই বলো আর গঞ্জই বলো— এই ছিল নয়নপুর। এখানে সিনেমা হলই কোথায় আর ভিসিআর-ই কোথায় ? শীতের সময় বরিশাল থেকে ফরিদপুর থেকে যাত্রা দল আসত। মানুষ রাতভর যাত্রা দেখত।

তারও আগে, সেসব গোপাল দেখেনি, তার বাবার মুখে শুনেছে, গোটা এলাকাটা ছিল গভীর জঙ্গলে ভরা। গ্রামের ভেতর দিয়ে বাঘ চরে বেড়াত। মানুষ ঘরে ঢুকত সন্ধ্যার আগেই। তখন বাজারই কি গ্রামই কি গোটা এলাকাটাই হয়ে যেত জনশূন্য জঙ্গলের অংশ।

গ্রামে ছিল খুব প্রাচীন এক কালী মন্দির। লোকে বলত সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি। সেই মন্দিরকে ঘিরেই মানুষের বসতি। পাল বাড়ি, নাগ বাড়ি, ঘটক বাড়ি, মুখুজ্জে বাড়ি, দত্ত বাড়ি, মিশ্র বাড়ি— মুসলমান পাড়া খানিক তফাতে।

মিশ্রদের সম্পর্কে শোনা যায় সেই কোম্পানি আমলে কালা-ধলার লড়াইয়ে এক দেশি সিপাই ব্যারাকপুর থেকে পালিয়ে এসে এই গ্রামে ছিল অন্য আর একজন সঙ্গী নিয়ে, অন্যজনের খবর জানা যায় না, বদ্রিনাথ মিশ্রই মন্দিরের পূজারি হয়ে থেকে গিয়েছিল এখানে।

সে মন্দির এখন আর নেই, '৭১ সালে ধ্বংস হয়ে গেছে, কষ্টিপাথরের অমন বিশাল কালীমূর্তিটিও উধাও, কালীবাড়ি এখন প্রাইমারি স্কুল।

গোপালের মাথাটা বেশ বড়। ছেলেবেলায় তাকে দেখে নিবারণ চক্রবর্তী বলেছিল, পঞ্চু তোর ছেলেকে স্কুলে দে, মাথাখান দেহিছিস ঠিক যেন

~ www.amarboi.com ~

বিদ্যাসাগরের মাথা। পঞ্চু কামার একবার ছেলের মাথা একবার নিবারণ চক্রবর্তীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাকলে পণ্ডিত মশাই খেকিয়ে ওঠে, হতভাগ্য মুখ্যু, গাঁজা টেনে, পাঁঠা কেটে আর লোহা পিটিয়ে মগজের মাথা খায়ে বইসে আছিস, বুঝবি কী করে...

স্কুলের একগাদা ছেলের সামনে, তার নিজের ছেলের সামনে এ ধরনের ভর্ৎসনায় পঞ্চু লজ্জা পাবে কি, সে পণ্ডিত মশাইয়ের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে : কার লেখাপড়া কেমন হবে তা মাথা দেখে বলা যায়—এমন কথা সে বাপের জন্মেও শোনেনি !

পঞ্চু অন্যান্য ছেলের মাথার দিকে তাকায়, কারো বেলের মতো, কারো হুঁকোর মতো—ছোট ছোট মাথার সারির সঙ্গে নিজের ছেলের মাথার তুলনা করতে গিয়ে কেমন এক ধরনের ভয় মেশানো রোমাঞ্চই অনুভব করে।

ততক্ষণে নিবারণ পণ্ডিত একখানা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ খুলে পঞ্চু কামারের সামনে তুলে ধরে, দ্যাখ্ হতভাগ্য দ্যাখ্, এই হলো তোর গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মাথা দেহিছিস ?

পঞ্চুর ছেলে গোপালও দেখে, গায়ে চাদর জড়ানো, গোঁফ-দাড়ি কামানো একজন লোক, চওড়া কপাল, বড় মাথা।

উত্তেজনায় গোপাল নিজের মাথায় হাত দিয়ে ফেলে, তার মাথার মতো বিদ্যাসাগরের মাথা শুধু বড়ই নয়, ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুলও তার মতোই।

বাংলাদেশে, বুঝিছিস, এমন মানুষ কহনো হয়নি আর হবিও না। যেমন বিদ্যে তেমনি দয়া। বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর।

পণ্ডিত মশাইয়ের চোখ ছলছল করে। তার ধরে-আসা গলার স্বরে অভিভূত পঞ্চু কী করবে ভেবে না পেয়ে ছবির মানুষটির দিকে তাকিয়ে দুহাত কপালে ঠেকায়। বাবার দেখাদেখি গোপালও।

বাপ-বেটার ভক্তি দেখে নিবারণ চক্রবর্তী উৎসাহিত হয়ে বলে, বাওনের ছেলে, বাড়ুজ্জে ; কিন্তু গরিব, কত কষ্ট করে লেহাপাড়া শিখিছেন, বড় হইছেন, মানী হইছেন, দেশ-জোড়া নাম হইছে।

গোপাল তার কামারশালায় বসে বসে তামাক টানতে টানতে বহুদিন মনে মনে হেসেছে, কোথায় বিদ্যেসাগর, বাওনের ছেইলে আর কোথায় শালা আমি কামারের বাচ্চা কামার-মাথা বড় হলেই হলো ? পণ্ডিত মশাইয়ের যেমন কথা ! নিবারণ পণ্ডিতের ওই এক স্বভাব ছিল, লোক পেলেই হলো, ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাও।

নিজের একটিমাত্র ছেলে তা-ও পাগল। পরের ছেলেকে মানুষ করানোতে কী যে সুখ তা সে নিবারণ পণ্ডিত আর তার ভগবানই জানত !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লোকে আড়ালে বলত ছেলেধরা পণ্ডিত। সামনে বলত, মাস্টার মশাই, গরিব মানুষ, নিজেগোর প্যাটের জোগাড়ই কত্তি পারি না ...

ওই তোদের এক রোগ ; আচ্ছা, হুই দ্যাখ, মাঠে যে গরুডা চরতিছে অ-ও পৃথিবীতে আয়েছে, তুইও আয়েছিস, তোর পোলাডাও আয়েছে, অ-ও খায়, তুইও খাস, তোর পোলাও খায়, তাহলি তুই, তোর পোলা আর ওই গরুডা কি এক ?

— তা হবি ক্যানো ? ওডা তো গরু, আর আমরা হলাম তো মানুষ।

—এঁহ মানুষ ! খুবত বুজিছ, মানুষ ! দুই পায়ে হাঁটলেই মানুষ, না ? বলি তফাতডা কোহানে ?

নিবারণ পণ্ডিত পেটে হাত দিয়ে দেখায় এহানে না, এই হানে—নিজের মাথায় তর্জনীর টোকা দেয়, এই খুপরির ভিতরে যে মগজডা আছে তফাতডা সেই হানে।

প্রধানত চাষি এলাকা, কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মতো এ এলাকাতেও সকলের জমি নেই, পরের জমিতে বর্গা করে কি গতর খাটে, গরুর গাড়ি চালায়, ঘরামির কাজ করে, জন-মজুরি করে—কখনো কখনো কর্মহীন বেকার জীবন কাটায়।

পণ্ডিত মশাইয়ের কথায় গাছতলায় তাদেরই দু-চারজন ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া পা নিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যায়।

প্রায় নগ্ন শরীরের ভালুক ভালুক চেহারার এগুলো কি মানুষ ? নিবারণ পণ্ডিতের রাগও ধরে মায়াও হয়—পেট ভরে খেতে যে পায় না সে কথা কে না জানে, নিবারণ সে কথাই তো বলতে চায়, কিন্তু মাথাটার কী হবে ? জমিতে চাষ দিতি হয়, বীজ বুনতি হয়, বৃষ্টি না হলি জলের সেচ দিতি হয়, নিড়ানি দিতি হয়, কত পরিশ্রম, কত যত্ন, তবে না ফসল। মাথাডাও, বাবা সকল—ওই চাষের জমির মতন, তারও যত্ন-আত্তি লাগে, তবেই হয় বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান, তার পরে না তুমি মানুষ ; অমনি মানুষ করে ফাল পাড়লেই মানুষ ?

সারাদেশ জুড়ে বাই উঠিছে স্বরাজ চাই !

বিদ্যা নাই, শিক্ষা নাই—স্বরাজ। স্বরাজ দিয়ে কী কলাডা করবানে ? বলি দেশডা তো চালাতি হবি, না ইংরেজ খেদালেই দেশ তোর রেলগাড়ির মতন গড় গড় গড় গড় করে চলতি শুরু করবি, এ্যাঁও ? তহন দেখবি বারো ভূতে লুটে খাবে : অন্ধ হতভাগার দল, এহন যা দু'মুঠো খাতি পাচ্ছিস তা-ও পাবি না, এই কয়া থুলাম আমি।

কিন্তু নিবারণ পণ্ডিতের অত যে সাধের মাথা গোপালের, সে মাথায় কী আছে ভগোবান জানে, পড়াশোনার কিছুই ধরে রাখা যায় না সেখানে। মার খেতে খেতে হদ্দ গোপাল একদিন এই শ্লেট মাটির দাওয়ায় ফেলে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে

~ www.amarboi.com ~

ঝাঁজের সঙ্গে মাকে শুনিয়ে বলে, এ বাঁড়ার লেহাপড়া আমার পোষাবি না, মনেই থাহে না কিছু, আর লেহাপড়া শিখে কী কলাডা হবে নে !

পঞ্চু কামার খেপে যায়, লেহাপড়া যহন শিখবিই না তো শালার বিটা শালা হাপর টান। এঁহ বিদ্যেসাগরের মতন মাথা, আমার...

অবিরাম পঞ্চু খিস্তি করে যায়।

বালক হলেও গোপাল তখন বেশ শক্তি পোক্ত। পুরনো দিনের লম্বা লম্বা নারকেল গাছের উঁচুতে ফোকর কেটে টিয়া পাখি বাসা করে, সেই ফোকরে অনেক সময় সাপও ঢোকে বাচ্চার লোভে কিন্তু কে মানে নিষেধ, বই শ্লেট পুকুর পাড়ে ঝোপের ধারে রেখে তর তর করে উঠে গিয়ে সেই ফোকরে হাত ঢুকিয়ে গোপাল মাংসের ড্যালার মতো ছানা পেড়ে আনে

তা হবে না কেন, এখনকার মতো মায়ের পেট থেকে পড়েই স্কুলে যাওয়া তো তখন ছিল না। তাছাড়া বয়সের তুলনায় গোপাল আগাগোড়াই লম্বা চওড়া। বাপের কথায় সে মাথা গুঁজে হাপর টানে।

এসব কি আজকের কথা !

গোপালের জন্ম তারিখ গোমুখ্য পঞ্চু কামারের লিখে রাখার কথা নয়, গোপালের মা বলত, সেই যি বছর জমিদারের মেজো ছেলে রূপসা নদীতে ঝড়ে পানসি ডুবে মরিছিল সেই বছর তুই হইছিলি, আশ্বিন মাসের বুধবার রাত্তিরে।

বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে অধিকাংশ মা এভাবেই হিসাব রাখে। সেই হিসাব করেই নিবারণ পণ্ডিত স্কুলের খাতায় যে সালটি লিখেছিল তাতে গোপালের বয়েস এখন হয় সাতষট্টি।

মোটা নাকের নিচে কাঁটা ঝোপের মতো গোঁফ। শক্ত চোয়ালের চৌকো মুখ। মাথার সঙ্গে লেগে থাকা আংটির মতো প্যাঁচানো প্যাঁচানো চুল। মোটা ঘাড় চওড়া কাঁধ মুগুরের মতো দু'খানা হাত। সবচেয়ে দেখার মতো হয় হাপর চালানো কিংবা লোহার পাতের ওপর হাতুড়ি পেটানোর সময় তার পিঠটা। কাঁধের নিচে থেকে দু'দিকের ডানার পেশিগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় দুটো বুনো মোষ মুখোমুখি লড়াই করছে। ঘেমে যাওয়া তামাটে মসৃণ পিঠে ছবিটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিড়ি সিগারেট গোপাল কোনোকালেই খায়নি। সে খায় হুঁকো। হুঁকোর ধোঁয়ায় গোঁফের রংই গেছে পাল্টে, মনে হয় মেহেদি লাগায় নিয়মিত। ফলে কাঁচা আর পাকার তফাত করাই মুশকিল। মাথার চুলও ধূসর। আর যে রকম টানটান চামড়া গোপালের, কে বলবে তার বয়েস এখন সাতষট্টি ! তবে ওই যে মোটা নাকের নিচে কাঁটা ঝোপের মতো গোঁফ, তাতে গোপালকে বেশ খানিকটা ভারিক্কি দিয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেলা পড়ে আসে, হাপরের বাতাসে ছোট ছোট অগ্নিশিখা ওঠে, কাঠ-কয়লা লাল আভা ছড়ায়, সেই শিখার ভেতর দিয়ে, সেই জ্বলন্ত আঙরার ওপর দিয়ে অজস্র মানুষ ছুটে যেতে থাকে। গোপালের বিশাল মাথার ভেতর হাজার হাজার মানুষের পদধ্বনি, কান্না আর চিৎকার মথিত হয়। আবার দেখো, শত শত কৃষক আলের ধারে লাল নিশান পুঁতে ধান কাটতে নেমেছে মাঠে। লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছে ভলান্টিয়াররা : 'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে/কাস্তে টারে দিও জোরে শান।'

বিস্তৃত ধানক্ষেতে, অঘ্রানের রোদে শত শত কাস্তে ঝিকিয়ে উঠছে। হঠাৎ গান থেমে যায়, দুপুর-রোদ ঝপ করে পড়ে গিয়ে চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসে, সেই অন্ধকার ফিস ফিস করে ওঠে : বুজিছ তো, কেউ জানতি যেন না পারে, খবরদার। আমরা কাল এমন সময় আইসে নে যাব, ঘরের বার করবা না, সাবধান। শীতের রাতের চাদর মুড়ি দেয়া যুবক তিনজন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

—কিডা গো এত রাত্তিরে ?

—চুপ, চুপ মাইরে থাক।

—কিডা কবা তো...

—আ রে মাগী কতিছি চুপ... গোপালের গলা চাপা খ্যাস খ্যাস করে, নক্সাল, জানতি পারলি সাঙর ভাঙি দিবি।

কোথায় তখন ভিসিআর !

এখন পাকা রাস্তা, ফাঁকা নিচু জমি ভরাট করে কোর্ট বিল্ডিং, চেয়ারম্যান অফিস, ডাক বাংলো, ব্যাংক—আরো কত কী সব অফিসের জন্যে বিল্ডিং উঠছে হুমহাম করে। দোকানে দোকানে হারিকেনের বদলে বিজলি বাতি। পান সিগারেটের সঙ্গে সৌখিন মনোহারি দোকান, ওষুধের দোকান, হেল্‌থ কমপ্লেক্স। এখন ভিসিআর কেন সিনেমা হলও হলো বলে।

তা হোক, যত খুশি পারুক হোক—যে মাথার জন্যে নিবারণ পণ্ডিত গোপালের মধ্যে অশেষ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখেছিলেন, যে মাথার জন্যে গোপালের লেখাপড়া হয়নি, সেই মাথা দিয়েই গোপাল নিজের সঙ্গে আলাপ করে, কিন্তু তাতে হবেডা কুন কলা, আমরা সব রাজা হয়ে যাবানে নাহি ?

তা কেউ কেউ ভাবে বৈকি। তার ছেলে নারুই ভাবে। চেয়ারম্যানের সঙ্গে জিপ গাড়িতে চড়ে যেতে যেতে সে গোপালের কামারশালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে অন্যদিকে ; মনে মনে হয়ত গালই দেয় গোপালকে, শালা কামারের বাচ্চা কামার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু গোপাল বড় অবাক হয়, এরা সব ছেলো কনে ? দিনরাত খালি ছোঁক ছোঁক করতিছে, ফন্দি আটতিছে। ছেলো কনে এরা সব ?

শৈলবালা ছেলেকে বলে, এই যে তুই শিব ঠাকুরের মতন বম বম করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, চেয়ারম্যান তোরে রাজা করে দিবি ? ক'পয়সা পাইছিস ? মানুষের পেছনে পেছনে তোর ঘোরাই সার হবি।

—ম্যালা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি, পয়সা কামাতি হলি পয়সা ঢালতি হয়, বুজিছিস ? আছে তোর, দিতি পারবি ? শালা এমন ঘরে জন্মোইছি...

নারুর এই প্রবল আক্ষেপের মুখে শৈলবালা দপ করে জ্বলে ওঠে হারামজাদা, ঘরের মান খুইয়ে তাই তুমি জাতে উঠতি চাও ?

—ঘরের মান খোয়ালাম কিরাম ?

—ভেইবে দ্যাখ।

—বল্ না শুনি।

—ঘরের বউরি রাত বিরিতে ভেসিআর দেখাতি নে যাচ্ছিস তাতে মান যায় না ?

—ছোট লোকের বাচ্চা, ঘরের বউ ভিসিআর দেখলি ঘরের মান যায় ? আর কেউ যাতিছে না ?

—তাগেরে বাড়িতি চেয়ারম্যানের ছোট ভাই যায় ?

—তুই কী কতি চাস, কুচুটে মাগী ?

আগুনের পর আগুন ছুটতে থাকে।

আজাদ অবশ্য বাড়ির ভেতর ঢোকে না কখনো। মোটর সাইকেলে বসেই বাইরে থেকে নারুকে ডাকে।

ছবিরানি প্রথম যেদিন ভিসিআর দেখতে গেল, তার দু'দিন পর বিকেলের দিকে মোটর সাইকেলের আওয়াজ শোনা গেল বাড়ির সামনে।

গোপালের বাড়িতে কোনো পাঁচিল নেই, সদর দরজাও নেই ; বাঁশের ভারার ওপর শুকনো কলাপাতা ঝুলিয়ে পাঁচিলের আব্রু। সেখানে দাঁড়িয়েই আজাদ প্রথম দিন ডেকেছিল নারুকে। নারু ছিল না, কিন্তু শৈলবালা অবাক হয়েছিল ছবিরানিকে হাসি মুখে কথা বলতে দেখে।

—কিডা, বউ ?

ছবিরানি একগাল হেসে বলেছিল, আজাদ ভাই, চেয়ারম্যান সাহেবের ছোট ভাই।

—তুই চিনলি কেম্বায় ?

—ওমা সিদিনকে ভিসিআর দেখতি গেলিত কত্তো খাতির করে বসাল, হেইসে কথা কোলো...

আমার বই
ঘুরিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোপাল শৈলবালার কাছ থেকে বৃত্তান্ত শুনে কোনো মন্তব্য করেনি। সহদেব ঘরে ফিরলে ছবিরানি কেঁদেকেটে একসা হয়েছিল।

সময় বদলাচ্ছে, মানুষের সাধ আহ্লাদ বদলাচ্ছে, ভিসিআর দেখতে যাওয়ার মধ্যে— তাও বিনা পয়সায়— দোষের কিছু দেখতে পায়নি সহদেব।

চেয়ারম্যানের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে নারুর বন্ধুত্ব হবে না ? চেয়ারম্যানের জন্য কম করেছে নাকি নারু ! তার খোঁজে যদি এ বাড়িতে আজাদ এসেই থাকে সে তো গৌরবের। আর দেওরের বন্ধুর সঙ্গে হেসে কথা বললে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। এইসব সেকেলে মানুষ নিয়ে দুনিয়া চলা বড় মুশকিল।

ছবিরানির খালিশপুরে থাকার নিয়মিত বায়নাকে ঠেকানোর এই মোক্ষম সুযোগটিকে সহদেব খুব চমৎকারভাবে কাজে লাগায়। অন্যদিকে নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে প্রধান আয়ের উৎস বড় ছেলেকে বিগড়ে দেবে ? তিন যুগের পাকা গিন্নি শৈলবালা সংসার থেকে তাহলে শিখল কী ? অতএব খালিশপুরে থাকা না হোক, ভিসিআর দেখার অধিকার ছবিরানির পাকা হলো।

বাজারের এক কোণে, ছাতিমগাছের নিচে নিরিবিলিতে তলোয়ার বানাতে বানাতে গোপাল ভাবে তার পূর্বপুরুষের কথা। কেমন দেখতে ছিল তারা ? কোন ভাষায় কথা বলত পূর্ণিয়ার সেই দুরন্ত মানুষগুলো ? ছাতিম ফুল ফুটেছে, তার ঝাঁজালো গন্ধ গোপালের নাকের সুড়ঙ্গ বেয়ে মাথার খুপরিতে রাখা মগজ ধরে ঝাঁকুনি দেয়, নেশায় গোপালের চোখ বুজে আসে, আপন মনে সে বিড়বিড় করে : গোপালচন্দ্র কর্মকার, পঞ্চানন কর্মকার, হরিসাধন কর্মকার, উদ্ভবচন্দ্র কর্মকার, গোবর্ধন কর্মকার— পেছন দিকে যেতে যেতে গোপাল তার ঠাকুরদার বাপ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে যায়।

হেমন্তের ভিজে চাঁদ, একটু একটু হিম-কুয়াশা আর কামারশালের হারিকেনের আলোয় সে তলোয়ারখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, কিন্তু গোবর্ধনের বাপের নাম, কি তারো আগের কোনো পূর্বপুরুষের নাম মনে করতে পারে না, এ কথাও জানে না, ক' পুরুষ পেছনে গেলে প্রতাপাদিত্যের অস্ত্রশালায় পৌঁছানো যাবে।

'যশোর নগর ধাম প্রতাপাদিত্য নাম।
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।'

গোপাল খানিকটা সুর দিয়ে গুনগুন করে। কিন্তু পরের লাইনগুলো আর মনে করতে পারে না। তলোয়ারখানা শূন্যে ঘোরায়। কামারশালের আধো আধো আলো-অন্ধকারে দেয়ালে ছায়া পড়ে : বিশাল মাথা, প্রকাণ্ড শরীর, হাতের তলোয়ার দেয়াল পেরিয়ে চাল ছুঁয়েছে। গোপাল সেদিকে তাকিয়ে একবার সামনে যায় একবার পেছনে আসে, ছায়া-শরীর কখনো দূরে সরে গিয়ে হারিয়ে যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবার বিশালতর হয়ে এগিয়ে আসে গোপালের দিকে। গোপাল অস্ফুটে বলে, খবরদার।

ছায়া-শরীর থমকে দাঁড়ায়। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মৃদু-মৃদু দোলে। গোপাল তার নিশ্বাস পতনের শব্দটিও পায়।

ও কী রে গোপাল, কী করিস ?

গোপালের হাতের উত্তোলিত তলোয়ার নেমে আসে। সে এদিক-ওদিক তাকায়, কাউকে দেখতে পায় না।

বাজারের এদিকে এমনিতেই লোক চলাচল কম, তবু গোপাল বোঝে বেশ রাত হয়ে গেছে। কিন্তু কথা বলল কে ?

তলোয়ারখানা নিয়ে এক সময় সে বেরিয়ে এসেছিল।

বাতাস হিমহিম। বুনো গাছপালার কিংবা পক্কমান ধানের গন্ধ ছিল সে বাতাসে, তার সঙ্গে হয়ত মাটির সোঁদা গন্ধও মিশে থাকতে পারে, কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ছাতিম ফুলের ঝাঁজালো গন্ধ তার মগজের ওপর মধুর মতো গাঢ় প্রলেপ দিতে থাকলে গোপালের পা কিঞ্চিত টলে ওঠে। ক্রমশ ভারি হয়ে আসা মাথার ভেতরে পূর্ণিয়ার সেই লোকগুলো এসে বসেছে মনে হয়, কিয়া নাম তুম লোককা, হাম গোপালচন্দ্র, তুম লোককা বংশধর হ্যায়, নাম বাতাও।

লোকগুলো কোনো জবাব দেয় না, হাতের তালুতে খইনি ডলতে ডলতে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। গোপাল কথাগুলো শোনার জন্য কান পাতে।

ও কী রে গোপাল, কী করিস ?

চমকে উঠে সে এদিক ওদিক তাকায়, কেউ কোথাও নেই অথচ স্পষ্ট শুনেছে, কামার শালে যেমন শুনেছিল অবিকল সেই গলা।

হাঁটতে হাঁটতে গোপাল তেঁতুলতলার বাঁক পেরিয়েছে, লোকজন কথা বলতে বলতে তার পাশ দিয়ে চলে গেছে, হয়ত হাতে তার তলোয়ার দেখে দু'বার ফিরে তাকিয়েছে, গোপাল খেয়াল করেনি।

তেঁতুলতলা পেরুলেই বাজারের সীমানা শেষ, তারপর উঁচু বাঁধের মতো চওড়া কাঁচা রাস্তার দু'পাশে নিচু ক্ষেত প্রান্তর। এখান থেকে লোকালয়ের আপাত বিরতি দু'পাশের বাধাহীন খোলা প্রান্তরের ঠান্ডা হাওয়া এসে লাগে গোপালের গায়ে মাঠে মাঠে এখন ধানের দুধ গাঢ় ক্ষীর হয়ে উঠেছে, আর ক'দিন পরই দানাদার হয়ে উঠবে।

গোপাল সেই গানটি শোনার জন্য কান পাতে। মনে হয়, ঐ মাঠের কোনো আলে এখনই নূরু মণ্ডলকে দেখা যাবে : লুঙির ওপর কোমরে গামছা জড়ানো, বাম হাত কানে, ডান হাত সামনে প্রসারিত করে মাথা ঝাঁকিয়ে এক্ষুণি গেয়ে উঠেছে, 'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে/কাস্তেটারে দিও জোরে শান।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু গান শোনা যায় না। আঁকানো হেমন্তের চাঁদ। দু'পাশে ফসলের মাঠের বিস্তৃত শূন্যতার ওপর দিয়ে কুয়াশা-মাখা হিমেল বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

গান শুনতে পায় না, কিন্তু নুরু মণ্ডলকে স্পষ্ট দেখতে পায়। কে যায় ?

বাড়ির সামনে গাছপালায় খেজুর পাতার চ্যাটাইয়ে বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে নূরু মণ্ডল জিজ্ঞেস করে।

—আমি গো দাদা, গোপাল !

—অ, গোপাল।

ঘসা কাচের চশমার একদিক উঁচু করে ধরে, সেই সঙ্গে হা-করা মুখটাও উঁচু হয়। বিরল-দন্ত মুখগহ্বরের ভেতরে পানের ছোপ লাগা জিভটাও দেখা যায়।

—তা খবর কী, বাজারে যাতিছিস ?

—হয় দাদা।

—মানুষ চিনতি এখন বড় অসুবিধে হয়রে ভাই। ডাক্তার ক'লো চোখ কাটাতি ঢাকা যাতি হবি। তা ঢাকা যাওয়া কি সোজা কম্মো। তা বাদে আছে টাকা পয়সার ব্যাপার। আমি গরিব মানুষ, অত পয়সা পাব ক'নে ! আসমতও কয়, চেয়ারম্যানরে ক'য়ে ব্যবস্থা করব। আমি কই তুই পাগল হইছিস আসমত, সরদার বাড়ির কাছে হাত পেতে আমি চোখ কাটাতি যাব ঢাকায়। গনী সরদারের সঙ্গে আমরা লড়াই করিছি তেভাগার সুময়। তোর মনে নি গোপাল ? তার নাতির কাছে হাত পাতব আমি ? অ গোপাল, দুনিয়াডারে আল্লা অনেক দিন তো দ্যাহালোই, আর শ্যাষকালে যদি দেখতি না দ্যায় তো দ্যাখপো না ! তাই বইলে সরদারের নাতির কাছে হাত পেতে চোখ ভালো কত্তি হবি ? এ শালার চোখ থাক আর যাক, তা পারব না।

গোপাল দেখে, কালো লিকলিকে শরীরে লোলচর্ম বৃদ্ধ নূরু মণ্ডলের ঝাঁপসা কাচের চশমার ভেতরে প্রায় মরে যাওয়া চোখ থেকে যেন দপ করে আলো জ্বলে উঠল।

গোপাল মাঠের দিকে তাকায়, সেখানে কুয়াশা ক্রমে গাঢ় হয়ে উঠছে। মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকে সে, কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকালয়ের ঘন আবেষ্টনী মাঠের শূন্যতাকে আড়াল করে দাঁড়ায় গোপাল গ্রামে প্রবেশ করে।

—কী গো, এত রাত করে বাড়ি ফিরতিছ ? বুড়ো মানুষ ঠান্ডা লেগে যাবি যে। হারিকেন হাতে না যুবক না প্রৌঢ় জমিরুদ্দিন দাঁড়িয়ে পড়ে।

—হয় বাবা, রাত হয়ে গেল।

—হাতে ওডা আবার কী ? ও বাবা, এ যে দেহি তরোয়াল।

—হয়, নাতির ফরমান—গোপালের মুখে হাসি ফোটে, শালা বলে বর্গি মারবি।

—বর্গি ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

—মামার বাড়ি গে যাত্রা দেখিছে ; এহন বলে, আলীবর্দি খাঁর মতন তলোয়ার বানা দিতি হবি...

জমিরুদ্দিনও হাসে, দ্যাহো দিহি কাণ্ড !

—তা তুই যাতিছিস কনে ?

—আমাগের ছোট বউয়ির ব্যথা উঠিছে, আমির গেছে বাগেরহাট, কত কলাম, এমন বউ ফালা থুয়ে কোথাও যাসনি এহন। তা ক'লো খুব দরকার, না গেলেই নয়, দু'দিনের মধ্যিই চইলে আসপো। তা সে দু'দিন পেরোয়ে আজ পাঁচ দিন হতি চলল, ছ্যামড়ার কুনো পাত্তা নি—সি এক চিন্তা, তার ওপর বউয়ের উঠিছে ব্যথা, মা ক'লো, লক্ষ্মীর মারে ডাইকে আন, তাই যাচ্ছি।

জমিরুদ্দিন চলে যায়। অন্ধকারে তার হাতে ঝোলানো হারিকেনের আলো দুলতে দুলতে অদৃশ্য হয়ে যায় গাছপালার আড়ালে।

তপন কি তার তলোয়ারের জন্যে জেগে আছে এখনো ? গোপাল তলোয়ারখানা মৃদু মৃদু ঘোরায়, নতুন টিনের পাত আধো আধো আলো-আঁধারিতে রুপোর মতো ঝকঝক করে। বাহ্, খাসা হইছে। হবে না ? রত্তোর ধারা বলে কথা আছে না ? তুই না বলেছিলি আলীবর্দি খাঁর মতন হওয়া লাগবি, তা শালা দ্যাখ হইছে কি না তোর আলীবর্দি খাঁর মতন তরোয়াল।

নাতির কথা ভেবে গোপালের হাঁটার ভঙ্গিই বদলে যায়। তার দীর্ঘদেহের স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গি, লোহা-পেটানো মুঠিতে বাগানো তলোয়ার যেন আলীবর্দি খাঁ-ই চলেছে বর্গি দমনে !

সামনে একটা বাঁক। বাঁক পেরোলেই ডান দিকে মিশ্রদের বাড়ি। মিশ্ররা সেই কবে চলে গেছে ওপারে, ভিটের চিহ্নটুকুও নেই ; আজহার মোল্লা কলার চাষ করেছে সেখানে।

কলাবাগানের ভেতর দু'জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ দেখে গোপাল থমকে দাঁড়ায়, হঠাৎ এক জোড়া চোখ পেছন ঘুরে খ্যাঁক করে ওঠে · উরে শালার শিয়েল, রাত দুপুরে রং মারতি আইছ এহানে ? ভাগ শালারা। ভাগ। মানুষের গলা পেয়ে শিয়াল দু'টো দ্রুত পালিয়ে যায় গাছপালার অন্ধকারে। বদ্রিনাথ মিশ্র কি খালি হাতেই পালিয়ে এসেছিল ? সে কতকাল আগে বিহার কি দিল্লি, আগ্রা না কোন জায়গার কোন বদ্রিনাথ মিশ্র এসে লুকিয়ে ছিল এখানে, গোপালদের এই গ্রামে। কী তাজ্জবের কথা !

সেই বদ্রিনাথ মিশ্র পূজারি হয়েছে এই গ্রামের মন্দিরে। বিয়ে করেছে। সংসার হয়েছে। তার বংশধররা বাংলায় কথা বলত, এই ভিটেতে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও ছিল, এখন সেখানে আজহার মোল্লার কলাবাগান, সেই বাগানে শিয়াল ঘোরে। ভাব দিনি কাণ্ডডা একবার !

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গাছপালার জড়াজড়ির ভেতর দিয়ে সুঁড়িপথ বেয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেই গ্রামের শেষ প্রান্তে প্রায় একা একা গোপালের বাড়ি। গোপাল উঁচু সদর রাস্তা ছেড়ে সেই সুঁড়িপথে নেমে আসে। দু'পাশে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া জমাটবদ্ধ গাছপালা। গাছেদের নিশ্বাসে ঠান্ডা এখানে ঘন।

গাছপালার নিশ্বাসের শীতলতা, পায়ের নিচের মাটির শীতলতা ছাতিম ফুলের ঝাঁজালো সুবাসের মধুতে ডুবে থাকা মগজের কোষে কোষে গিয়ে পৌঁছুলে গোপালের মনে হয়, আহ, এখন পাতলা কাঁথাখানা গায়ে দিয়ে শুলেই ঘুম এসে যাবে, তার আগে অবশ্য চাট্টিখানি খেতে হবে, ভরা পেটে ঘুমের আমেজই আলাদা। কিন্তু তপন ? সে কি এখনো জেগে আছে, দাদা কখন তার তলোয়ার আনে এই আশায় ?

ছ্যামড়ার বায়নার বহর দেখো, আলীবর্দি খাঁর মতন তরোয়াল চাই।

তা শালা নে তোর আলীবর্দি খাঁর তরোয়াল।

নাতির কথা ভেবে চলার গতি তার বাড়ে, কিন্তু বেশি দূর এগোতে হয় না তাকে। ফিস ফিস, কাঁপা কাঁপা নিশ্বাসে কথাবার্তা শুনে থমকে যায় গোপাল।

—না, না, কেউ দেকে ফ্যালাবি...

—কেউ দেখবি না, উম্‌ম...

চারপাশের ঘন গাছপালার মধ্যে সামনে খানিকটা ফাঁকা ঘেসো জমি, চাঁদের ম্লান আলোর সঙ্গে গাঢ় কুয়াশা— কেমন গোলাপি গোলাপি রং ধরেছে, তার মধ্যে ছবিরানিকে শরীরের সঙ্গে পিষে ফেলে চুমু খাচ্ছে চেয়ারম্যানের ছোটভাই।

গোপাল পিছু হটতে থাকে। ইস কী ঠান্ডা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটা একেবারে পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠেছে। কার্তিক মাসেই এই অবস্থা। শীত বেশ কড়াই পড়বে এ বছর।

জমিরুদ্দিন ঠিকই বলেছে, এত রাত করে ফেরা তার ঠিক হয়নি।

বয়েস বলে কথা আছে না সব বয়েসে সব কি সয় ? নাতির তলোয়ার বানাবার ঝোঁকে ছিল, রাত বুঝতে পারেনি।

সুঁড়িপথ ছেড়ে বাঁ পাশে আগাছা আর দীর্ঘ গাছপালার দুর্গের মধ্যে গোপাল তলোয়ার হাতে প্রবেশ করে। ভারি পা, ভারি শরীর, কিন্তু গোপালের প্রতিটি পদক্ষেপ একেবারে মাপা। ঝরে পড়া একটি শুকনো পাতারও আওয়াজ হয় না।

ছোট বড় গাছ মিলিয়ে এমন ঘন, এমন নিবিড়— প্রায় কুঞ্জই বলা যায়। এতকাল ধরে যাওয়া আসা করছে গোপাল, খেয়ালই করেনি কোনোদিন।

বদ্রিনাথ মিশ্র যেদিন প্রথম এ গ্রামে ঢুকেছিল তার সঙ্গী নিয়ে, এমনি জঙ্গলের মধ্যেই কি তারা কাটিয়েছিল সেদিন ? হাতে তাদের তলোয়ার ছিল, না খালি হাত ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জঙ্গল তখন আরো গভীর ছিল ; বাঘ চরে বেড়ানো সেই কোন আদিকালের জঙ্গলেরই তো ছানাপোনা এইসব গাছপালা। সেখানে দ্যাখো গোপাল একা একা দাঁড়িয়ে আছে। বদ্রিনাথ মিশ্রও হয়ত এই গ্রামেরই কোথাও এমনিভাবে দাঁড়িয়েছিল। কোথাকার বদ্রিনাথ মিশ্র দ্যাখো ঠাঁই গেড়েছিল কোথায় এসে। বদ্রিনাথ কোন ? গোপালদের কথাই ধরো না, কম তাজ্জবের।

গোপালের চেয়ে গোপালের বাপ ছিল আরো লম্বা চওড়া। মাথায় ঘাটের সিঁড়ির মতো থাক্ থাক্ বাবরি চুল। মোটা গোঁফ। বড় বড় লালচে চোখ, গাঁজা টেনে সেই চোখ আরো লালচে করে রাখত, তেমনি ছিল গলার স্বর !

অচেনা লোক হলে একবার ছেড়ে বারবার ফিরে ফিরে দেখত। গ্রামের কে যেন একবার বলেছিল, এবার দুর্গা পুজোর সময় অসুর না গড়ে আমাদের পঞ্চুকেই কাঠামোর মইদ্যে বসিয়ে দাও।

তা মিছে বলেনি। বংশের ধারাটা তাদের অমন। ঠাকুরদাকে গোপাল দেখেনি, শুনেছে ঠাকুরদাও নাকি ছিল অমনি জোয়ান। কালা জ্বর হয়ে জোয়ান বয়েসেই মরে গেছে।

গোপালের ছেলে দুটো সে ধারা পায়নি। সহদেব লম্বা হলেও গায়ে-গতরে তেমন নয়, আর নারুটা না গায়ে-গতরে, না লম্বায়— কোনো দিকেই নয়। সাধ-আহ্লাদ বদলাচ্ছে, বদলাতেই থাকবে, তোদেরটা এখন তোরাই বোঝ।

ক র র র র র র— চন্দ্রবোড়া সাপ ডাকছে কোথাও। গোপাল অস্ফুটে বলে, আয় ! শীতকালে গর্তে ঢুকে ঘুমোবার আগে এই সময়টা সাপেরা তাদের সব বিষ ঢেলে হালকা হয়ে নেয়।

গোপাল এদিক ওদিক তাকায়, গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আসা কুয়াশা-মাখা চাঁদের ডোরাকাটা ম্লান আলো আর ছায়ার কোথায় যে সে তার চকরা বকরা ঠান্ডা শরীর নিয়ে বসে ডাকছে কে জানে।

তুমি কেমন হে, কোন অন্ধকারে বসে করর করর করো, এখানে এলেই তো পার !

তোমার কি ঘুম পাতিছে ? এত আগেই ? এহন তো মোটে কাত্তিক মাসের মাঝামাঝি, পুরো অঘ্রান মাস এখনো বসানো রইছে সামনে, তার পরে না শীতকাল ! তুমি এহনই ঘুমাতে যাতি চাও ? না হলি অমন করতিছ ক্যানো ? থলি কি টন টন করতিছে ? তা আইসে পড়, এই তো নিমগাছের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়ায়ে রইছি। কিছু কবো না, তুমি টপ করে এসে কাজটুকু সেরে আবার চলে যাও !

ব্যথার বড় কষ্ট, থলির বিষ ঝেড়ে ফ্যালালেই আরাম, তারপর ঘুম !

আইসে পড় মনি, কতক্ষণ খাড়োয়ে থাকপো, আয়...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্ত চন্দ্রবোড়া আসে না, নারুর গলা শোনা যায় : ঝুম ঝুমকে নাচো গাও, নাচো গাও... বড় সুখের গান গাইতে গাইতে আসছে নারু।

গোপাল ভেবেছিল, ভিসিআর দেখিয়ে চেয়ারম্যানের ভাই একাই সহদেবের বউকে আজ এগিয়ে দিতে এসেছে।

পিশাব কত্তি তোর এত সুমায় লাগে ? চেয়ারম্যানের ছোটভাইয়ের গলায় কৌতুক।

গোপালের ঠোঁটের কোণ একটুখানি বাঁকে, সেটা ঠিক হাসি কি না বলা মুশকিল। গোপাল বিড়বিড় করে, আড়াল মানুষরি কত ভাবেই না কত্তি হয় !

তিনজনেই তাহলে প্রাইমারি স্কুল ঘুরে, দত্ত পুকুরের পাড় দিয়ে এসেছে। কিন্তু গোপাল এখন কোনদিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকবে ?

সহদেবের বউ কলকল করে কথা বলছে, কী কথা ওদের এত ? চেয়ারম্যানের ভাই আর কতক্ষণ থাকবে ? নারু কি তাকে এখন বাড়িতে নিয়ে তুলবে ?

না সরলে ওদের সামনে দিয়ে তলোয়ার হাতে গোপাল এখন যায় কেমন করে ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্ষুধার্ত জাগুয়ার

শওকত আলী—যিনি পঞ্চাশের গোষ্ঠীভুক্ত নন, আবার ষাটের তরুণদের চেয়েও আগে এসেছেন মঞ্চে। আমার মনে হয়, পূর্ব পাকিস্তানের ছোটগল্পে তাঁর মতো জীবনের এত বিচিত্র পথে কেউই হাঁটেননি। জীবনটাকে গ্লোবের মতো এমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোধহয় আর কেউ দেখেননি তাঁর আগে বা পরে। এদিক দিয়ে তিনি একক বলে আমি মনে করি সাফল্য ব্যর্থতার কথা নয়, প্রচেষ্টাটাই আর কারুর ভেতর দেখলাম না এ যাবত।

পঞ্চাশের লেখকদের দেখেছি গল্প লিখেছেন—বেশ কয়েকটি সার্থক গল্প রচিত হয়েছে, তবু তাঁরা চল্লিশের ব্যূহে দিশেহারা অভিমন্যুর মতো নিঃশেষ হয়ে গেলেন। এদের ভেতর কেউ কেউ কখনো এই কনভেনশনাল পথ থেকে সরে এসে আশ্চর্য রকম নতুন কণ্ঠে গল্প বলে আবার হারিয়ে গেলেন, অথচ এঁদের শক্তি ছিল, প্রতিশ্রুতি ছিল, ছিল অফুরন্ত উৎসাহ। তবু সেই সম্ভাবনাকে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হতেও দেখলাম।

এর পরের পর্যায়ে এলেন শওকত আলী। ষাটের তরুণদের মতো আঙ্গিকের মার প্যাঁচের ভেতর তিনি গেলেন না, তিনি যার ওপর জোর দিলেন তা হলো চরিত্র, মানুষের বিভিন্ন অবয়ব, তাদের বিচিত্র সব মানসিকতা। ভিড় করে এল মার খাওয়া পোড় খাওয়া, লোভী, কামুক, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, দুর্বিনীত, হতাশাগ্রস্ত, অসহায় দুঃখী মানুষ, আর সেই সঙ্গে পরিবেশ । পূর্ব পাকিস্তানের গল্পের পরিধিকে তিনি বিস্তৃতি দিলেন

সাম্প্রতিক সমাজ ও সভ্যতার দ্রুত ক্রমবিকাশের সাথে সাথে আমাদের জীবনে যে নতুন নতুন মূল্যবোধ এসে নাড়া দিচ্ছে এবং আজ যে সমস্ত তরুণ সেই সব চিন্তার ওপর গল্প লিখছেন (পঞ্চাশের গল্পকারদের মধ্যে যেটার অভাব ছিল।) তার ক্ষেত্র প্রস্তুতে শওকত আলীর দানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সম্প্রতি তাঁর বিপুল গল্পাবলি থেকে একই ধারার কয়েকটি গল্পের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে *উন্মূল বাসনা*।

উন্মূল বাসনায় শওকত আলী এমন এক অন্ধকার জগতে আলো ফেলেছেন যেখানে লোভ আর লালসায় ভরা কাঁচা রক্ত মাংসের দুঃশীল ক্বাথ। ওথলানো

সুন্দরবার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নারীদেহ আর কামোগ্র পুরুষের রক্তে আদিম ঝড়ের মাতামাতি। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, মার খাওয়া মানুষের বিকলাঙ্গ পিপাসা, রঙিনী নারীকে নিঃশেষে পান করার আকুলতা, তার রক্তের পলাশ বনে কেবলই মাতামাতি করে। অস্থির এবং হিংস্র করে তোলে একটা সাব হিউম্যান চেতনা।

এ গ্রন্থের প্রতিটি গল্প যেন যৌনকাতুরা রমণী— যার প্রতি অঙ্গে সেক্স। এই বিশেষ ধারাটির মধ্যে তিনি *উন্মূল বাসনার* গল্পগুলোকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অবশ্য শওকত আলীর অন্যান্য গল্প— যা মূলত সেক্স নিয়ে লেখা নয় সেখানেও অনাহূতভাবে সেক্স এসে হানা দেয়। এই অনাবশ্যক যৌনপ্রীতি তাঁর শিল্পকে আচ্ছন্ন করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে অনেক সময়। গল্প সেক্স বা যৌনতা অপরাধের নয় ; (এখানে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নও আমি তুলছি না, ওসব বহু পুরনো কথা।) কিন্তু তা প্রসঙ্গক্রমে আসবে, জোর করে আনলে চোখে লাগে। এই ত্রুটিটুকু শওকত আলীর আছে।

একটা উদাহরণ নেয়া যাক 'রক্তে ও শিশিরে' গল্প নায়ক রাইমোহন একটি চাষি ঘরের সহজ সরল, কিছুটা বা বোকা ধরনের ছেলে ; তার স্বদেশের প্রতি যে অকৃত্রিম মমত্ববোধ লেখক চিত্রিত করেছেন তা অপূর্ব :

> হাঁটতে হাঁটতে সে নিঃশব্দ ধান ক্ষেতের দিকে তাকালো। বিশাল প্রান্তর সারা বুকে সবুজ স্বপ্ন আর অগাধ ভালোবাসা নিয়ে একটু একটু করে পূর্ণ হচ্ছে। দিনে দিনে আকাশের বৃষ্টি শিশির আর জ্যোৎস্নায় স্নান করে সবুজ ধানক্ষেত হেমন্তের সোনালী পরিপূর্ণতার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। বাতাসে মাটিতে কি রকম একটা অশেষ মমতা মেশানো যা শরীরের গন্ধের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে আছে। এই ধান ক্ষেতে, এই মাটিতে, এই জ্যোৎস্নায় অনন্তকাল ধরে সে যেন পরতে পরতে জড়ানো। রাস্তাটুকু হাঁটতে হাঁটতে রাইমোহনের চোখ দিয়ে পানি পড়তে আরম্ভ করল। কোনদিন যা হয়নি, আজ তাই হলো। সে প্রথম লক্ষ্য করল একটা অপরিচিত এবং বিচিত্র অনুভূতিতে তার সারা চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সে কাঁদছে। তার মনে পড়ল শৈশবের মায়ের কথা। মা দুধের বাটি তুলে ধরেছে তার মুখে আরো কান্না ফুলে ফুলে উঠল তার বুকের ভেতরে।

কিন্তু একই গল্পের অন্য আর এক জায়গায় যখন পড়ি :

> ইদানীং রাইমোহন মেয়েমানুষের কথা ভাবতে ভালোবাসতো। মেয়েমানুষ দেখলে কি রকম করত বুকের ভেতরটা। স্বপ্ন দেখত কোন কোন দিন। হাট-বাজার থেকে কুড়িয়ে এনে অনেক মেয়েমানুষের ছবি সে তার ঘরের দেয়ালে সেঁটেছে। মনোহর হাড়ির বিধবা মেয়ে কমলা যখন এ গাঁয়ে মাছ বেচতে আসে, তখন ওর উছলে ওঠা জোয়ান শরীরটা দেখে তার ভারী ভালো লাগে। সেই জন্যে সে পথ চেয়ে বসে থাকত। কথা বলেনি কোনদিন। দরকার বোধ

~ www.amarboi.com ~

করেনি। মেয়েটার পথ চেয়ে বসে থাকতেই তার ভালো লাগতো। তার একেক সময় দারুণ ইচ্ছে জাগে বিয়ে-করা মানুষদের কাছে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে। মেয়েমানুষের শরীর আসলে ঠিক কি রকম। যুবতী, মানে ভর যুবতী, স্বাস্থ্যবতী মেয়েমানুষের শরীরটা আসলে কি রকম। ওদের গা কি খুব নরম, আর গায়ে কি পাখির পালকের উম্ মাখানো থাকে সারাক্ষণ ? সব মেয়ের গায়ে ?

দিনরাত সে মেয়েমানুষের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছিল। বস্তুত কয়েক মাস আগে রূপবানকে ষাঁড় দেখাতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই নানা রকমের নতুন নতুন ইচ্ছে তার মনের ভেতরে প্রবল হয়ে উঠেছে।

অংশটি উৎক্ষিপ্তের মতো শোনায় নাকি ? মনে হয় যেন ধ্রুপদ গানের আসরের মাঝখানে হঠাৎ খিস্তি-খেউড়ে ভরা আদিরসাত্মক চটকদার গান সোচ্চার হয়ে উঠল এবং এই অংশের বর্ণনাও অত্যন্ত কাঁচা মনে হয় পূর্বোক্ত অংশের প্রাণস্পর্শী বর্ণনার কাছে। এ ধরনের খেয়ালি মনের অভিব্যক্তি সত্যিই বেদনাদায়ক। অন্তত শওকত আলীর মতো শক্তিমত্ত গল্পকারের কাছ থেকে কোনোক্রমেই প্রত্যাশা করি না।

লেখক অবশ্য তার কৈফিয়ত দিয়েছেন :

এখন তার চোখের সামনে দিয়ে কমলা হেঁটে যাচ্ছে। যে মেয়েমানুষের শরীর দেখে তার বুকের রক্ত উথাল-পাতাল করেছে, সেই মেয়েকে চোখের সামনে দেখেও দেখল না।

কারণ : দেশের ওপর আকস্মিক আক্রমণে সে আলোড়িত হয়েছে, চেতনায় তার দেশপ্রেমের জ্বলন্ত বহ্নি লেলিহান শিখা মেলেছে। কিন্তু তার এই পরিবর্তন দেখানোর জন্যে অমন রগরগে বর্ণনা না দিলেও পাঠকের পক্ষে বুঝতে অসুবিধে হতো না এবং গল্পের মেজাজও আগাগোড়া একই সুরে বাঁধা থাকত।

'ব্রতযাত্রা' গল্পে লীলাবতী আর বীণাপাণি দু'জা। ফুলমণির দুই নাত বউ। মনোহর আর বলরাম দু'ভাই, স্মাগলিং করতে গিয়ে আর ফেরেনি। কিন্তু বউ দুটো আছে।

তখন উদ্ভিন্ন যৌবনা কিশোরী ছিল, হালকা পাখির মতো শরীরে, গুরু উরুভারে কিংবা মেঘের মতো নিতম্বের মন্থরা এসে ধরা দেয়নি—এখন হাত বাহু গোল গোল হয়েছে, বুকের নিশ্বাস নেশাতুর হয়েছে, দু'চোখের কালো কালো অন্তরালে প্রাচীন সুগভীর জলাশয়ের অন্ধকার থম থমে হয়ে উঠেছে—কিন্তু সেই মানুষ দুটি নেই।

... রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে ভগবান জানে কেন, দু'হাতে ফুলমনির গলা জড়িয়ে ধরতে চায়—ঘন ঘন অস্থির নিশ্বাস ফুলমণির কাছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উত্তপ্ত বলে মনে হয়। তখন ফুলমণির ঘুম ছুটে যায়। ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে।

শেষটা এই বছরেই, এই বৈশাখেই অসুখে ধরলো। ফিটের ব্যারাম। প্রথমটা ধরলো লীলাবতীকে, তারপর বীণাপাণীকে। কথা নেই, বার্তা নেই দড়াম দড়াম করে পড়ে যেতে লাগলো আর দাঁত কপাটি লেগে বেহুঁশ হতে লাগলো। কবিরাজের কত ওষুধ খেলো, মাহাত এসে ঝাড়ফুঁক করলো—কিন্তু ব্যারাম আর ছাড়েনি।

শেষটা এই মানত, এই ব্রতপালন। কান্তজীর মন্দিরে গিয়ে ধন্না দেয়ার ব্যবস্থা।

এই যাত্রার মধ্যেই গল্পটিকে ধরে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো লীলাবতী ও বীণাপাণির শানিত উক্তি, প্রশ্ন—তাদের দেহ ও মনের ক্ষুধা, অবিশ্বাস আর শূন্য হৃদয়ের হাহাকার সমস্ত গল্পটিতে ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া প্রকৃতি, সহযাত্রী মানুষ জনের বিচিত্র মানসিকতা, ফুলমণির আচরণ সর্বোপরি দুটি যুবতির অন্তরের নীরব বেদনা গোধূলির রক্তিম বিষণ্ণতার মতো 'ব্রতযাত্রা'র আকাশ ছেয়ে আছে। লিপি কুশলতায় শওকত আলী এ গল্পে সংযত, সতর্ক এবং সহানুভূতিশীল। কিন্তু সমরেশ বসুর 'তৃষ্ণা'র শরীরের গন্ধ 'ব্রতযাত্রা'র গায়ে অত্যন্ত তীব্রভাবে পাওয়া গেল।

"... TRITIYA JATRA has been based in theme and execution on Hemingway's *THE SNOWS OF KILIMANJARO*... but amazingly, this has not been admitted. This plagiarism, pure and simple..."

MOBARAK A. MOLLA*

গল্পটি সম্বন্ধে (যার নাম আসলে 'তৃতীয় রাত্রি' হবে : তৃতীয় যাত্রা নয়) ওপরের যে মন্তব্য তা অস্বীকার করা যায় না। অসুস্থ সাজাহান ওস্তাদ—জিন্দেগিটাকে যে বেয়ারিং চিঠি বানিয়ে ফেলেছে তার এবং সঙ্গিনী কাননবালার কতকথা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'তৃতীয় রাত্রি'। শ্মশানের নির্জন পরিবেশে মায়াবী অতীত স্মৃতিময় হয়। বসন্ত আক্রান্ত সাজাহান ওস্তাদের কাটা কাটা উক্তি, তার বেপরোয়া জীবনের উষ্ণ বাতাস মৃত্যুহীন নির্জন শ্মশান ভূমিতে ঘুরে ঘুরে মাথা কোটে মৃত্যুচিন্তা তাকে বারে বারে আচ্ছন্ন করছে। তার নীলিমা বিধ্বস্ত, চারপাশে শূন্য করোটিতে বাতাস হাহাকার করে, তার মধ্যে কাননবালা যেন শ্যামল ছায়া, জীবনে বহু খেলা দেখিয়েছে সাজাহান ওস্তাদ, কমলা, জুবিলি, গোল্ডেন ভাঙছে ভাঙছে আর ভাঙছে। মরণের মতো এগিয়ে আসছে ভবিষ্যৎ। অনিশ্চিত অন্ধকার। তার মাঝে

* Cross currents : *Pakistan Observer*, Magazine Section, May 18, 1969.

~ www.amarboi.com ~

রুপালি চিতলের মতো স্মৃতির সরোবরে ভেসে ওঠে কাওয়সার বানু, মিস ডায়মন্ড, ঝর্না দাস, ভাটু রাজা, বিশ্বনাথ, জহরত বাই, আশিক আজাদ, মাওলুন, ডরোথী, ক্লাউন মদন মালহোত্রা, মিস হীরা। রক্ত মাতাল করা স্বল্পাবাস নারীদেহ, চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি, উত্তাল ব্যান্ড, বিউগল, তীক্ষ্ণ ধার ত্রিফলা, বিপুল দর্শক, উত্তেজিত অস্থির ম্যানেজার কুটুস্বরাও। আলো আলো— আলো— উল্লাস আর হাততালি মৃত্যুর হীম শীতল অন্ধকূপে ডুবে যেতে যেতে আশা অরি জীবনের কথা ভাবছে। সবই আচ্ছন্নের মতো, স্বপ্নের মতো। চরিত্রের মানসিকতা বিশ্লেষণের বিশেষ ঢংটি থেকে শুরু করে পরিবেশ রচনা, ভাষা ব্যবহার, সংলাপ সর্বত্রই শওকত আলীকে খুঁজে পাই ; কিন্তু *The Shows of Kilimanjaro* প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করেছে এ গল্প রচনার পেছনে। Heminway-এর অসুস্থ নায়ক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে অনেক কুয়াশা তুষার আর মেঘের বুক চিরে ভেসে আসছে সেই প্রত্যাশিত বিমান, তার মন পবনের নাও— আশা আর আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক। 'তৃতীয় রাত্রি'তে দেখি :

> সাজাহান ওস্তাদের পাশে শুয়ে পড়লো কাননবালা। তারপর দুহাতে বসন্তের গুটিভরা লোকটার শরীর নিজের বুকের কাছে টেনে আনলো।
>
> পাশে শুয়ে রোগ ক্লান্ত মানুষটার কপালে হাত রেখে বলল, চুপ করে ঘুমোও তুমি, আর কথা বলো না।
>
> কে জানে ভোর হতে কতক্ষণ বাকী। বারান্দার বাইরে শ্মশানের ওপর শীতের দীর্ঘরাত আর কুয়াশা-ঢাকা বিশাল আকাশ একাকার হয়ে আছে। উত্তরের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে নদীর ওপর দিয়ে। মেয়েটা অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে রাখলো। পঞ্চচূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা আবার উত্তরের দিগন্তে ঝলমল করে উঠবে— যদি কাল আকাশ পরিষ্কার থাকে।

গল্প শেষ শওকত আলীর পঞ্চচূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা আর হেমিংওয়ের বিমান একই সাগর সঙ্গমে মিলিত হয় কিন্তু তাই বলে শওকত আলীর মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে আমি মনে করি না *The Shows of Kilimanjaro* পড়ে যেমন আমরা Hemingway-কে চিনি, তেমনি 'তৃতীয় রাত্রি'র শওকত আলী, শওকত আলী রূপেই স্বরাট

যৌনভিত্তিক গল্প হিসেবে 'ডাইনি' অনন্যতার দাবি রাখে যৌনতা এবং কুসংস্কারের দুর্গন্ধময় পাঁক আর অন্ধজলের ঘূর্ণির ভেতর ধীরে ধীরে দল মেলল একটি অমলিন শ্বেতপদ্ম। লাল চান্দ হাড়ির বিধবা মেয়ে কমলার দেহের দুর্নিবার কামনা :

> মনে পড়ে সুবলা ? কী রাত সে সব গো। পুরুষের গা জড়িয়ে ধরে না ঘুমোলে তার ছাতি ঠান্ডা হত না। প্রথম রাতে লোকটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তুই তাকে আবার জাগাতিস, মনে পড়ে সুবলা ?

পুনরায় পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নগেন দাস মরেছিল ভুগে ভুগে। মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে। 'ব্যারামে পড়ে দুর্বল হাতে মাঝরাতে বউকে কাছে টানতো। খোলা বুকে মাথা গুঁজে বলতো, বউরে আমাকে ছেড়ে যাস না। তুই গেলে আমি বাঁচবো না।'

'...' লাল চান্দ মেয়েকে ডেকে বলেছিল, বেটি, জামাইর সঙ্গে থাকিস না তুই।

মাহাত বলে দিল, 'ই লোক বাঁচবে নাই। ডাইনির সঙ্গে শোয়, মানুষটার আশা আর করেন না।'

শেষ পর্যন্ত নগেন দাস মরল। বিমলার বিশ্বাস শুধু তার জন্যে— তার ভেতর যে 'ডাইনিটা' আছে সে-ই তার স্বামীকে শুষে মেরেছে। তাই সে বিনোদ চরণের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে এড়িয়ে থাকে। সে দেখে ভবিষ্যৎকে টুকরো টুকরো, বিচ্ছিন্ন।

বিনোদ চরণ মরছে। শরীর শুকিয়ে কালো ছাই হয়ে গেছে। চোখ গর্তের ভেতরে, উঠোনে উঁচু হয়ে বসে কাশছে আর বমির মতোন তাজা রক্ত গলগল করে বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে। রক্তগুলো কালো চাপ চাপ হয়ে শুকিয়ে গেল। দূর থেকে হরিবোল, বোলহরি সম্মিলিত ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। টাঙ্গনের জলে ডুব দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছে। পা আসতে চায় না, বুকের ভেতরটা খান খান হয়ে যাচ্ছে, তবু সে হেঁটে আসছে শূন্য ঘরের দিকে। ডাইনিটার সাড়া নেই তখন আর। রক্ত খেয়ে পরম তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। শরীরের থির রক্তে কান্না, ফুঁপিয়ে উঠতে চায়। তার বুকের ভেতরটার যেখানে সে সুবলা, ছেলের মা, ঘরের ঘরণী, যেখানে সে স্বপ্ন দেখে— সেখানে কে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে।

কিন্তু যাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় সে যে কখন মনের নিভৃত শূন্য দোলমঞ্চে কৃষ্ণ হয়ে বিরাজ করছে তা সে জানেনি

তাই রাতের বেলা যখন শুনলো বিনোদন চরণ বাজারে ঝগড়া ঝাটি করে মাথা ফাটিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তখন 'যে মানুষকে কাছে ঘেঁসতে দিতে চায়নি কখনো সেই মানুষের জন্যে কে যেন তার বুকের ভেতরে হাহাকার করতে লাগল। তখন লুটিয়ে পড়া আঁচল চোখভর্তি জল নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ডাইনিটাকে তখন সে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। একটা গভীরতম বিশ্বাস তাকে ডেকে নিয়ে চলছে যেন। আড়তদার, অন্য মিস্ত্রিরা সুবলাকে দেখে অবাক। সুবলা লজ্জা করল না। চোখের জল মুছল না সে। আহত লোকটার কপালে হাত রেখে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকল, মিস্ত্রিরি!

দেখলো না বিনোদ চরণ চোখ মেলে চাইছে কি না। শিয়রের কাছে বসে ঝুঁকে পড়লো সে, বিশাল বুকের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল অসহায় মানুষটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আহত মুখ সবাই শুনলো সুবলা ডাকছে। দুষ্টু ছেলেকে যে স্বরে মা আদর করে, আদরের বউ যে গলায় স্বামীকে সোহাগ করে, ঠিক তেমনি গলার স্বরে ডেকে বলছে লাল চান্দ হাড়ির বিধবা মেয়ে। বলছে, ক্যানে তুমি কাজিয়া করো মানুষের সঙ্গে মিস্তিরি। ক্যানে তুমি অত উতলা হও...।'

লেখকের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী আয়ুধের মতো। তার ক্ষুধিত যৌবনের কামনা, মা হবার দুর্নিবার পিপাসার, ঘর বাঁধবার সোনালি স্বপ্নে haunt করে ফেরা দুঃস্বপ্নে ভরা অভিশপ্ত অতীত তাকে ক্ষত বিক্ষত করছে। এবং লেখক শওকত আলী তার পরিণতিকে অত্যন্ত সার্থকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সুবলার চরিত্রের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তা সত্যি অপূর্ব।

'রঙ্গিনী' একটি সুন্দর 'Whip Crack' গল্প। 'পুশনা' গল্পে তিনি সাঁওতাল জীবনের এক বিচিত্র জগতের দ্বার উন্মোচন করেছেন। অতীত ঐতিহ্য আর বর্তমান শতাব্দীর প্রগতির দ্বন্দ্ব। গুপীনাথ চায় অতীতকে বাঁচিয়ে রাখতে। ডেভিড মাস্টার দিতে চার খ্রিষ্টের জীবন দর্শন, আলোকময় প্রগতিময় ভবিষ্যৎ। এই দ্বন্দ্ব এসে দোলা লেগেছে সাঁওতাল জীবনে। তাদের বিশ্বাস অগ্নি ঝলসিত সাঁওতাল বিদ্রোহ, মহুয়া আর পচুইয়ের গন্ধ ভারাক্রান্ত শালবন অপূর্ব মায়াময়, জ্বালাময় পরিবেশ রচনা করেছে এ গল্পে। 'ফেরতা' একটি রুদ্ধশ্বাস গতিময় জীবন যন্ত্রণার কাহিনী এবং সার্থক।

শওকত আলীর প্রতিটি গল্পে জীবনের একেবারে তাজা রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করি। কোথাও কষ্টচিন্তা নেই। জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি সর্বত্র ভাস্বর। প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে, পরিবেশের সাথে তার নিবিড় এবং গভীর পরিচয় যা পূর্ব পাকিস্তানের গল্প সাহিত্যে তাকে দুর্লভ এবং অনন্যতার আসনে বসিয়েছে।

আগেই বলেছি, *উন্মূল বাসনার* গল্পগুলো একটি বিশেষ ধারার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাই এখানে শওকত আলীর গল্পের একটি বিশেষ রূপকেই প্রত্যক্ষ করি। তার অন্যান্য ধারার গল্প সংকলন এখনো বেরোয়নি। এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক এতদিন ধরে তিনি সাহিত্য করছেন অথচ মোটে একটি উপন্যাস (*পিঙ্গল আকাশ*) এবং 'উন্মূল বাসনা' নামে গল্পগ্রন্থটি ছাড়া আর কোনো বই বেরুল না। অথচ গল্প তিনি কম লেখেননি এবং বৈচিত্র্যও তার অনেক।

ইদানীং শওকত আলীর গল্প নতুন নতুন মোড় নিচ্ছে বাঁক নিচ্ছে। (যা শিল্পীর গতিশীলতারই পরিচয়) ভবিষ্যতে তিনি কোন দিগন্ত উন্মোচিত করেন তার আকুল প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে রইলাম।

আমার বই
বুধবার পাবেন এক ছ১

~ www.amarboi.com ~

ছোটগল্পের দুঃসময়

ষাটের মাঝামাঝি ফুলস্ক্যাপ সাইজের সাদা কার্টিজ কাগজকে ফোলড করে ঢাকা থেকে কয়েকজন তরুণের সাহিত্য বিষয়ক ক্ষুদ্রাকৃতি *কয়েকটি বক্তব্য* প্রকাশিত হয়েছিল, তার ভেতর একটি লেখার কথা মনে পড়েছে এই মুহূর্তে, লেখাটি জ্যোতিপ্রকাশ দত্তর, রচনার নাম সম্ভবত ছিল 'গল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী'।

কাগজটি দীর্ঘদিন যত্নের সঙ্গে ছিল, এখন নেই, হারিয়েছে, কাজেই জ্যোতিপ্রকাশের সেই লেখার হুবহু উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব নয়। যতদূর মনে পড়ে বাংলা কবিতা অনেক বাঁক মোড় নিলেও, তিন দশক পরও তিরিশের আবহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনো, পক্ষান্তরে ছোটগল্প সেই তুলনায় বিস্ময়কর রকমের প্রাগ্রসর, তথাপি ছোটগল্পের বইয়ের বাজার নেই, প্রকাশকরা ছোটগল্পের বই ছাপতে ভয় পান বৈষয়িক ক্ষতির সম্ভাবনা কল্পনা করে, দৈনিকের রবিবাসরীয় পাতা কিংবা সাময়িক পত্রিকায় কষ্টে সৃষ্টে একটু ঠাঁই পেলেও কবিতার দাপটে তার অবস্থা বড়ই করুণ— এমনি ধরনের কিছু অভিমানমিশ্রিত ক্ষোভ সেই লেখাটির ভেতর ছিল।

নিতান্তই সাদামাটা ফোলড করা সেই কাগজটির কথা অনেকেরই হয়ত মনে নেই, অনেকের হয়ত তা চোখেই পড়েনি, কিন্তু আজ দীর্ঘ আট বছর পর তাকে বড় বেশি মনে পড়ছে, মনে পড়ছে এই জন্যে যে ছেষট্টি সাল থেকে চুয়াত্তর সালের দিনগত ব্যবধান দীর্ঘ হলেও অবস্থাগত কোনো ব্যবধান নেই, জ্যোতিপ্রকাশের ছেষট্টির বক্তব্যকে চুয়াত্তরের বক্তব্য হিসেবে অনায়াসে চালানো যায়, বরং অধুনা এই বক্তব্য আরো অধিকতর প্রযোজ্য

অধিকতর প্রযোজ্য এই জন্যে যে, জ্যোতিপ্রকাশ যখন তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করছিলেন, তখন কবিতার খুব যে একটা রমরমে অবস্থা ছিল এমন নয়, অর্থাৎ এখনকার মতো একেবারেই তরুণতম কবিদের কাব্যগ্রন্থ এমন দুদ্দাড় করে বেরুত না, সেই গ্রন্থের একাধিক এডিশনও হতো না, তবু গল্পের তুলনায় অবস্থা তার ভালোই ছিল।

সত্তরে এসে কবিতা দারুণ ভেলকি দেখাল, হু হু করে চোখের নিমেষে যেন দোকানগুলোর আলমারির তাক ভরে গেল কবিতার বই-এ। (আর সবচেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়ের, সেইসব গ্রন্থ একান্তভাবেই তরুণতমদের।) এবং বিক্রি হলো, এক বছরের ভেতর এডিশন শেষ হয়ে গেল, এডিশন বেরুল।

এমনি সব অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটাল সত্তর দশক। এইসব ঘটনার ভেতর দিয়েই চলছে বর্তমান, অর্থাৎ কবিতার দারুণ সুদিন এখন।

কবিতার পাঠক বেড়েছে, বাড়ছে, নিঃসন্দেহে আনন্দ-সংবাদ, সেই সঙ্গে আশাব্যঞ্জকও বটে, কেননা কবিতার পাঠক নিঃসন্দেহে সিরিয়াস পাঠক এবং এই পাঠককুল ইতিমধ্যেই জন্মলাভ করেছে এবং তার সংখ্যা যে বেশ বড়সড়ো তা বলাই বাহুল্য ; কেননা তা না হলে বছর না ঘুরতেই কাব্যগ্রন্থের এডিশন নিঃশেষ হতো না। এ উপলব্ধি উল্লসিত না করে পারে না।

কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে যখন গল্পকে দেখি তখন হতাশ না হয়ে পারি না। না, কবিতার প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ থেকে নয়, প্রশ্নই ওঠে না। কবিতার আমি একনিষ্ঠ পাঠক, যাঁদের বই বেরুচ্ছে তাঁরা সকলেই বন্ধু মানুষ, সাহিত্যিক সহযাত্রী, এঁদের কবিতা পাঠকমহলে আদৃত হচ্ছে, এঁদের গ্রন্থের এডিশন শেষ হলে তা আমার পক্ষেও শ্লাঘনীয়। তবু তুলনাটা এসে যায়, এই জন্যে নয় যে আমি কিছু কিছু গল্প লিখি, গত কয়েক বছর থেকে লিখে আসছি, কবিতা একটিও নয়, গল্পই আমার একমাত্র প্রণয়ী— তুলনা এই জন্যে যে, প্রকাশনার ক্ষেত্রে গল্প এবং কবিতার পরিস্থিতিগত দিকটা এমন অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে যে এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে তুলনা অবশ্যম্ভাবী এসে পড়বে।

যদি বলি সাইয়িদ আতিকুল্লাহ'র কথা, যাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হতে সময় লাগে ষোলো বছর, তার পাশাপাশি যদি কাব্যগ্রন্থের তুলনা এসে যায় তাহলে কবি বন্ধুরা, বিশেষ করে তরুণ সহযাত্রীরা আমায় ভুল বুঝবেন না আশা করি। (তরুণদের কথা এই জন্যে যে, কবিতার বাজার এখন তাঁদের দখলে যে কাব্যগুলো বাজার প্লাবিত করেছে তার রচয়িতা তরুণরা।)

সাইয়িদ আতিকুল্লাহ আমাদের গল্প সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, অথচ পাঠক তাঁকে প্রায় ভুলতেই বসেছিল আর, একজন সফল, শক্তিধর গল্পকারকে যদি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার জন্যে ষোলো বছর অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে এই মধ্যবর্তী সময়ের ভেতর তাঁর সাহিত্যিক উৎসাহ শিথিল হয়ে পড়লে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এমনিতেই এখানে গল্পকারের সংখ্যা কম, অন্তত কবির তুলনায়, তার ওপর প্রকাশকের কাছে গেলে প্রকাশক অজুহাত তুলবেন, কাগজের দাম বেড়েছে, প্রেসের ছাপার খরচ বেড়েছে। অস্বীকার করি না কাগজের দাম, মুদ্রণমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কথা কিন্তু তাঁদের কাছে সবিনয় প্রশ্ন, তাবলে কি গ্রন্থ প্রকাশ বন্ধ রেখেছেন আপনারা ? কাব্যগ্রন্থ তো আছেই এমনকি প্রবন্ধপুস্তকও প্রকাশিত হচ্ছে, প্রবন্ধের পাঠক সংখ্যা নিশ্চয়ই কবিতার সমকক্ষ নয়, তাহলে গল্পের ক্ষেত্রেই বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেন এইসমস্ত কথা ওঠে ? আর একটা কথা, কাগজ কিংবা মুদ্রণমূল্য বর্তমান অবস্থার যখন তিনগুণ কমছিল তখনো কি আজকের মতোই এসব ছেঁদো অজুহাত তোলেননি, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো। কিন্তু কেন, কাব্যগ্রন্থ বেরুবে, প্রবন্ধের বই বেরুবে এমনকি উপদেশমূলক বস্তাপচা 'নীতি কবিতা'ও বাজার পায় আর গল্প এমনই অচ্ছ্যুৎ যে তাকে দেখলেই আঁতকে উঠতে হবে !

ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি, এবছর প্রকাশিত একাধিক গল্পগ্রন্থের লেখক নিজেদের উদ্যোগে অর্থাৎ প্রকাশককে নিজের গাঁটের পয়সায় সহযোগিতা করে নিজের নিজের বই বের করছেন এবং সেই গল্পকাররা পাঠক মহলে রীতিমতো পরিচিত, আদৃত এবং বিশিষ্ট। কেন, প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রকাশক কি তাঁদের বই ছাপতে পারতেন না ?

আর একটি কথা, *ছোটগল্প* নামে শুধুমাত্র একটা পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রায় এক দশক যাবত প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং তার যথেষ্ট পাঠকও রয়েছে ; পক্ষান্তরে কবিতা সম্পর্কিত অনুরূপ কোনো পত্রিকা নেই অথচ কবিতার বই প্রকাশে কোনো অসুবিধে হয় না প্রকাশকের, প্রশ্ন তোলেন না কাগজের কিংবা মুদ্রণমূল্যের অস্বাভাবিকতার। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে একের পর এক, বিক্রি হচ্ছে, এডিশনও হচ্ছে। সুতরাং কবিতা বিষয়ক কোনো পত্রিকা না থেকেও যখন কাব্যগ্রন্থের ক্রেতা আছে তখন ছোটগল্পের পত্রিকা রয়েছে এবং তা যথেষ্ট পাঠক থাকা সত্ত্বেও গল্পগ্রন্থ বাজারে পাবে না এ কথা আমরা মেনে নিতে পারি না ; এ শুধু যুক্তি নয়, নিশ্চিত বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসের জন্ম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে।

আসলে গল্প সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রকাশককুলের এক ধরনের হাস্যকর, নির্বোধ ম্যানিয়া রয়েছে, যা কোনোক্রমেই স্বাস্থ্যপ্রদ নয়, বরং বৈনাশিক।

বিশ্বসাহিত্যে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে কনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রাগ্রসর মাধ্যমটির অর্থাৎ ছোটগল্পের প্রকাশনাগত এই দুঃসহনীয়, বেদনাদায়ক, আতঙ্কিত সংকটমুক্তির জন্যে প্রকাশকরা তাঁদের অযৌক্তিক, বদ্ধমূল ধারণাকে ঝেড়ে ফেলে ছোটগল্পের গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হবেন অবিলম্বে— এমন দৃশ্য অতঃপর আমাদের পক্ষে কি দুর্নিরীক্ষ থাকবে ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি ও আমার লেখা

আমি ও আমার লেখা—কথাটা ভাবতে গিয়ে বহু আগে পড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রাণেশ্বরে উপাখ্যান* উপন্যাসের শুরুর অনুচ্ছেদটির কথা মনে পড়ছে।

বইটি হাতের কাছে নেই, এতদিন পর সেই দীর্ঘ অনুচ্ছেদের হুবহু লাইনগুলো মনে করতে পারব না। আভাসটুকু মনে আছে মাত্র।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়ক প্রাণেশ্বর বলছে—নামটা কোনো ব্যাপারই নয়, নামের গুরুত্ব কর্মের মধ্যে উদাহরণস্বরূপ প্রাণেশ্বর বলছে, বাংলা সাহিত্যের খুব একজন বড় লেখকের নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তার নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় না হয়ে মানকে শর্মা হলেও কিছু এসে যেত না।

প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান, উপন্যাসের অনুচ্ছেদটি স্মরণ করার কারণ হলো এই যে, 'আমি ও আমার লেখা', কথাটির মধ্যে এ ধরনের অহংকার আছে।

লিখি বা লিখতে পারি এটাই বড় কথা না, বড় কথা হলো না লিখে আমার উপায় নেই। জীবনযাপনের এত যে চাপ, প্রতি মুহূর্তের এত লাঞ্ছনা, এত অপমান, ক্রোধ, ঘৃণা, হতাশা, ক্লান্তি, ভালোবাসা, সাধ, স্বপ্ন, বিশ্বাস—এসব ধারণ করব কীভাবে ? কাজেই লিখতেই হবে আমাকে। এখানে অহংকার বা আত্মশ্লাঘার কোনো ব্যাপার নেই, গোটা বিষয়টি আমার কাছে এক অন্তহীন দায়

এ দায়িত্ব কেউ আমায় চাপিয়ে দেয়নি এ আমার অন্তরের তাগিদ, কাজেই বানিয়ে বলা কেচ্ছার কোনো স্থান নেই।

সুন্দর বা কুৎসিত যা কিছু আমার চেতনাকে আঘাত করে তা-ই আমার সাহিত্য। সম্প্রতি প্রয়াত বিশিষ্ট সাহিত্যিক অসীম রায় যাকে বলেছেন চৈতন্যের আলোড়ন।

এই আলোড়ন একজন লেখককে অন্বেষী করে। এখানে সাফল্য বিফলতা বড় কথা নয়, লেখকের অ্যাটিচ্যুড-এর সিরিয়াসনেসটাই প্রধান বিবেচ্য। সে জন্যে একটি সৎ রচনা অন্য কোনো কারণে যদি সফল হয়ে নাও ওঠে, তবু তার মূল্য অনেক, কেননা তার মধ্যে একজন লেখকের চৈতন্যের আলোড়নকে অনুভব করা যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যা পাঠককে ভাবায় না, যে রচনার মধ্যে লেখকের চৈতন্য-মথিত রক্তের দাগ নেই সে রচনার কী প্রয়োজন।

এই দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে তথাকথিত একটি চরম হতাশাবাদী রচনাও হাজার বছর অতিক্রম করে টিকে থাকে, আবার কোনো প্রচণ্ড রচনাও শিশু-মৃত্যু বরণ করে।

প্রশ্নটি হলো শিল্প-সত্যের শক্তির। এখানে কোনো জোর খাটে না। কোনো চালাকি, কোনো ইচ্ছাপূরণ দিয়ে তাকে ধরা যায় না।

কথাগুলো খুব কেতাবি শোনাচ্ছে ? কিন্তু আমি যা বিশ্বাস করি তা হলো এই। যদি কেতাবি মনে হয় তাহলে যার যার ভাষায় তা অনুবাদ করে নেয়া যেতে পারে, তাতে কিন্তু আমার বক্তব্য বা বিশ্বাসের কোনো হেরফের হবে না।

আমি ও আমার লেখা নিয়ে কোনো কিছু বলা অতঃপর আমার পক্ষে মুশকিল, কেননা নিজের লেখার ব্যাপারে সবচেয়ে অসন্তুষ্ট আমি।

ইনিয়ে বিনিয়ে স্মৃতিকথা বলা যেতে পারত : কীভাবে লেখা শুরু করলাম। কোন লেখা কীভাবে শুরু হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ওসবে আমার মন সায় দেয় না। প্রাণেশ্বরের কথাগুলো মনে পড়ে যায়। কলম আড়ষ্ট হয়ে আসে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার লেখা

নিজের লেখার ব্যাপারে সবচেয়ে অসন্তুষ্ট আমি লেখার চেয়ে লেখা নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় সময় কেটে যায় আমার অনেক বেশি। ফলে লেখার সংখ্যা বাড়ে না। লেখালেখি নিয়ে এত বছর কেটে গেল ; কিন্তু লিখতে বসলেই মনে হয় এই প্রথম কলম ধরছি, দারুণ চ্যালেঞ্জ বোধ করি— যেন রিঙের ভেতরে ক্রুদ্ধ ঘাড়ের সামনে ম্যাটাডোর। যে কোনো সময় ওই তীক্ষ্ণ শিঙে আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে।

নিজেকে এত যে দুমড়ে মুচড়ে নিংড়ে শেষ করে লেখাটা লিখলাম সেই লেখাই যখন ছাপার হরফে দেখি তখন নিজের অক্ষমতার জন্যে নিজের ওপরেই রাগ ধরে। কোথায় ? যেমন করে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলাম তা বলা হলো কোথায় ?

এই হলো আমার লেখালেখির অন্দর মহলের খবর। না, নিজের লেখা নিয়ে আমি স্থির নিশ্চিত হতে পারিনি এখনো। সারাজীবনেও কি পারব ?

তবে একটি ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, যতদিন বেঁচে থাকব, লিখে যেতে হবে আমাকে। না লিখলে জীবনযাপনের এত যে চাপ, প্রতি মুহূর্তের এত লাঞ্ছনা, এত অপমান, ক্রোধ, ঘৃণা, হতাশা ক্লান্তি, ভালোবাসা, সাধ স্বপ্ন, বিশ্বাস— এ সব ধারণ করব কীভাবে ? কাজেই লিখতেই হবে আমাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কঠিন মাটি ও শক্ত ফ্রেম

হাসান আজিজুল হকের দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি অত্যন্ত দৃঢ়। এই দৃঢ়তা বহিরাঙ্গিক নয়, তাঁর মনন, তাঁর চেতনা লেখক হিসেবে তাঁকে যে চারিত্রিক মনোভঙ্গি দান করেছে এর অবস্থান সেখানে। ফলে বিষয় পাল্টায়, প্রকাশভঙ্গি পাল্টায়, কিন্তু চরিত্রটি থেকে যায়।

সম্প্রতি প্রকাশিত হাসান আজিজুল হক তাঁর নির্বাচিত গল্প (১৯৮৭)-এর ভূমিকায় বলেছেন, 'কুড়ি বছর ধরে আমার দেশ ও কালের প্রতি আমি যেভাবে সাড়া দিয়েছি বা দিতে চেয়েছি তারই বিবরণ হিসেবে ধরতে হবে বর্তমান সংকলনের গল্পগুলোকে। এদের মূল্য বলতে এইটুকুই... নিজের ধরনের প্রতিক্রিয়া জানানো ছাড়া একজন লেখক আর কি-ই বা করতে পারেন। তাঁর প্রতিবাদ, তাঁর প্রতিরোধ, তাঁর ক্রোধ ছাড়া লেখার কাজে লেখক আর কিছু করতে পারেন বলে মনে হয় না।'

নির্বাচিত গল্প গ্রন্থটিতে তাঁর এ যাবত প্রকাশিত পাঁচটি গল্পগ্রন্থ থেকে 'শকুন', তৃষ্ণা, 'গুণীন', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'পরবাসী', 'আমৃত্য আজীবন', সরল হিংসা, সাক্ষাৎকার, পাতালে হাসপাতালে, ঘরগেরস্থি, ফেরা, নামহীন গোত্রহীন, 'শোণিত সেতু', 'খাঁচা'— এই ১৪টি গল্প নির্বাচন করেছেন।

একদিকে বৃক্ষ বিরল ধূসর রাঢ়, মাঝখানে সুন্দরবন ঘেঁসা ঘন সবুজ পলিময় নোনাভূমি, অপরদিকে ধূলি ধূসর প্রখর রৌদ্রদগ্ধ বরেন্দ্র অঞ্চল— এই বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে বিপুল জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নানা দোলাচলে স্পন্দিত যে জীবনপ্রবাহ গত ২০ বছর ধরে আন্দোলিত হয়েছে তাকে তিনি এই গল্পগুলোতে ধারণ করেছেন।

বাস্তবতাকে তিনি দেখেছেন খোলা চোখে— কোনো পূর্ব সিদ্ধান্ত তার ওপর চাপিয়ে দেননি। শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে এই বাস্তবতাকে সরাসরি মোকাবেলা করেছেন বলেই তা বায়বীয় ভাবালুতা বা ইচ্ছা পূরণের উপায় হয়ে ওঠেনি। ফলে তাঁর গল্পে রুখে দাঁড়ানো কিংবা নীরব-কঠিন প্রতিবাদ যেমন আছে তেমনি আছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ভীতি, আতঙ্ক, ঘৃণা, ভালোবাসা, ক্রোধ, পরাজয় ও মৃত্যু। এবং সবকিছু এসেছে সমাজ সত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কারণে ব্যক্তির পরাজয় বা মৃত্যু তাই শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত চিত্র না হয়ে তা হয়েছে অবিরাম জীবন সংগ্রামেরই অংশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাজসজ্ঞান হাসান আজিজুল হক নামের লেখকটি এভাবেই তাঁর দায়বদ্ধতা বা 'প্রতিক্রিয়া' ব্যক্ত করেন।

এই সচেতনতা তাঁর গল্পের শুরু থেকেই লক্ষ করা গেছে, প্রথম গল্পগ্রন্থ *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্যের* 'শকুন', 'তৃষ্ণা', 'গুণীন' এমনকি 'মন তার শঙ্খিনী' গল্পটিকেও ধরতে চাই— এসব গল্পে ক্ষুধা, শোষণ, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, লোকজ সংস্কৃতি সরাসরি উঠে এসেছে, মনে হয় লেখক গল্প লেখার চেয়ে এই মানুষজন, তার পরিবেশ, তার সমাজ যেমনটি আছে তাকে তিনি তেমনভাবেই দেখতে চান, ফলে আলো-আঁধারিময় আদিম পরম্পরা ফুটে উঠেছে এইসব গল্পে।

তবে সার্বিকভাবে *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্যের* ভাষা বা প্রকাশভঙ্গি প্রথাগত, মোটা দাগের, কাঁচা আবেগও দৃষ্ট হয় কোথাও কোথাও, কোনো কোনো গল্পের বিশেষ বিশেষ জায়গায় লেখকের হাত কেঁপে গেছে দেখতে পাই, অনেক গল্প পড়ে মনে হয়েছে— এ গল্প অন্য কেউও লিখতে পারেন।

দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *আত্মজা ও একটি করবী গাছ*-এ ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে লক্ষ করা গেল বিস্ময়কর পরিবর্তন— বহুকৌণিক দ্যুতিময়, কাব্যের অনুচূর্ণ মেশানো, চাপা কৌতুকবোধে তীক্ষ্ণ। কিন্তু সেই সঙ্গে চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হলো প্রথম গ্রন্থের স্বতঃস্ফূর্ত তাজা ভাবটি। এই গ্রন্থের পর থেকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন গল্পে প্রকাশরীতির নানান বুদ্ধিদীপ্ত রূপান্তর ঘটিয়েছেন তিনি, তাঁর লক্ষ্য হয়ত বহুগুণে সংহত ও সূচিমুখ হয়েছে, কিন্তু শত দুর্বলতা নিয়েও প্রথম গ্রন্থের সেই যে Freshness তা আর ফিরে আসেনি।

আমার বিবেচনায় প্রথম গ্রন্থের 'শকুন', 'তৃষ্ণা', 'গুণীন' এবং 'মন তার শঙ্খিনী'র সেই স্বতঃস্ফূর্ততাকেই যদি পরবর্তীকালে অনুসরণ এবং পরিপুষ্ট করতেন তাহলে সেটাই হতো স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত কিন্তু তা না হয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ থেকে লেখক যেন নিজের বিরুদ্ধে নিজেই মরিয়া জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তাঁর মন গেছে নির্মম পরিমার্জনার দিকে। এই অতিরিক্ত Perfection সচেতনতা লেখককেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ; দ্বিতীয় গ্রন্থ থেকে তাঁর গল্প হয়েছে বড় বেশি নিটোল, বড় বেশি Finished— সমাজ, নিসর্গ, মানুষ, তাদের মুখের অবিকল সংলাপ, লেখকের চাপাকৌতুক— সব মিলিয়েও কেমন এক শক্ত ফ্রেমের মধ্যে আঁটসাঁট করে বাঁধা। নিজেকে ছড়ানোর ক্ষেত্রে লেখক নিজেই বাধা হয়ে দাঁড়ান। ফলে অনুপুঙ্খতা সত্ত্বেও তাঁর গল্প গভীর কোনো ব্যাপ্তি লাভ করে না, পাঠককে ভাবনার নতুন কোনো গূঢ় উদ্ভাসন সূত্রের সন্ধান দেয় না ; লেখক যা দেখান শুধুমাত্র তার প্রবল দৃশ্যগ্রাহ্যতার মধ্যেই পাঠকের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে।

হাসান আজিজুল হকের গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ— কোনো পুনরাবৃত্তি নেই, প্রথম গ্রন্থ থেকে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ গ্রন্থের বিষয় ও প্রকাশ রীতিতে প্রতিটি গল্পই স্বতন্ত্র। কিন্তু একটি ক্ষতিকর প্রবণতা তাঁর কোনো কোনো গল্পে লক্ষ করা

সুনিবার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যায়, তাহলো গল্পের ভেতর সরাসরি ঢুকে পড়েন তিনি। যেমন 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পের বুড়োটির সংলাপ : 'আমি যখন এখানে এলাম... এখানে যখন এলাম... আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই... আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে ?... ফুলের জন্য নয়... বিচির জন্য, বুঝেছ করবী ফুলের বিচির জন্যে, বুঝেছ করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।'

এই সংলাপ যুগপৎ চরিত্রের স্বাভাবিকতা এবং গল্পের প্রতীককে দারুণভাবে জখম করেছে।

এ ধরনের ব্যাপার তাঁর 'জীবন ঘষে আগুন' নামের গল্পটিতেও লক্ষ করা যায়, গল্পের শেষাংশের নাটকীয়তা দেখে মনে হয় লেখক একেবারেই ধৈর্যহীন হয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন।

'শোণিত সেতু' গল্পে দুটি ষাঁড়ের লড়াই, একজন মরণাপন্ন মানুষ, কৃষক, কৃষক আন্দোলনের কর্মী, অন্যায়ভাবে ধান কেটে নিয়ে যেতে উদ্যত বিত্তবান গোষ্ঠী, এই ক'টি বিষয়কে একই ফ্রেমে বেঁধে স্থানীয় ষাঁড়ের কাছে বহিরাগত ষাঁড়ের পরাজয়, রোগাক্রান্ত লোকটির উঠে বসা, পরাজিত পলায়মান ষাঁড়টির পেছনে ধাওয়া করা মানুষের সম্মিলিত চিৎকার— গোটা ব্যাপারটি বড় সাজানো, যেন গল্পের নামটিকে আগে ঠিক করে নিয়ে সেই অনুযায়ী গল্পটি রচিত। অথচ দুটি ষাঁড়ের মরণপণ লড়াইয়ের যে অনুপুঙ্খ স্নায়ু-ছেঁড়া বর্ণনা, তার কোনো তুলনা হয় না। এই অসাধারণ দক্ষতা সত্ত্বেও গল্পটি মার খেয়ে যায় লেখকের সচেতন, সাজানো ছকের জন্যে।

'তৃষ্ণা' গল্পের '... কিংবা বলা যায়, একটা তীক্ষ্ণ তীব্র মৃত্যুর অমোঘ প্রবৃত্তি গড়াতে গড়াতে এগিয়ে চলল ঢালু পাড় বেয়ে তার মৃত্যুর দিকে'— এই লাইনটিকে লেখক এভাবে না বললে ভালো করতেন। যেমন *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্যের* 'শকুন' গল্পটির দুটি জায়গা নির্বাচিত গল্পে বর্জন করেছেন : 'কিন্তু শিশুটার পেটে প্রথম দুর্বল ঠোঁটের আঘাত বোধ হয় মরা শকুনিটার।' এবং গল্পের একেবারে শেষাংশে '... মরা শকুনিটার মতোই'।

নির্বাচিত গল্পে 'তৃষ্ণা' গল্পটির ওই লাইনের ব্যাপারে এই সচেতনতা দেখাতে পারতেন অনায়াসে।

এত গেল তাঁর গল্পের কথা, কিন্তু বাংলাদেশের একজন প্রধান লেখক, সমাজ, মানুষ, সময়ের বিচিত্র দোলাচালের প্রতি যাঁর এত সজাগ অনুসন্ধিৎসা, যাকে নানান দিক থেকে ধরার জন্যে গল্পে, প্রবন্ধে, ব্যক্তিগত জার্নালে, আলোচনায় এত রক্তাক্ত আকুলতা যাঁর, আজ দীর্ঘ দু'দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে একখানিও উপন্যাস বেরুবে না তাঁর হাত থেকে, এ বড় বিস্ময়ের কথা !

হাসান আজিজুল হক কি তাহলে দীর্ঘদিন ধরে নিজের হাতে একটু একটু করে নির্মাণ করা তাঁর গল্পের শক্ত খাঁচার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না ?

~ www.amarboi.com ~

নিজের সঙ্গে আলাপ

বাংলাদেশের সাহিত্যে সংকট দেখা দিয়েছে—এ ধরনের একটা কথা আজকাল শোনা যায়, এ নিয়ে সেমিনারও হয়—কবিতায় সংকট, কথাসাহিত্যে সংকট, প্রবন্ধে সংকট।

সংকটটা কী ?

আলোচনার সুবিধের জন্য কথাসাহিত্যিককে বেছে নিয়ে বিষয়টিকে খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

কথাসাহিত্যের পা নিরেট বাস্তবের ওপর। ভাববাদী, বস্তুবাদী, উভয় কথাসাহিত্যিকেই এই বাস্তবতার সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা করতে হয়। কবি যেমন একটি উপমা বা চিত্রকল্পে, একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে তার কালের বিশাল পটটিকে ধরে দিতে পারেন, কথাসাহিত্যিকের সে সুযোগ নেই। তাঁকে অনেক মানুষ জড়ো করতে হয়, অনেক কথা বলতে হয়, এইসব মানুষ, তার পরিবেশ, তার সমস্ত কিছু ভেতর-বাহির খুঁড়ে, শিকড়-বাকড় বার করে, দেখতে হয়। এমনকি যদি তিনি তাঁর রচনায় কাল-নিরপেক্ষ বিষয়ও ধারণ করেন, তবু তাকে স্থাপন করতে হবে বাস্তবের মাটিতে—যেখানে শ্রমে, ঘামে, আনন্দে, বিষাদে, সাফল্যে, ব্যর্থতায়, স্বপ্নে, সাধে মানুষের জীবন স্পন্দিত হয়।

'শুনহ মানুষ ভাই—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—মধ্যযুগের সামন্তসমাজের সমস্ত লাঞ্ছনা অপমানের বিরুদ্ধে অপরাজেয় মানবিক বিদ্রোহ—এই একটি মাত্র লাইন, কয়েক শতাব্দী অতিক্রম করে আজো সত্য হয়ে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

এই সত্যটিকে ধরার জন্যে কত কথাসাহিত্যিক কতভাবে কত না চেষ্টা করে চলেছেন, পাতার পর পাতা লিখেও তৃপ্তি নেই, না লেখকের, না পাঠকের।

কেননা সমাজ প্রেক্ষিতটি প্রতি মুহূর্তে নানা অভিঘাতে আলোড়িত হচ্ছে—মানুষের মন, সমাজের মন, জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সমকালের এইসব ঝড়-ঝাপটা, আলোড়ন, আঁধি এবং ব্যাধির সমস্ত দুর্ভোগ ভোগ করে করে, তার দায় মিটিয়ে তারপর টিকে থাকার বা কালোত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয় কথাসাহিত্যিককে। সহজ কর্ম নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখক সমাজে বাস করেন, সময়ে বাস করেন, তাঁর যাপিত জীবনের সঙ্গে চারপাশের সমাজ এবং মানুষের জীবনের সংযোগ রয়েছে, এই সংযোগের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় তাঁর অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি। এই অভিজ্ঞতা—উপলব্ধিকে সবচেয়ে দক্ষতার সঙ্গে ঘটিয়ে দেখাতে হয় তাঁকে। কী লিখবেন—এটা যেমন বিবেচনার বিষয়, কীভাবে লিখবেন, এটাও তাঁর বিবেচনার বিষয়।

লিখতে গিয়ে লেখক যদি মনে করেন, যেভাবে গল্প উপন্যাস লেখা হয়ে এসেছে এতদিন, সেভাবে লিখলে যা তিনি দেখাতে চান, যা তিনি বলতে চান, তা দেখানো বা বলা যাচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে, সংকট তাঁর দেখাবার কৌশলের নয়, সংকট নিহিত রয়েছে ঐ বিষয়েরই মধ্যে, অর্থাৎ যে সমাজ প্রেক্ষিত থেকে ঐ কৌশলটি জন্ম লাভ করেছিল, সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হতে হতে যা তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের কাল পর্যন্ত ঠেকেছিল, সেই সমাজ প্রেক্ষিতটি আর তেমন নেই।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর এক দীর্ঘ প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন, যে বুর্জোয়া ব্যবস্থা কথাসাহিত্যের জন্ম দিয়েছে, সেই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যেসব প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল একদিন, সে প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়েছে।

সেই ভেঙে পড়ার সচিত্র উদাহরণ তিনি দিয়েছেন তাঁর রচনায়। অপর আর এক অগ্রণী কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক ব্যক্তিগত এক পত্রে বলেছিলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ বাস্তবতাকে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর এতদিনের জানা সমস্ত কলাকৌশল ব্যর্থ হচ্ছে। এই দুটি উদাহরণই প্রমাণ করে যে, বিষয়টি অত সহজ নয়।

যে লেখক এই সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে চান এবং যিনি নতুন সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন, সময়ের আঁচ থেকে তাঁদের কারুরই রেহাই নেই। এর মধ্য দিয়ে যে কথাটি সামনে এসে যাচ্ছে—তা হলো, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সংকট একান্তভাবে সাহিত্যগত কোনো সংকট নয়, এ সংকট বস্তুত সমাজেরই সংকট।

সেই সংকটের সামগ্রিক রূপটিকে যথাযথভাবে আপন উপলব্ধিতে ধারণ করতে পারলেই লেখক তাঁর প্রকাশের সংকটও অতিক্রম করতে পারবেন।

কালের দায়, কালোত্তীর্ণের দায়, শিল্পের দায়, সবকিছুই বস্তুত সমাজেরই দায়, মানুষেরই দায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লিটল ম্যাগাজিনের সমস্যা

সাহিত্য পত্রিকা প্রয়োজন। তারুণ্যের স্পর্ধার উত্তপ্ত লিটল ম্যাগাজিন চাই— ভীষণভাবে, প্রচণ্ডভাবে চাই। সবাই অনুভব করছি, পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছি, তবু, হচ্ছে কি হয়ে উঠছে না। কেন হচ্ছে না ? উৎসাহ উদ্যোগের অভাব ?

যে ধরনের পত্রিকা আমাদের আলোচ্য তা কোনো লাভজনক মাধ্যম নয়। যারা এইসব পত্রিকা প্রকাশ করেন তারাও রজতের মধুর ঝনাৎকারের প্রতি লব্ধতা নিয়ে আসেন না, আসেন প্রাণের ভেতর শিল্পের যে ক্ষ্যাপা বাউলটা আছে তার প্ররোচনায়। কিন্তু, পরিপার্শ্ব যদি সেই প্রাণটা ধরেই টান দেয় তখন জহরব্রত করা ছাড়া উপায় থাকে না।

ধরা যাক *ছোটগল্প*র কথা। এখানকার একমাত্র মাসিক গল্প পত্রিকা হিসেবে দীর্ঘ দশ বছর ধরে চালু ছিল। *ছোটগল্প* আজ বন্ধ। পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান নিবন্ধকার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল এর সঙ্গে। কামাল বিন মাহতাব সম্পাদিত এই পত্রিকাটি কীভাবে টিকে ছিল, তার আনুপূর্বিক ইতিহাস নিবন্ধকারের জ্ঞাত। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে শুধুমাত্র প্রচণ্ড সাহিত্য প্রেম ছাড়া অন্য কোনো বিত্ত ছিল না তার।

ছোটগল্প হয়ত নিজস্ব একটি 'স্কুলে'র জন্মদান করতে পারেনি। দাবিও করে না। তবে, একটা ব্যাপার ঠিক— আজকের মোটামুটি পরিচিত তরুণদের অনেককেই লালন করেছে পত্রিকাটি। কাউকে কাউকে সাহিত্যের এই মাধ্যমটিতে টেনে এনেছে।

প্রচুর উদার প্রশ্রয় ছিল এর— অনেক কাঁচা লেখা, কিন্তু সম্ভাবনাময় তরুণের রচনা— ভবিষ্যতে ভালো শিখবে এই বিশ্বাস এবং ভালোবাসা থেকে কাছে টেনেছে তাকে। শুধু মৌলিক গল্প নয় বিদেশি গল্পের অনুবাদ, গল্পবিষয়ক প্রবন্ধ, গল্পকারদের সাক্ষাৎকার, গ্রন্থ সমালোচনা, আলোচনা, নিজের সাহিত্য গল্পকারের ভাবনাচিন্তা, পাঠকের মতামত ইত্যাকার বিষয় নিয়ে ছিল পত্রিকাটি।

এসবের যদি আদৌ কোনো মূল্য থাকে, সাহিত্যের এই বিশেষ মাধ্যমটির প্রতি পাঠককে যদি সামান্যতম উৎসাহিত কৌতূহলী করে থাকে তা সে এই পত্রিকাটি। এসব কোনো শ্লাঘার কথা নয়, সত্য কথা।

কিন্তু বন্ধ হলো কেন পত্রিকাটি ? প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ? উৎসাহে ভাটা পড়েছে ? না, প্রয়োজন ফুরোয়নি, বর্তমানে বরং আরো তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

বাংলাদেশ
বুলবার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসাহেও ভাটা পড়েনি। কিন্তু তবু কেন বেরুচ্ছে না— এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর হলো স্রেফ আর্থিক কারণ। সম্ভব নয় সাধ্যের বাইরে চলে গেছে।

পাঠকের অবগতি এবং অধুনা বাস্তব পরিস্থিতি বুঝবার জন্যে আজ থেকে দশ বছর আগে, ১৯৬৭ সালে ৬ ফর্মার এই পত্রিকাটি প্রকাশ করতে বিভিন্ন খাতে যে খরচ পড়ত নিচে তার হিসাব দিচ্ছি :

১ ফর্মা ছাপা ডিমাই ৮/১ সাইজ (ভালো প্রেসে) = ৪০ টাকা, ১ রিম কাগজ : ৩৬ পাউন্ড হোয়াইট প্রিন্ট ৪০/৪৫ টাকা, ৬ ফর্মা জুস বাঁধাই এক হাজার কপি = ৩০ টাকা, কভারের কাগজ : (বিদেশি বক্স বোর্ড) একশো শিট = ৫০ টাকা, ব্লক : প্রতি রং (প্রতিবর্গ ইঞ্চি) = ৫০ পয়সা।

আজ, ১৯৭৭ সালে ওই একই কলেবরে, একইভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে গেলে যে খরচ পড়বে, ১ ফর্মা ছাপা : ডিমাই ৮/১ সাইজ (ভালো প্রেসে) সর্বনিম্ন = ২৫০ টাকা, ১ রিম কাগজ : ৩৬ পাউন্ড হোয়াইট প্রিন্ট, সরকারি = ২১৪ টাকা, বেসরকারি = ২০০ টাকা, ৬ ফর্মা জুস বাঁধাই এক হাজার কপি, সর্বনিম্ন = ৯০ টাকা, কভারের কাগজ (দেশি বক্স বোর্ড) একশো শিট = ২৫০/২৬৫ টাকা, ব্লক : প্রতিরং (প্রতি বর্গ ইঞ্চি) = ৩.৫০ টাকা।

তুলনামূলক হিসাব দেয়া হলো। পাঠক মিলিয়ে দেখুন এবং বিবেচনা করুন শুধুমাত্র সাহিত্যপ্রেম নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অসুস্থ যৌনপত্রিকা শাসিত (সিনেমা এবং রম্য পত্রিকার নামেও) এই পরিবেশে কীভাবে নির্ভেজাল সাহিত্য, তাও শুধুমাত্র গল্পের পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব।

পত্রিকা বিক্রির ওপর ভরসা করে পত্রিকা চলে না, আর সাহিত্য পত্রিকার জন্যে তা কল্পনা একমাত্র অকাট মূর্খ ছাড়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব অগতির একমাত্র গতি বিজ্ঞাপন। ছোটগল্প— বিগত দিনগুলোতে যে কষ্টে-সৃষ্টে টিকে ছিল তার কারণ সে অবস্থা বহুল পরিমাণ সহনীয় ছিল, আর ছিল বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরতা।

অধুনা সম্ভাব্য বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন বিমুখ ব্যবসা মন্দা, তদুপরি লিটল ম্যাগাজিনের ব্যাপারে তাদের নিদারুণ ঔদাস্য। আর একটি ব্যাপার এবং সেটাই সবচেয়ে প্রচণ্ড আগে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ভরযোগ্য এবং উৎসাহজনক অংকের টাকার বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত, এখন তা পাওয়া যায় না। সরকার নির্ধারিত হার ছাড়া ঐসব প্রতিষ্ঠান একপাই পয়সা বেশি অংকের বিজ্ঞাপন দিতে পারে না।

এতদ্বারা কেউ যে ভুল না বোঝেন যে, আমার বক্তব্য রাষ্ট্রীয়করণ বিরোধী। আমার তা বিষয়ও নয়, আমি শুধু বাস্তব পরিস্থিতিটি তুলে ধরছি মাত্র। যার সঙ্গে সাহিত্য পত্রিকার ভাগ্য জড়িত।

শুধু *ছোটগল্প* নয়। এই ধরনের যে কোনো পত্রিকার এই দশা। অতএব সাহিত্য পত্রিকা যত প্রয়োজনীয়ই হোক, লিটল ম্যাগাজিনের বড় পরিকল্পনাই থাকুক, উৎসাহী তরুণ, তার অন্তর্গত প্রাণ প্রবাহে স্বজনের মহৎ বেদনা নিয়ে যতই কষ্ট পাক, নিরেট বাস্তবের প্রতীক তাদের সামনে *ছোটগল্প* এবং আমরা এর পরিবর্তন চাই।

সুনিবাচন পাঠক এক হও

অগ্রন্থিত কায়েস আহমেদ

~ www.amarboi.com ~

হাসান আজিজুল হক

হাসান আজিজুল হকের গল্প ধারণ করে আছে দুটি ভিন্নতর ভূগোল—একদিকে ধূসর রুক্ষবৃক্ষ বিরল রাঢ়, অন্যদিকে সুন্দরবনের কোলঘেঁসা সজল শ্যামল নরম পলির খুলনা এলাকা।

জন্ম তাঁর পশ্চিম রাঢ়ে। শেষ কৈশোরে সেই রাঢ়ের স্মৃতিধারণ করে চলে আসেন খুলনায়, এখানেই স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছেন। তারপর তো দিনরাত্রি গত হয়েছে এখানকার রোদ বৃষ্টি, আলো আঁধারি গায়ে মেখে। মাঝে মাঝে ফেলে আসা রাঢ়কে দেখে আসেন।

ফলে একজন হাসান আজিজুল হক যিনি এই দুই বিপ্রতীপ অঞ্চলের মাটি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানুষ, সময় এবং প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন, তিনি তাঁর গল্পে এই সমস্ত কিছুকে গভীর ভালোবাসায় কিন্তু শৈল্পিক নিরাসক্তিতে দুমড়ে মুচড়ে আমূল তুলে আনেন।

নিজের গল্প সম্পর্কে হাসান আজিজুল হকের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাব উল্লেখযোগ্য : 'আমার প্রতিটি গল্প আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো গল্প আমি লিখি না।'

এই 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' সামাজিক বাস্তবতারই নামান্তর। কিন্তু দৃশ্যমান বাস্তবতাই শেষ কথা নয়, তাকে তিনি আপন উপলব্ধিতে জারিত করে নিয়ে নিজস্ব একটি বাস্তববোধ তৈরি করেন সেখানে আবহাওয়া, প্রকৃতি, মানুষ এমনকি জীবজন্তু পর্যন্ত মিলেমিশে যায়, কিন্তু নিজস্ব entity হারিয়ে নয়—মানুষের মতো প্রকৃতি ঋতু বৈচিত্র্য এবং জীবজন্তুও হয়ে যায় গল্পের চরিত্র।

এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের গল্পের উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বোধ করি, তারাশঙ্করের বহু গল্প রাঢ়ের প্রকৃতি মানুষ এবং জীবজন্তু বিধৃত, তারাশঙ্করের এই পটভূমির চরিত্রাবলি সমাজের নিম্নতলবাসী। হাসান আজিজুল হকের গল্পেও এই সমুদয় বিষয় উপস্থিত।

কিন্তু তারাশঙ্করের মানুষরা সামাজিক এবং পরিবেশগত পরিচিতির আবেষ্টনীর ভেতর থেকে বেঁচে থাকার নিজস্ব মুদ্রা, শরীর এবং ভঙ্গি নিয়ে ধরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেয় না, তাঁর (তারাশঙ্করের) ঝোঁক যেহেতু আখ্যান রচনায় ফলে কাহিনীর টানেই তারা ভেসে যায়। তারাশঙ্করের নিসর্গচিত্রও মোটা রেখায় আঁকা।

হাসান আজিজুল হকের গল্প তারাশঙ্করের মতো tale জাতীয় নয়। তাঁর (হাসান আজিজুল হকের) শিল্পদৃষ্টি ভিন্নতর, ফলে কি রাঢ়ের কি খুলনার পটভূমি সর্বক্ষেত্রেই তাঁর গল্প আলাদা।

হাসান আজিজুল হকের গল্পে মানুষ তার আপন পরিবেশগত, সামাজিক এবং গোত্র পরিচয়ের যথার্থ প্রতিনিধি। অথচ তারাশঙ্করের 'ডাক হরকরা' 'দীনু' গোত্র পরিচিতিতে ডোম শ্রেণীর, কিন্তু 'দীনু ডোম'—লেখকের এই অত্যন্ত স্বল্প একটি পরিচিতির মধ্যে সে সীমাবদ্ধ থাকে, তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা দেয়নি। অর্থাৎ ওই শব্দটি ব্যবহার করা সত্ত্বেও দীনু একজন যে কোনো সাধারণ গরিব, গ্রাম্য, সৎ ব্যক্তিই রয়ে গেছে। এছাড়া তারাশঙ্করের নিম্নতলবাসী অন্যান্য চরিত্রেও তিরিশের অপরাপর লেখক—যাঁরা এদের নিয়ে গল্প লিখেছেন—তাঁদের গল্পের মতো এইসব চরিত্রের গায়ে পালিশ লেগেছে, হাসান আজিজুল হক সে ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বস্ত।

ঘরোয়া আলাপে হাসান আজিজুল হক যেমন প্রসঙ্গিত ব্যক্তির সংলাপ, কণ্ঠস্বর, চোখের ভঙ্গি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাড়া কিংবা মুখের বহুতর ভাবকে নিয়ে অত্যন্ত সুনিপুণ এবং রসগ্রাহী 'মিমিক' করেন—গল্পও তা-ই।

আপাতদৃষ্টিতে তাঁর গল্পকে কাহিনী বা আখ্যান নির্ভর মনে হলেও আসলে সেখানে জমজমাট কোনো কাহিনী থাকে না।

চরিত্রের মনোজগতের গভীর গহন অন্তর্লোকের বিশ্লেষণেও হাসান আজিজুল হক উৎসাহী নন, তাঁর লক্ষ্য বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের সর্ব অবয়াবিক আচার-আচরণ অর্থাৎ তার সংলাপ এবং action-এর প্রতি। এবং এর মাধ্যমেই কী অনায়াসে অবলীলায় ভেতরের মানুষটিকে টেনে বের করে আনেন তিনি মানুষের মুখের হুবহু সংলাপ এবং তার বিচিত্রমুখী শারীরিক ভঙ্গিমার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রাসঙ্গিক জীবজন্তুর অবয়াবিক অস্তিত্ব এবং আচরণ, আবহাওয়া, নিসর্গ দিন রাত্রির আলো আঁধারির চূর্ণচূর্ণ Detail-এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে তিনি তৈরি করেন তাঁর গল্পের অবয়ব। মনে হয় লেখক যেন এই সমস্ত কিছুকে অসীম কৌতূহল নিয়ে প্রত্যক্ষ করছেন। এদের শারীরিক অস্তিত্ব, এমনকি তাঁর গল্পের বর্ণিত রোদ, ধুলো, বৃষ্টি, শীতকে পাঠক গন্ধ ও স্পর্শসহ অনুভব করে।

এসব সম্ভব হয় পরিবেশ এবং ধারাবাহিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে মানুষ এবং তার সামগ্রিক জীবন চর্যা সম্পর্কে ধারণার জন্যে।

গল্পকথনের একটি ভাষাও তৈরি করে নিয়েছেন তিনি, যা তাঁর একান্ত নিজের—ঋতু, বেগবান, তীক্ষ্ণ অস্থিমজ্জা নিয়ে প্রবল দাহ্য সেই গদ্যে অব্যর্থ আয়ুধের মতো বিষয়কে তিনি চিরে ফেঁড়ে পাঠককে দেখান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যার ভেতর ধরা থাকে মানুষের কাম, ক্রোধ, নৈরাশ্যময়তা, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, সংস্কার, বিশ্বাস সারল্য, দুর্জ্ঞেয়তা, ঘৃণা, ভালোবাসা, বেদনা এবং সংগ্রাম নিয়ে যুগ যুগান্তের জনজীবন আর 'রং, বীর্য, অন্ধ, নিস্পৃহতা' নিয়ে এই সবের সঙ্গে মিশে থাকে তার চিরসাথি নিসর্গ প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে জীবজন্তু।

আবার এই গদ্যও তাঁর গতিশীল, একই গল্প যেমন তিনি একাধিকবার লেখেন না, তেমনি গল্পের বিষয় এবং মেজাজ অনুযায়ী গদ্যকেও ভেঙেচুরে নতুনতর নির্মাণেও স্বাচ্ছন্দ্যময় শক্তির অধিকারী তিনি।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ : *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য*-এর ভাষা এবং দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ : *আত্মজা ও একটি করবী গাছ*-এর ভাষার মধ্যে স্পষ্টত পার্থক্য আছে।

সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য-র গদ্য দগদগে, ঝাঁজালো, মাংসল এবং রাগী। *আত্মজা ও একটি করবী গাছ*-এর ভাষা পরিপাটি, কাব্যের দ্যুতিময় রেণুচূর্ণ মাখানো। এ গ্রন্থের এবং বোধকরি হাসান আজিজুল হকের এ পর্যন্ত লিখিত গল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই মহাকাব্যিক গল্প 'আমৃত্যু আজীবন'-এর বিরাট ক্যানভাসে ধরা লোকায়ত জীবনের ধ্রুপদী বিন্যাস, এর Treatment [...] প্রতীকের বিস্ময়কর ব্যবহার— এই সমুদয় বিষয়কে ধারণ করে আছে এর অতুলনীয় ভাষা। বিষয়ের বহুমাত্রিক দ্যোতন হাসান আজিজুল হকের গদ্যের একটি বড় দিক, এ গল্পে সেই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'আমৃত্যু আজীবন'-এর ভাষা এবং এই গ্রন্থের অন্যান্য গল্পের ভাষা যে একই এমন নয়, এখানেও তারতম্য আছে গল্পের বিষয় এবং মেজাজ অনুযায়ী, তবু সামগ্রিকভাবে তা প্রথম গ্রন্থ থেকে ভিন্ন এবং এই গ্রন্থের অন্যান্য গল্পের অধিকতর সন্নিকটবর্তী।

আবার তৃতীয় গল্পগ্রন্থ : *জীবন ঘষে আগুন*-এর অন্তর্ভুক্ত তিনটি গল্পের ভাষা তিন রকম।

প্রথম গল্পটির নাম 'শোণিত সেতু'—এ গল্পের ভাষা এর যুধ্যমান দুটি বলশালী ষাঁড়ের ক্ষিপ্রতার মতো ঋজু এবং বেগবান। দ্বিতীয় গল্প 'খাঁচা'র ভাষা কিঞ্চিৎ আর্দ্র এবং স্পর্শকাতর। নাম গল্প 'জীবন ঘষে আগুন'-এর ভাষায় রৌদ্র ঝলসিত রাঢ়ের মতো হুতাসনময়, এবং তেমনি এর আদিম মৃত্তিকার মতোই স্তরিত জটিল কাঠিন্যের সঙ্গে রহস্যময় আলো-আঁধারির খেলা চলে।

ভাষা এবং বিন্যাস প্রকরণের এই ক্ষান্তিহীন ভাঙা গড়ার মধ্যেও হাসান আজিজুল হকের বাক্য গঠনের নিজস্ব ফর্ম, এবং অন্যান্য প্রবণতা গদ্যের কাঠামোর ভেতর ঠিকই থেকে যায়, কেননা তা লেখকের মনোভঙ্গি, স্টাইল এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকে যা একজন যথার্থ শিল্পীর আপন পরিচয়ের চিহ্নবাহী। আর হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্পের এই ভাষা ও বিন্যাস প্রকরণের ভেতরে ভেতরে চরিত্রের সংলাপ কিংবা বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে একটা চাপা কৌতুক ছড়িয়ে রাখেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটি বিষয় আমার মনে হয় তাঁর শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করে— বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্যে প্রচ্ছন্নতা পরিহার করে মাঝে মাঝে লেখকের সরাসরি বলে ফেলার লোভ। এই প্রবণতা তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ থেকে শুরু করে সর্বশেষ গ্রন্থ *জীবন ঘষে আগুন* পর্যন্ত তা ছড়িয়ে আছে। কখনো কখনো নাটকীয়তার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী বাংলাদেশের সময় এবং জীবনের পটভূমিতে রচিত গল্পাবলিতে উল্লিখিত প্রবণতা দুটি তীব্রতর হচ্ছে।

প্রকৃতি মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক সবকিছুর ডিটেলের মাধ্যমে যেমন স্থপতির মতো ধীরে ধীরে গড়ে তুলতেন, সেই ডিটেল যেন ঝরে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে পূর্বের মতো সমস্যা এবং সংকট আর চরিত্রের নিজের থাকছে না, লেখক নিজেই সেখানে প্রাধান্য নিচ্ছেন সরাসরি বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে, অনেক সময় তাও চরিত্রানুযায়ী হয় না, স্পষ্টত সেখানে লেখকের কণ্ঠস্বরই সোচ্চার। অথচ সংলাপ এবং ট্রিটমেন্টে তাঁর সেই অনন্যতা এই সব গল্পেও বিদ্যমান, হয়ত এসবই তাঁর গল্পের নতুন করে মোড় নেয়া, তবু এই সমুদয় বিষয় কেন জানি আশঙ্কিত করে, কষ্টও হয় !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে প্রথম এবং শেষ দেখেছিলাম ১৯৭৩-এর বাংলা একাডেমীর সাহিত্য সম্মেলনে।

বিরলকেশ, ধুতিপাঞ্জাবি পরা, অতি সাধারণ চেহারার ছোটখাটো শ্যামলা রঙের মানুষটি ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন। কী-কী বলেছিলেন মনে নেই।

মৃদু স্বরে, থেমে থেমে বলছিলেন, যেন কোনো লাজুক কিশোরকে তুলে দেয়া হয়েছে এমন এক দিশেহারা অসহায় ভাব ছিল তাঁর।

সেই শান্ত, ভালো মানুষ লোকটি সম্প্রতি মারা গেছেন।

তাঁর লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় স্কুল জীবনে— হঠাৎ কেমন করে যেন হাতে এসে পড়েছিল একখানা উপন্যাস : *দ্বীপপুঞ্জ*— লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। নতুন কোনো বই পেলে তখন এক নিঃশ্বাসে শেষ না করতে পারলে যেন স্বস্তি পেতাম না। মনে আছে, প্রায় সারা রাত জেগে পড়েছিলাম বইটি।

তখন সাহিত্যবোধ যত না ছিল তার চেয়ে বেশি কাহিনীর হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া।

তাছাড়া, নাইনে পড়া কিশোর পাঠকটির দেহ এবং মনে তখন নানান ভাঙাগড়া চলছে, কাজেই মঙ্গলা ও মুরলীর পরকীয়া প্রণয় ঐ বয়সী ছেলেকে রাত জাগাবে সে আর বিচিত্র কী।

এ কথায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে ছোট করা হচ্ছে না, সেদিনকার সেই মূঢ় কিশোরটির মানসিক প্রতিক্রিয়ার সত্যভাষণ করছি মাত্র। তবে হ্যাঁ, অবচেতনভাবে হলেও তার ভেতর ভালো লেখা মন্দ লেখার পার্থক্য নির্ণয়ের মোটা ধরনের একটা ধারণা ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিল বোধ করি, কেননা এত দিনেও বেশ মনে করতে পারি লেখকটিকে তার ভালো লেগেছিল সেদিন, তা শুধু কাহিনীর জন্যেই নয়, কাহিনীর মানুষগুলো নির্মাণের মুন্সিয়ানার জন্যেও।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র গল্প কিংবা উপন্যাসে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কাহিনীর মধ্যে নারী চরিত্র বিশেষ প্রাধান্য পায়। তাদের চিত্তগত জটিলতার পথ ধরেই কাহিনী এগোয়।

আমার বই
পুনরায় পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনেক পরে কোনো পত্রিকায় সম্ভবত তার জবানিতে জেনেছিলাম যে, তাঁর শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে মহিলা অধ্যুষিত পরিবেশের মধ্যে। ফলে মেয়েদেরকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান, পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের সহায়ক হয়েছে।

খুবই সত্যি কথা, তার মতো অন্তর্মুখী, অনুভূতিপ্রবণ শান্ত মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। আর, নিজের স্মৃতি অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিকে চূর্ণ চূর্ণ করে ছড়িয়ে দেয়াই তো সাহিত্য।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রর প্রধান প্রধান উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে : *দ্বীপপুঞ্জ*, *দেহমন*, *দূরভাষিণী* এবং *চেনা মহল*।

দ্বীপপুঞ্জ, *দেহমন* এবং *দূরভাষিণী*—এই তিনটি উপন্যাস একই বছরে, অর্থাৎ ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

দ্বীপপুঞ্জ সম্পূর্ণ পল্লি জীবনের কাহিনী। এই উপন্যাসের প্রধান সমস্যা মঙ্গলা তার স্বামী সুবল এবং প্রেমিক মুরলীর জটিল সম্পর্কের টানাপড়েন।

স্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষের অবৈধ সম্পর্ক আবিষ্কারে সুবলের মনোভাব, গ্রাম্য লম্পট মুরলীর ভোগবাসনায় আবিল মনোলোক, মঙ্গলার শুভবোধ ও যৌন চেতনার জটিল দ্বন্দ্ব এবং সর্বশেষে সুবলকে জড়িয়ে ধরে নদীর জলে ডুবে মরা থেকে মঙ্গলার বেঁচে ওঠার আকুতি—এই সমুদয় বিষয়কে ধীরে ধীরে গড়ে তোলাতে, যথেষ্ট নিপুণতা, সংযম এবং পরিমিতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে প্রামাণ্য জীবন এবং তাদের সম্পর্কে বৈচিত্র্য উদঘাটনও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে এবং সেই বিপর্যয়ের ঢেউয়ের ধাক্কা শুধু পাশ্চাত্যেই নয়, আমাদের নাগরিক জীবনেও যে এসে লেগেছে তার বিভিন্নমুখী চিত্র দেখতে পাই *দেহমন*, *দূরভাষিণী* এবং *চেনা মহল*-এ।

মধ্যবিত্ত বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের প্রচলিত সামাজিক, নৈতিক এবং শত সংস্কারের আবেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাওয়া upstairism-কে ধারণ করে আছে *দেহমন* উপন্যাসখানি।

রুবি নামের এক শিক্ষিতা, আধুনিকা তরুণীই এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, যে অবাধ যৌন সম্পর্কে আস্থাশীল।

প্রচলিত বাঙালি জীবনের সামাজিক দৃষ্টিতে ওপর থেকে দেখে মনে হবে রুবি দেহপোজীবিনী, কিন্তু আসলে সে তা নয়, সমাজ স্বীকৃত মধ্যবিত্ত ভদ্র জীবনেই তার অবস্থান। কিন্তু এই সংস্কার লালিত এই বলয় থেকে বেরিয়ে এসে ভোগলিপ্সু upstair জীবনে উঠে যাওয়ার এষণাই তাকে এমন বেপরোয়া করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দূরভাষিণীতে টেলিফোনে চাকরি করা মেয়েদের রুক্ষ ধূসর জীবন এবং হৃদয়চর্চা— এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব স্থান পেয়েছে। এ কাহিনী টেলিফোনে কাজ করা মেয়ে না হয়ে অন্য যে কোনো বুদ্ধিজীবী মেয়েদের কাহিনী হতে পারত। আসলে, দারিদ্র্যের পীড়নে ছিটকে বেরিয়ে এসব মেয়েদের যান্ত্রিক কর্তব্য পালন করতে করতে যাদের স্বাভাবিক সৌকুমার্য এবং আবেগের সরলতা শুষ্ক হয়ে যায় অথচ তাদের বঞ্চিত জীবনে প্রেমের জন্যে প্রবল আকুলতা থাকে— এই দ্বিমুখী মানসিকতার জন্যে তাদের জীবনে যে ব্যর্থতা নেমে আসে নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই নিষ্ঠুর ট্র্যাজেটিকে উদ্‌ঘাটন করেছেন এ উপন্যাসে।

চেনা মহল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা। এ উপন্যাস আমাদের ক্ষয়িষ্ণু একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের অসামান্য দলিল।

অর্থনৈতিক সংঘাতে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন কেমন করে ভেঙে যাচ্ছে অতিশয় নিপুণভাবে তা এঁকেছেন এ উপন্যাসে।

চেনা মহলে মানসিক সংঘাতের চিত্র আছে সত্য, কিন্তু তা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বলয়ে আটকে পড়ার মতোই চিরন্তন বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের সংস্কার ভেঙে বেরিয়ে আসার সাহসহীনতারই ছবি।

আলোচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, প্রত্যেকটি উপন্যাসে তিনি (নরেন্দ্রনাথ মিত্র), পুনরাবৃত্তি না করে, নতুনভাবে, ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের এক একটি দিকের ওপর আলো ফেলেছেন।

এক *দ্বীপপুঞ্জ* বাদ দিলে, বাকি উপন্যাস তিনটিতে তিনি পরিবর্তমান সময়ের ভিন্নমুখী চেহারাকে যথাযথ বিশ্বস্ততার সঙ্গে ধরে রাখতে চেয়েছেন এবং এসব একজন সৎ এবং সক্ষম শিল্পীরই পরিচয়বাহী।

তাঁর রচনায় আঙ্গিকের আধুনিক জটিলতা হয়ত নেই এবং তা খুঁজতে যাওয়াও মূঢ়তা, কেননা তাঁর attitude-এর মধ্যে তা নেই, আঙ্গিকের জটিলতা নয়, চরিত্রের মানসিক জটিলতার গহন অন্ধকারকে উদ্‌ভাসিত করে তোলাতেই তাঁর ঝোঁক, ভাষা তাঁর আটপৌরে, সেই আটপৌরে ভাষায় তিনি গভীরতা সঞ্চারী।

তাঁর ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'রস' 'ঘাম' ইত্যাদি বহু গল্প বাংলা সাহিত্যে চিরায়ত সম্পদ হয়ে থাকবে।

অতিপ্রজ এই লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, ফলে তার ছোটগল্প সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ মাত্র করলাম। তাছাড়া এ আলোচনা নরেন্দ্রনাথ মিত্রর সাহিত্যিক মূল্যায়ন নয়, এ হলো একদার সেই কিশোর পাঠকটির সেদিনকার ভালোবাসার এবং পরবর্তী পরিণত যুবার মুগ্ধচিত্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিকৃতি আত্মপ্রতিকৃতি

সেই ষাট দশক— যৌবরাজ্যে প্রবেশের প্রথম শিহরণে মন তখন সদা উন্মুখ— বড় উত্তেজনা, বড়ই বিস্ময় আর সুখের সময় ছিল সেটা। চটি চটি সব পত্রিকা বেরুচ্ছে, আর কী সব লেখা মাথার ভেতর গিয়ে যেন ধাক্কা মারে

এই দশ পনেরো বছরে অনেক তরুণ আমার সেই বয়সে হাঁটছে, কিন্তু এখানকার সাহিত্যের ক্রান্তিকালের সেই উন্মাদনার প্রথম উত্তাপটাকে এরা জানেন— অনুভবে আনতে পারবে না এরা : হুমায়ুন চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, সেবাব্রত চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, শহীদুর রহমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, আফজাল চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, আসাদ চৌধুরী প্রমুখ জনের রচনার প্রথম স্বাদ পাওয়া একজন নব্য তরুণের আনন্দ বেদনা বিস্ময়ের সুখকে।

সমকাল উত্তরণ পূর্বমেঘ তো ছিলই *সপ্তক, স্বাক্ষর, সাম্প্রতিক, কণ্ঠস্বর, কালবেলা*— কোনো কোনোটি এরা চোখেও দেখেনি।

হয়ত এদের অনেকেই জানে না; তিন ফর্মার চটি একটি পত্রিকা *কালবেলা*— যার তিনটি মাত্র সংখ্যা বেরিয়ে ছিল পিজ বোর্ডের নীল মলাট লাগানো তৃতীয় সংখ্যাটিতে প্রকাশিত হয়েছিল হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজ ও একটি করবী গাছ'। গল্পটি শুধু আমার মতো একজন তরুণের মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টি কাড়া নয়, হাসান আজিজুল হকেরও সাহিত্যিক মোড় নেয়া *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য* পেরিয়ে ভাষা ট্রিটমেন্ট ফর্ম সবদিক দিয়েই আজকের হাসান আজিজুল হক এই গল্পের মাধ্যমেই পেরিয়ে এসেছিলেন সেদিন সেই ১৯৬৭-তে।

এসব শুধুমাত্র তথ্যের জন্যে নয় উল্লেখ করছি এই জন্যে যে কালবেলা আজ আর নেই। তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। *স্বাক্ষর, সপ্তক* নেই, *উত্তরণের* সর্বশেষ সংখ্যাটির জন্যে এখনো রোমাঞ্চিত হই।

এরাঁ বিপুল জন-মনোতোষ করেনি, বৃহৎ পাঠক সাধারণের দৃষ্টির বাইরে এদের প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটেছে। কিন্তু নিঃশব্দে আপন কাজটি করে চলে গেছে। প্রায় নেপথ্যে থেকে সাহিত্যের ওয়েদার কর্কটির মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে গেছে। উল্লেখ সে কারণেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশ্য এর মানে এই নয় যে, এই পত্রিকার সব রচনাই উত্তীর্ণ বা দারুণ একটা কিছু। বহু লেখাই এখন আর আমার ভালো লাগবে না, তবু সেদিনকার সেই সব নব্য লেখকের তাজা জ্বলজ্বলে বেগবান প্রবাহ, তাকে অস্বীকার করি কেমন করে। এদের অনেকেরই বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ধিক্কার উঠেছিল সেদিন। চিরকালই উঠে থাকে। এর মধ্যে থেকে যাঁরা টিকে থাকেন, তাঁরাই জয়ী হন।

মাঠ একদিন তাদের দখলেই আসে। তখন বোঝা যায়, সেদিনের নিন্দা ছিল বস্তুত শক্তিমানকে প্রাণপণ অস্বীকারের অক্ষম চিৎকার।

এমন এক একটা সময় আসে শিল্প সাহিত্য যখন প্রচলিত, প্রথাগত বাঁধা সড়ক চলতে আর মন চায় না। ঘাড় বাঁকানো জেদি ঘোড়ার মতো ভেতরে ভেতরে পা ঠোঁকে।

কখনো কোনো পরাক্রান্ত একক ব্যক্তিত্বের হাতে, কখনো একদল মানুষের সম্মিলিত সাধনায় পাস বদলের পতাকা ওড়ে।

এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যেই থাকে কেন সমবায়ী ব্যাপার নয়—একক সাধনাই—তবু সমসাময়িক এদের মধ্যে কোথাও না কোথাও ঐক্য থাকে, সে ঐক্য কখনো কোনো বিশেষ মতাদর্শকে কেন্দ্র করে, কখনো বিষয়কে নতুনভাবে দেখা এবং উপস্থাপনের তাগিদ থেকে।

এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে থাকে নতুনভাবে নতুন চোখে দেখা এবং দেখানোর অন্তর্লীন আর্তি এভাবেই শিল্পীয় মননগত রাখা বাঁধা হয়ে যায় পরস্পরের হাতে। রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত—সমসাময়িক, এদের সাহিত্যিক মনোভঙ্গি বিষয়কে উপলব্ধি এবং উপস্থাপনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য তবু পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তুলনার সময়ে এদের আমরা একই কালের বেদনা এবং হর্ষের দোসর হিসেবে দেখি না কি ?

এঁরা সবাই-ই এখন প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর পাঠক সমাজে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা পত্রিকার ফসল এরা, এ কথা বলব না, কিন্তু একথা তো ঠিক যে সেসব ক্ষীণদেহী স্বল্পায়ু পত্র-পত্রিকা প্রথম এদের কোল দিয়েছিল, এদের স্পর্ধাকে তুলে ধরেছিল একদিন, যাকে আমরা লিটল ম্যাগাজিন বলি, যে মন যোগাবার জন্যে আসে না, আসে মন জাগাতে, ওইসব পত্রিকা ছিল সেই গৌত্রের। আজ তারা নেই, তাদের জায়গাও পূরণ হচ্ছে না, অথচ প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে এমনি সব পত্রিকার। কেননা কেমন এক প্রবল ক্ষয়রোগ চারপাশে, বিশেষ করে গদ্যের রাশি রাশি রাবিশ জিনিসের জঞ্জালে ভরে যাচ্ছে।

দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক সাহিত্যের পাতাগুলোর জঠরাগ্নি নিবৃত্তির জন্যে যা যোগান চলছে তা যেন ভাসা হাটে কানা বেগুনের মতো।

আমার বাংলা বই
আমার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনেক তো ধান ভানা হলো, ষাটের সেদিনকার তরুণদের পর এই ক' বছরের আরো অনেক নতুন মুখ এসেছেন এতদিনে। তাদের মধ্যে থেকে অন্তত নিদেন পক্ষে দু-চারজন গদ্যকারকেও কি প্রত্যাশা করতে পারি না, যাদেরকে সময় বিশেষভাবে, বিশিষ্ট করে উপবীত পরিয়ে দেবে ? ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, তাৎক্ষণিক প্রশংসার লোভকে একজন নব্য লেখকের পক্ষে জয় করে গভীর বিশ্বস্ত, দুঃসাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করতে পারে একমাত্র আপসহীন, সুসম্পাদিত স্থির লক্ষ্য একটি লিটল ম্যাগাজিন।

আর এই ধরনের পত্রিকা প্রয়োজন, একটি নয় একাধিক। যাদের পাখার ঝপটে যা জঞ্জাল, যা অপ্রয়োজনীয়, উড়ে যাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন আশার আসমানদারী

এমন অনেক মানুষ আছেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক দিয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে সমাজে স্বীকৃত এবং সম্মানিত—যাঁরা সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে সচেতন নন।

দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাহিত্যের জন্যে পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকে, সেখানে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা নানা ধরনের রচনা ছাপা হয়।

কবিতার ব্যাপারে বিভ্রাট হয় না। এই সব 'শিক্ষিতজন' কবিতা রচয়িতাকে কবি হিসেবেই দেখেন, কিন্তু গদ্য লেখককে নিয়েই তাদের বিভ্রান্তি বা উদাসীন অজ্ঞতা। যেহেতু পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকগণ গদ্যেই লেখেন এবং সাহিত্যিকের রচনা ঐসব পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় এবং তাঁর মাধ্যমও গদ্য, অতএব সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য ঐসব 'শিক্ষিত' জনের কাছে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

এ ধরনের 'শিক্ষিত' ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে কোনো লেখককে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলেন, ইনি একজন সাংবাদিক। যিনি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর চোখ মুখে গর্বের ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে এই ভেবে যে, তিনি একজন সাংবাদিকের পরিচিত বা ঘনিষ্ঠজন সেই সুবাদে অন্যের কাছে তাঁর গুরুত্ব বাড়ছে এবং যিনি পরিচিত হচ্ছেন সসম্ভ্রমে হাত বাড়িয়ে দেন যে তিনি একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন।

আমার এক অগ্রজ লেখক বন্ধুকে এমনি এক শিক্ষিত বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন তাঁর (বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোকের) কাজে ঘোরাফেরা করতে হয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি লেখকের পিতৃবন্ধু। লেখক পেশায় অধ্যাপক, কিন্তু যেখানেই লেখকের সেই পিতৃবন্ধু তাঁকে নিয়ে গেছেন সেখানেই সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে থাকায় একদিন লেখক অতিষ্ঠ হয়ে গিয়ে তাঁকে বলেন, আমি সাংবাদিক নই, লেখক। পিতৃবন্ধু অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, 'ওই একই হলো।'

আধুনিক যুগে সাংবাদ মাধ্যমের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই, এবং এই মাধ্যমের সঙ্গে যাঁরা জড়িত মানুষের চোখে তাঁরা মহাশক্তিধর ব্যক্তি। লেখকের

আমার বই
পুরানো পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পিতৃবন্ধু লেখক এবং সাংবাদিক তুল্যমূল্য জ্ঞান করলেও একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, সাংবাদিক পরিচয় দিলে যে তাঁর গুরুত্ব বাড়বে এবং তাঁর প্রয়োজনীয় কাজটি অন্যের কাছে গুরুত্বের কাছে বিবেচিত হবে এ ব্যাপারে তিনি সচেতন।

এই সব কথার মধ্য দিয়ে সমাজে লেখকের সামাজিক অবস্থানের স্তর বিষয়ক কোনো আক্ষেপ প্রকাশ করছি না। আমার উদ্দেশ্য সাহিত্যিক এবং সাংবাদিককে এক করে দেখার ব্যাপারটার পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংবাদিকতা বিষয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করা।

একটা আশঙ্কা প্রকট হয়ে উঠেছে যে, সাহিত্য কি ক্রমে সাংবাদিকতার আত্ম-অহঙ্কার হারাচ্ছে ?

লিখিত সাহিত্য এক সময় উচ্চবিত্ত শিক্ষিত জনের মানস বিলাসের উপায় ছিল। তার ভাষা, তার উপস্থাপন ভঙ্গিমা সব দিক দিয়েই কুলীনকুলসর্বস্ব ছিল। তারপর একসময় যখন 'গণে'র জোয়ার প্রবল হয়ে উঠল সমাজে, তখন দাবি উঠল সাহিত্যের ভাষাকে মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। যারা 'গণে'র মুখের ভাষার কাছাকাছি সাহিত্যকে আনতে চেয়েছিলেন তাঁরা সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখেছেন, সাংবাদিকতার সঙ্গে একাকার করতে চাননি।

বুদ্ধদেব বসু একদা বলেছিলেন, সাংবাদিকতা সাহিত্যের শত্রু। একথার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সাংবাদিকতা পেশাটি একজন সৃষ্টিশীল লেখকের রচনার জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

যদিও পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা লেখক সরাসরি সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন—যেমন হেমিংওয়ে, মার্কেজ, আলবেয়ার কাম্যু ; এঁরা অবশ্য জীবনের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে সাংবাদিকতা করেছেন, সারা জীবন নয় এবং এঁদের লেখক সত্তার ওপর প্রবল স্বায়ত্তশাসন ছিল বলে এই পেশা বরং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতায় তাঁদের মননকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা সাহিত্যেরও বহু লেখকের জীবন সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু হয়েছে, অনেকে আমৃত্যু এ পেশায় নিযুক্ত থেকে সাহিত্য রচনা করে গেছেন।

তবে দিনে দিনে বাংলা সাহিত্য যে সাংবাদিকতা হয়ে উঠেছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, আশঙ্কা সে কারণেই।

সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যিকের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে অসচেতন যে 'শিক্ষিত' জনের এ রচনার শুরুতে উল্লেখ করেছি বর্তমান কালের অনেক লেখকই তেমনি নিজেই লেখক—অহঙ্কার বিস্মৃত হয়ে গিয়ে সাহিত্যের নামে সাংবাদিকতা করছেন এবং তার চেয়ে লক্ষণীয় যে, এ ধরনের সাহিত্যের অনেক লেখক আছেন যাঁরা সাংবাদিকতার সঙ্গে মোটেও জড়িত নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে আনা যেমন সাংবাদিকতা নয়, তেমনি সাহিত্য এবং সাংবাদিকতাও এক জিনিস নয়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একটি চিঠির উদ্ধৃতি ব্যবহার করছি। চিঠিটি তিনি ১৯৬৯ সালে প্যারিস থেকে শওকত ওসমানকে লিখেছিলেন। সেই চিঠি সৈয়দ আবুল মকসুদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *জীবন ও সাহিত্য* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে চিঠিপত্র অংশে মুদ্রিত।

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদো* এবং *চাঁদের অমাবশ্যা* উপন্যাসের সমালোচনা করেন। সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ শওকত ওসমানকে লেখা ঐ চিঠির একাংশে লেখেন, 'চিঠিটা লিখছি ধন্যবাদ (শব্দটা বড়ই বিদঘুটে) জানাবার জন্যে। আবুল ফজলের সমালোচনা পাঠিয়েছ বলে। আমি বিদেশে বলে সবাই আমাকে ইঙ্গিতে একটা খোঁচা না দিয়ে পারেন না। উনি বলেছেন দশ-বারো বছরে দেশে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে যার খবর আমি রাখি না। শুনে বড় খুশি হলাম, কারণ দেশের পরিবর্তন হয়েছে তা সুখবর বইকি। তবে কোন্ কোন পরিবর্তন হয়েছে তা জানতে পারলে জ্ঞান-বৃদ্ধি হতো, লেখাও সমসাময়িক হতো। তিনি আরো লিখেছেন, মুহাম্মদ মুস্তফার মতো লেখকেরা কখনো আত্মহত্যা করে না। এ কথাও নিতান্ত খাঁটি। তবে সেই জন্যেই তো আমার মুহাম্মদ মুস্তফা আত্মহত্যা করেছে। দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষকও সব জানে না করে না যা *চাঁদের অমাবশ্যার* যুবক শিক্ষকটি ভেবেছে বা করেছে, আমার ইচ্ছা সাংবাদিক কাগজের রিপোর্টারের ঊর্ধ্বে ওঠা। কিন্তু তোমরা যেন চাও সাহিত্যিক রিপোর্টার হয়েই থাকুক। সেটি হবে না। তা হলে কষ্ট করে লেখার প্রয়োজন কী ? মনের কোণে লুকানো আশা বা স্বপ্নের (সে সবের দাম যা-ই হোক) কথা, কিছু প্রকাশ না করলে চলে কী করে ?'

চিঠির উদ্ধৃতাংশটিতে অনেকগুলো মাত্রা আছে, তবে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নির্ণয়ে এত সংক্ষেপে এমন গভীর নিপুণ লক্ষ্যভেদী বিশ্লেষণ আমার চোখে আর পড়েনি।

স্মর্তব্য যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এক পর্যায়ে বেশ কিছুকাল সাংবাদিকতায় নিযুক্ত ছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিল্পের দাবি, শিল্পীর দায়

লেখকের দায়বদ্ধতা বা দায়বদ্ধ লেখক কথাটি খুব স্পষ্ট নয়, কেননা এর বহু মাত্রা আছে।

তিরিশের দশকের মধ্য পর্বে পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের করাল ছায়া ঘনিয়ে আসতে থাকে। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর উত্থান, ইতালির মুসোলিনি ও জার্মানির হিটলারের দাঁত ঘসটানির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষ এক প্রবল পরাক্রান্ত ভয়াল দানবিক রূপকে প্রত্যক্ষ করে, যার নাম ফ্যাসিবাদ।

দেশে দেশে মানুষ এই দানব ফ্যাসিবাদকে রুখে দাঁড়াবার জন্যে জোট বাঁধতে থাকে। স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সালে ফ্রাঙ্কোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ যখন আক্রমণ চালায় তখন স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের আহ্বানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল মানুষ স্পেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন, গড়ে তুললেন, 'আন্তর্জাতিক বিগ্রেড'।

এই আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছিলেন পৃথিবীর বহু সেরা বুদ্ধিজীবী-লেখক। ফ্যাসিবাদকে রুখতে গিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে স্পেনের মাটিতে প্রাণ দিয়েছেন ক্রিস্টোফার কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স প্রমুখ লেখক।

পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে স্পেনের পপুলার ফ্রন্টের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদের এই আক্রমণ বস্তুত আসন্ন মহাযুদ্ধের স্টেজ রিহার্সাল।

মানবতাবিরোধী এই অন্ধ দানবিক শক্তির বিরুদ্ধে রোমাঁ রলাঁ থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীকে হুঁশিয়ার করেছেন। বারবার, প্রবল ধিক্কার দিয়েছেন এই বর্বর মূঢ়কে। কিন্তু ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের ওপর হিটলারের আক্রমণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় মহাসমর।

ফ্যাসিবাদের উত্থানের পর থেকে শিল্প সাহিত্যে লেখক শিল্পীর দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি সামনে চলে আসে।

ফ্যাসিবাদ মানব সভ্যতার সাধারণ শত্রু, অতএব একে রোখা জরুরি— এই ভিত্তিতে ধনতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী উভয় শিবিরই সেদিন এক কাতারে দাঁড়িয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু লেখক শিল্পীর দায়বদ্ধতা শেষপর্যন্ত শুধু ফ্যাসিবাদকে রোখাই নয়, সমষ্টির আর্থ-সামাজিক মুক্তির সঙ্গে তা একাকার হয়ে যেতে থাকে। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ক্রমে রূপান্তিত হয় প্রগতি লেখক সংঘে। সাম্যবাদী রাজনৈতিক চিন্তা প্রসূত মাত্রাটি প্রাধান্য পেতে থাকলে প্রচলিত সাধারণ মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একাত্ম হয়েছিলেন তাঁরা এই সংঘ থেকে সরে দাঁড়ান।

সেই থেকে লেখকের দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি আমাদের কাছে উঠে আসে মার্কসবাদের সঙ্গে সংলগ্নতার মাধ্যমে।

আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যত্রও এ ধরনের চিন্তাই লক্ষ করা যায়। কিন্তু তার পাশাপাশি ইয়োরোপে আর এক নতুন দর্শন নিয়ে হাজির হন ফরাসি লেখক জাঁ পল সার্ত্র। জার্মান বন্দি শিবিরে থাকাকালে তিনি এই চিন্তাসূত্রটি লাভ করেন। সেই চিন্তাসূত্রটিকে আপন কালের যন্ত্রণা এবং নিজের জীবনের উপলব্ধির মাধ্যমে ব্যাপ্তি এবং গভীরতা দিয়ে নিজস্ব এক দর্শনের জন্ম দেন।

অস্তিত্ববাদী সার্ত্র বলেন, ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে ব্যক্তি কেবল তার নিজের কাছেই দায়বদ্ধ, অন্য কারুর কাছে নয়— তার সত্তা স্বাধীন। ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার স্বাধীন সত্তারই প্রকাশ।

ইয়োরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজের যুদ্ধবিধ্বস্ত বিপণ্ন মানুষের কাছে এ দর্শন ব্যাপকভাবে আদৃত হয়।

গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর সেই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি জীবনের নানান সাহসী ভূমিকার মাধ্যমে সারা বিশ্বে তিনি পরিচিতি লাভ করেন দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে।

বিশ্ব মানবতার বিভিন্ন সংকটে ও বিপন্নতায় কথায় ও কাজে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষ হিসেবে এবং লেখক হিসেবে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন দায়িত্ববোধের তাগিদ থেকে সে তো সারা বিশ্বের লেখক শিল্পী তথা গোটা মানব সমাজের কাছে সর্বকালের দায়বদ্ধতার সশ্রদ্ধ উদাহরণ হয়ে থাকবে।

সার্ত্র মার্কসবাদী ছিলেন না— সার্ত্রের দর্শনকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের চরম প্রকাশ বলে নিন্দা করেই কি তাকে নাকচ করা যায় ? ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণের যে প্রবল তাগিদের কথা বলা হয়েছে তাকে অস্বীকার করা যাবে কীভাবে ?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় এবং বিভিন্ন সময়ে স্বদেশের নানান সংকটে বিপন্নতায় সক্রিয়ভাবে যে রকম সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন তা দেশের অনেক বড় রাজনীতিবিদ নেতাও করেননি। তাঁর আন্তর্জাতিক ভূমিকা বাদ দিলেও দেশবাসীর একজন হয়ে তাঁর এই দায় পালনকে কি একজন সামন্তবাদী চেতনা-পালনকারী বুর্জোয়া ভাববাদী কবির ভাব বিলাস বলে নাকচ করে দেয়া যায় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চল্লিশ দশকে এমন চেষ্টা হয়েছিল, শুধু তাঁর দায়বদ্ধতা নয়, গোটা রবীন্দ্রসাহিত্যকেই প্রতিক্রিয়াশীল বলে নাকচ করার কথা তুলে ছিলেন প্রগতি শিবিরের একাংশ, সে প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐ শিবিরেরই অন্যান্য প্রতিবাদ করেছিলেন প্রবলভাবে।

কিন্তু এ কথাও সত্যি, সম্পূর্ণ নাকচের কথা না বললেও, এখনো সেই ঝোঁকটি একেবারে অবসিতও হয়নি।

শিল্প সাহিত্যে 'আধুনিক' ও 'প্রগতিশীল' এই দুটি শব্দ বহুকাল ধরে চলে আসছে, বিশেষত বাংলা সাহিত্যে এই দুটি শব্দ প্রায় পরস্পর বৈরী হিসেবে বিবেচিত।

আধুনিকতার মূল ভিত্তিই হলো যুক্তি : এই যুক্তিই একদিন মধ্য যুগের প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণের অন্ধত্ব ঘুচিয়ে মানবচৈতন্যকে স্থিতাবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নশীল, নিরন্তর জিজ্ঞাসা এবং আত্মতৃপ্তির আলস্য বিলাস থেকে টেনে তুলে কঠিন মাটিতে দুপায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে তাকে দিয়েছিলেন ঐতিহ্য অবগাহনের অবাধ স্বাধীনতাও।

যার ওপর দাঁড়িয়ে একদিন কার্ল মার্কস সর্ববিধ শোষণের বিরুদ্ধে কামান দেগেছিলেন। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর aesthetically badly trained প্রগতিবাদী আধুনিকতার সেই নির্যাসকে না বুঝে প্রগতিশীলতাকে দাঁড় করিয়েছেন তার বৈরী হিসেবে।

আধুনিক ও প্রগতি শব্দ দুটি এক সময়, এমনকি আমাদের দেশেও সমার্থক বিবেচিত হতো। (বিশের দশকে ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *প্রগতি* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল যা ছিল একান্তভাবেই রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যান্দোলনের বাহন। *প্রগতি* নামটি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন 'আধুনিক' এর বিকল্প হিসেবেই।) কালে তা রাজনৈতিকতায় অনুলিপ্ত হয়ে পড়ে, এই অনুলিপ্তিরও এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে যে জটিল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই গড়ে তুলেছিল, কালে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোই হয়ে দাঁড়াল তার আত্মবিকাশের পথে বাধা। এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দানবিক রূপটি বিশাল হতে হতে শোষণে পীড়নে ব্যক্তি তথা সমাজের অন্তর বাহিরকে শূন্য, রিক্ত, ধূসর এবং বিভিক্ত করে ফেলতে থাকে।

'আধুনিকতা' রেনেসাঁসের সমস্ত ইতিবাচকতা হারিয়ে হয়ে উঠল এই যন্ত্রণা কাতর বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তহীন দায়টানা ক্লান্ত অশ্ব।

১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর থেকে এই ক্ষয়গ্রস্ত মুমূর্ষু ব্যক্তি তার মুক্তির নিশানা দেখতে পেল সমষ্টির মুক্তির মধ্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশের দশকে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা, সারা বিশ্বে ঔপনিবেশিক শাসন শৃঙ্খলা চূর্ণ করার অপরাজেয় উদ্যত হাত এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ক্রমপ্রসারিত জোয়ারের মুখে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপন্ন জরাগ্রস্ত রূপটি প্রকট হয়ে ওঠে।

'প্রগতিশীল' ক্রমে হয়ে ওঠে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা সঞ্জাত 'আধুনিকতা'র প্রতিস্পর্ধী। যুদ্ধ, রাষ্ট্র বিপ্লব বা সামাজিক পরিবর্তনের পর যে বিষয়টি লক্ষ করা যায় তাহলো পুরনো মূল্যবোধের বিপর্যয়, এই বিপর্যস্ত ধ্বংসস্তূপকে সরিয়ে সেখানে যদি সাবলীল কোনো ইতিবাচক মূল্যবোধ গড়ে তোলা না যায় তাহলে যেমন দেখা যায় মারাত্মক নৈরাজ্য, প্রগতিশীল শিল্প সাহিত্য আধুনিকতার প্রতিস্পর্ধী হতে গিয়ে সেই অবস্থায় পড়ে।

মার্কসবাদের সবচেয়ে জোরালো হাতিয়ার দ্বান্দ্বিকতা ; জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুকে যেখানে দ্বান্দ্বিকতার নিরিখে বিচার করাই মার্কসবাদ সম্মত সেখানে লক্ষ করা যায় রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অর্থনৈতিক— তাবৎ বিষয়ের ক্ষেত্রে এই পথ অনুসরণ করা হলেও শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় পারম্পর্যহীন এক উদ্ভট যান্ত্রিকতা।

দ্বান্দ্বিকতার পারম্পর্যময় বন্ধুর ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে যেমন রেনেসাঁস উত্তর ধনতন্ত্র ও আধুনিকতা, তেমনি সেই ধনতন্ত্র ও আধুনিকতার সুফলগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে মার্কস-লেনিন অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া।

ধনতন্ত্রের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজসৃষ্ট আধুনিক শিল্প সাহিত্যও ক্ষয়গ্রস্ত হবে এ যেমন সত্য তেমনি তাকে অতিক্রম করতে হলে তার সমস্ত কলাকৌশল ও সুফলগুলোকে আত্মস্থ করেই তাকে এগোতে হবে। এও দ্বান্দ্বিকতারই শিক্ষা। তত্ত্ব যতক্ষণ চেতনায় অভিসিক্ত হয়ে ফলিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হবে ততক্ষণ তা তত্ত্বই থেকে যাবে।

মার্কসবাদ একটি সৃজনশীল দর্শন, এই সামাজিক তথা রাজনৈতিক দর্শন সঞ্জাত চেতনাকে শিল্প সাহিত্যের মতো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল মাধ্যমের সঙ্গে মিশিয়ে রসমূর্তি গড়তে গেলে এই মাধ্যমের হাজার হাজার বছরের ধারাবাহিক পারম্পর্য বিষয়ে সতর্ক ও শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রয়োজন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় না বলেই আধুনিকতার প্রতিস্পর্ধী এই নতুন সাহিত্য নানা বিভ্রান্তিতে আজো ঘুরপাক খাচ্ছে।

লেনিন একদা যে মস্কোর কমসোমল যুব কর্মীদের কাছে কমিউনিস্ট কবি ভ্লাদিমির মায়কোভস্কির চেয়ে অকমিউনিস্ট আলেকজান্দার পুশকিনের কবিতার প্রতি তাঁর অধিকতর পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন, কিংবা কার্ল মার্কস তাঁর সমকালীন সমাজতন্ত্রী কবিদের চেয়ে ইসকিলাস, দান্তে, শেক্সপিয়ার, গ্যেটে এবং তাঁর বন্ধু স্থানীয় হাইনরিখ হাইনের কবিতার অনুরাগী ছিলেন অনেক বেশি

~ www.amarboi.com ~

পরিমাণে, রাজতন্ত্রী বালজাক ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। এসবের কারণ কী ? কারণ, মার্কস ও লেনিন এঁদের মধ্যে দেখেছিলেন মানব প্রগতির সৃজনশীল নির্যাসকে যার নাম শিল্প ; যে হয়ে ওঠে, যাকে জোর করে হওয়ানো যায় না।

এই হয়ে ওঠা শিল্পের দাবিকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের চেয়ে অধিকতর মূল্য দিয়েছিলেন বলেই ব্যক্তি বালজাকের প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী চিন্তাকে পরাস্ত করে লেখক বালজাক ও তাঁর সাহিত্য অমর হয়ে আছে, একই কারণে বিপ্লব বিরোধী, প্রতিরোধ বিরোধী, ধর্ম প্রচারক টলস্টয়কে ছাপিয়ে তাঁর সাহিত্য হয়ে ওঠে লেনিনের ভাষায় : 'রুশ বিপ্লবে দর্পণ', গান্ধীবাদী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে বেরিয়ে আসে ভেঙেপড়া সমাজতন্ত্রের [? সামন্ততন্ত্র] সঙ্গে নব্য ধনিকতন্ত্রের দ্বন্দ্বমুখর রূপচিত্র।

দুর্ভাগ্যের বিষয় মার্কস বা লেনিন সমাজ ও রাজনীতির মতো শিল্প সাহিত্যের নান্দনিক দিকটিকে যথেষ্ট খোলাসা করে যাননি। ফলে মার্কসবাদী বা প্রগতিশীলদের হাতে থাকে মার্কস লেনিন প্রবর্তিত রাজনৈতিক তত্ত্বটি। শিল্প সাহিত্যের ওপর এই তত্ত্বটিকে সরাসরি প্রয়োগের ইচ্ছা থেকে একটি ছাঁচ তারা নির্মাণ করেছেন, সৌন্দর্য সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত বলে যে ছাঁচটি তাদের নিজেদের কাছেই খুব স্পষ্ট নয়, সে কারণে স্বগোত্রীয় লেখক শিল্পীকেও কখনো কখনো এক কথায় প্রতিক্রিয়াশীল বলে নাকচ করার উগ্রতা লক্ষ করা গেছে।

প্রয়াত ওস্তাদ গুল মোহাম্মদের একটি সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম বহুকাল আগে, হুবহু লাইন মনে করতে পারব না, মোদ্দা কথাটি হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন, উচ্চাঙ্গ সংগীতের গায়কদের মধ্যে তিনিই সার্থক যিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের ব্যাকরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ শ্রোতাকেও তাঁর গানে মুগ্ধ করতে পারেন।

তত্ত্ব যত অভ্রান্তই হোক শিল্প সৃষ্টির নিয়মের অধীনতা তাঁকে মাথা পেতে নিতে হবেই। শিল্প সৃষ্টি মানেই সৌন্দর্য সৃষ্টি, সৌন্দর্য সৃষ্টির নিয়ম জানার গণ্ডি ছাড়ানো— 'হোথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।' আরো স্পষ্ট করে বললে, বলতে হয়, 'সাহিত্য সৃষ্টির ধারা আর তত্ত্বের ধারা এক জিনিস নয় বলেই শিল্পীর মনের চূড়ান্ত যন্ত্রণা অবিশ্রান্তভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে চায়।'

(বলাই বাহুল্য, সাহিত্য বলতে এখানে তাবৎ শিল্পকলাকেই বোঝানো হচ্ছে)।

এও দ্বান্দ্বিকতা। এই দ্বান্দ্বিকতা যেমন সমাজ, ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি শিল্প সাহিত্য ও তার স্রষ্টার ক্ষেত্রেও সত্য।

শিল্প সাহিত্যের স্রষ্টার কাজ যে জীবন তিনি যাপন করছেন লক্ষ কোটি মানুষের সঙ্গে, তাকে অর্থময় করে তোলা বহির্জাগতিক ও আন্তর্জাগতিক দ্বান্দ্বিকতায় স্রষ্টার ব্যক্তিসত্তা যেভাবে বিকশিত হতে থাকে তিনি সেভাবেই সাড়া দেন, তাঁর দায়বদ্ধতা সেই নিরিখেই বিচার্য। কোনো ক্যাটাগরির নির্দিষ্টতার ভিত্তিতে নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘূর্ণির টান ও নিরাবেগ বোঝাপড়া

লেখক শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক সময়ে তুমুল আলোড়ন হয়েছিল আমাদের দেশে।

এখানে দৃষ্টিভঙ্গি বলতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হচ্ছে—বিশেষত চল্লিশের দশকে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন এই রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই তার ধাক্কা লাগে।

ইদানীং শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আবার নতুন করে প্রসঙ্গটি আসছে। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে কারো কারো মুখে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে শেষ করেছেন আমাদের সাহিত্য—বিশেষত কথাসাহিত্য, সেখান থেকে শুরু করতে হবে। ব্যাপারটি যেন রিলে রেসের মতো—একজনের হাত থেকে নিয়ে দৌড় দেয়া।

এভাবে আর যাই হোক শিল্পী-সাহিত্য হয় না, প্রতিটি লেখককে শুরু থেকেই শুরু করতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল।

হ্যাঁ, একথা সত্যি, একশোবার স্বীকার্য যে, একজন লেখককে (জনমনতোষী বাণিজ্যবুদ্ধিসর্বস্বদের কথা আলাদা) এ যুগে মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়েই কলম চালনা করতে হবে।

কিন্তু তার জন্যে লেখককে নিজের পথ নিজেকেই নির্মাণ করে নিতে হয়। চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করলেই যে তিনি সেই আদর্শ অনুযায়ী গড় গড় করে সৃষ্টি করে ফেলবেন, তা হয় না। এ ধরনের রচনা তাৎক্ষণিক আবেগ-সঞ্জাত, মোটা দাগে অতি সরলীকরণ, যান্ত্রিক, ইচ্ছাপূরণ মাত্র। ভেতরে তার মস্ত ফাঁকি থেকে যায়।

গোটা বিষয়টাই গড়ে ওঠার ব্যাপার, হয়ে ওঠার ব্যাপার।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি মনে করি যে, অধিকাংশ লেখক শিল্পীরই মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম এবং মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ মিশে থাকে তাঁর অস্তিত্বে, চেতনায়। আমাদের দেশের মধ্যবিত্তের উদ্ভব এবং বিকাশ হয়েছে খারাপভাবে। একটি ঔপনিবেশিক শক্তির ছত্রছায়ায়। তারই পায়রবি [?] করে যার বিকাশ, যে নিজের দেশ এবং তার মাটি ও সেই সুবৃহৎ মৃত্তিকা-নির্ভর

সুন্দরবার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোষ্ঠী— যার সঙ্গে তার হাজার হাজার বছর ধরে রক্তের সম্বন্ধ, আপন দর্পিত অহঙ্কারে দিনে দিনে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিদেশি শোষকের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। এমনকি পররাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির বরকন্দাজ হয়ে স্বদেশবাসী কোটি কোটি কৃষকের মাথায় লাটি ভাঙতেও কসুর করেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সেই বদ-রক্তের পরম্পরাগত ধারা তার (মধ্যবিত্তের) শরীরে প্রবাহিত।

কাজেই আমরা যখন দেশ, জনগণ, গণসাহিত্য, গণশিল্পের কথা বলি তখন নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান এবং তার অন্দর মহলের নানা গলি ঘুঁজিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকা রোমশ জন্তুর মতো সেই ধারাবাহিক অন্ধকার বিষয়ে অসচেতন থাকি। কৃষকের, শ্রমিকের 'সত্য আত্মীয়তা' অর্জন ঘোষণা দিয়ে হয় না।

বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক তার ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে যে সর্বনাশা শিক্ষা নীতির মাধ্যমে একদিন আমাদের পূর্বপুরুষদের নিজ বাসভূমে পরবাসী বানিয়েছিল, সেই একই ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে।

এ এমনই এক আজব কল যে, ঘোর কৃষকের বাচ্চাও এই কলের মুখ দিয়ে ঢুকে অন্য মুখ দিয়ে বেরোয় সম্পূর্ণ অন্য এক চিজ হয়ে— যার নাম 'ভদ্রলোক'। এই শিক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে এক সময় শিশু শিক্ষা বইতে লেখা হয়েছিল, 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'।

আমাদের দেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি প্রবর্তিত শিক্ষানীতির স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে এমন চমৎকার প্রকাশ আর হয় না। শিশুমনকে অনুপ্রাণিত করার জন্যে এই লাইনটি লেখা হয়েছিল ; কিন্তু ওই লাইনটির মধ্যে আছে এক চরম নিষ্ঠুরতার ইতিহাস এবং চলমান বাস্তবতা। আবার আর এক মজাও আছে, যেহেতু মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজকে উৎখাত করে ইয়োরোপের মতো এখানে পুঁজিবাদের উত্তরণ না ঘটে এদেশের অস্তায়মান সামন্ত সমাজের পরবর্তী স্বাভাবিক গতির অর্থাৎ বণিক পুঁজির বিকাশের যে সম্ভাবনা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, তাকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থে রুদ্ধ করে দিয়ে, সেই ভগ্নপ্রায় সামন্ত সমাজ কাঠামোর কঙ্কালের ওপর বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের লেবাস পরিয়ে দিল। ফলে যা হবার তাই হলো, না হলো বাঁদর না হলো শিব।

এই কিম্ভূতকিমাকার বিকলাঙ্গ মানস গঠনসম্পন্ন উত্তরাধিকারী দায়ভাগ নিয়েই আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণী (ইতিমধ্যেই যার বহুস্তর তৈরি হয়ে গেছে) থেকেই আসেন আমাদের দেশের প্রতিটি লেখক। এই লেখকদের একটি অংশ যখন নিজেকে সমস্ত দেশের অংশ করতে চান, তখন তাঁর দায় হয় আরো মর্মান্তিক। তিনি দেখেন দেশ বলতে যা বুঝায় তার সম্পূর্ণটাই তাঁর মানস চৌহদ্দির প্রায় বাইরে।

আমার বই
পুনরায় পাঠকের এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাই দেখা যায় বঙ্গদেশের গ্রাম সমাজের ভাঙা-গড়া সামন্তবাদের অবক্ষয়ের পাশাপাশি মাথা মুড়োনো নব্য ধনিক শ্রেণীর উত্থানের বাস্তব ছবিটি পাওয়ার জন্যে একজন গ্রামীণ সামন্ত পরিবারের সন্তান অমার্কসবাদী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কি খাঁটি জেলে পরিবারে জন্ম এবং আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাছেই হাত পাততে হয়। কোনো মার্কসবাদী লেখকের হাত দিয়ে তা বেরোয়নি।

এমন যে বিপুল শক্তিধর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর বিশাল ব্যাপক সাহিত্যজগতে এই জীবনের সন্ধান মেলে না। জেলে জীবন নিয়ে লেখা *পদ্মানদীর মাঝির* পাশাপাশি অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* পড়লেই বোঝা যায় একটি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের রচনা অপরটি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান হাতের লেখা হলেও তা ভেতর থেকে লেখা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল সাহিত্যভূমিতে মধ্যবিত্তেরই পদচারণা, সেই জীবনের ক্লিন্ন কদর্যতায় বাতাস ভারি, এমনকি সাম্যবাদী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের রচনায়ও দেখি সেই মধ্যবিত্তই ঘুরে ফিরে বেড়ায়। গ্রাম জীবন নিয়ে তাঁর প্রথম পর্বের নানা দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা *পুতুল নাচের ইতিকথায়* গ্রামের ভূচিত্র থাকলেও মানুষগুলো সবই মধ্যবিত্ত মানসজাত। সেখানে কৃষকের পদপাত নেই। অমন যে গ্রামীণ মেয়ে কুসুম, কথাবার্তা চাল-চলনে তাকে বড় বেশি শহুরে মধ্যবিত্ত মনে হয়। (তাছাড়া তরুণ ডাক্তার শশীর সঙ্গে দরিদ্র পরানের স্ত্রী কুসুমের কিংবা কুমুদের সঙ্গে মতির সম্পর্ক—বিশেষত এ দুজোড়া মানব-মানবীর নির্জনে দেখা শোনা কথাবার্তা গাওদিয়া গ্রামে বড় নির্বিঘ্নে ঘটে। নির্জন তালবনে কাউকে উঁকি দিতেও দেখা যায় না, কোনো কথাও ওঠে না। তাছাড়া এ উপন্যাসে গাওদিয়া নামের গ্রামটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের একটি গ্রাম, কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদী নৌকোর প্রাধান্য প্রসঙ্গ বাদ দিলে এর প্রকৃতি ও মানুষজন মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোনো গ্রাম-প্রধান শহরতলি বলে মনে হয়।) এর কারণও সেই বিচ্ছিন্নতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম এক ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ ভূস্বামী পরিবারে, গ্রাম জীবনের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ, আধুনিক শিক্ষার বাতাস তাঁর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও শিকড়টি বীরভূমের খাস মাটির গভীরেই ছিল, তাছাড়া সামন্ত কাঠামোর চৌহদ্দিতে বাঁধা চারপাশের জীবনের সঙ্গে তাঁর সামন্ত পরিবারের বিত্ত ও কৌলীন্য সত্ত্বেও মানস যোগাযোগে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। তারাশঙ্কর আজন্ম এই জগতেরই মানুষ।

অপরদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবডেপুটি কালেক্টর বাবা গ্রাম সমাজ থেকে উদ্ভূত হলেও বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট হরিহর

আমার বই
পড়বার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা ও কর্ম-জীবন সূত্রে সেই যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে সারাজীবন তাঁর সন্তান ও সংসার নিয়ে তৎকালীন অখণ্ড বাংলার মফঃস্বল শহরগুলোতে ভ্রাম্যমাণ থেকেছেন, জীবনের শেষাংশ ও শেষ নিশ্বাস মেশে মধ্যবিত্তের জন্ম ও বিকাশ ভূমির ভিত্তিস্থল কলকাতা শহরে। এতদ্‌সত্ত্বেও শৈশব-কৈশোরের গ্রাম জীবনের যেসব অনুষঙ্গ তাঁর মানসভূমিতে অবশিষ্ট ছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে একেবারেই বাইরের মানুষ। তিনি সর্ব অর্থেই শহরবাসী মধ্যবিত্ত নাগরিক। কাজেই এক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর জন্ম ও অবস্থানগত কারণে যে জগৎ কররেখার মতো আপন সে জগৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগৎ নয়।

অবশ্য অদ্বৈত মল্লবর্মণে জেলে জীবনের যে বিশ্বস্ত পরিচয় মেলে সেই অর্থে খাঁটি কৃষক জীবন তারাশঙ্করেও নেই, আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি (এ ব্যাপারে সবেধন নীলমণি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি)। তবু বাংলার কৃষিভিত্তিক সামাজিক জীবনের ঘাত-সংঘাতময় মহাসংহিতাটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমই রচনা করেছে।

এ ব্যাপারে টলস্টয়ের কথা ভাবা যেতে পারে—বিপ্লববিরোধী, প্রতিরোধ বিরোধ প্রবল ভোগী এই কাউন্টটির হাতেই সত্যিকার রুশ কৃষকের জীবন ফুটে উঠেছে। লেনিন তাঁর (টলস্টয়ের) ধর্ম প্রচারক ভূমিকাকে ধিক্কার দিয়েও তাই বলেন, 'Tolstoy is great as the spokesman of the ideas and sentiments that emerged among the millions of Russian Peasants at the time the bourgeois revolution was approaching in Russia.'

কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের সাহিত্যের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের মতোই ভূস্বামী পরিবার থেকে উদ্ভূত—পদ্মা তীরবর্তী কৃষকের মধ্যে গিয়েও সেই কৃষককে তিনি ধরতে পারেন না তাঁর সাহিত্যে।

কলকাতা শহরের জোড়াসাঁকোয় জন্ম, আযৌবন শহুরে মানুষ, আভিজাত্যের ব্যবধান সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ('ঐকতান' কবিতায় এ বিষয়ে স্বীকারোক্তি আছে) এবং এ 'আভিজাত্যের ইমারতটি' তৈরি হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রাসাদে। টলস্টয়ের আভিজাত্য স্বাধীন রাশিয়ার মাটি থেকেই পাওয়া এবং তিনি জন্মগতভাবেই কৃষকের সংলগ্ন। রবীন্দ্রনাথের মতো বিচ্ছিন্নতা বহন করতে হয়নি তাঁকে।

তারাশঙ্কর কিংবা টলস্টয়, কেউ মার্কসবাদী ছিলেন না, তবু রুশ কৃষককে পেতে হলে টলস্টয়ের কাছে যেমন যেতে হয় বঙ্গদেশের গ্রাম সমাজের ভাঙাগড়ার পরিচয়ের জন্যে তেমনি তারাশঙ্করই আমাদের একমাত্র উদ্ধার। এই সত্য কথাটি মনে রাখা জরুরি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে, চল্লিশ দশকের শেষ পর্বের অমন যে তেভাগা আন্দোলন, তাকে নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু-চারটে গল্প ও গুণময় মান্নার— [*লখীন্দর দিগার ?*]-এর মতো ইচ্ছাপূরণের অপটু প্রয়াস, কি অনুল্লেখ্য আরো এক-আধটা গল্প ছাড়া আর কিছু নেই। লক্ষণীয় যে, যখন কৃষকরা গ্রামবাংলার মাঠে মাঠে অসীম সাহসের সঙ্গে লড়ছেন, তখন মার্কসবাদী লেখকরা কলকাতায় বসে কলম যুদ্ধ করছেন একে অন্যের সঙ্গে, মার্কসীয় সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত এই কূট তর্ক নিয়ে (ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন কি গণনাট্য সংঘের ভূমিকার কথা মনে রেখেও এ কথাগুলো এসে যায়)।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা-কেন্দ্রিক যে সাহিত্য প্রচেষ্টা শুরু হয় সেখানে পাকিস্তানবাদী ইসলামি সাহিত্য, ইয়োরোপীয় ধারার প্রচলিত সাহিত্য এবং চল্লিশ দশকের বামপন্থী ধারা পাশাপাশি চলে। পাকিস্তান-উত্তর প্রথম পর্বে বামপন্থী ধারার লেখক হিসেবে যিনি সে সময়ে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত হতেন সেই আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পগুলোতেও দেখা যায় চল্লিশ দশকের সাধারণ চরিত্র— সেই মোটা দাগের অতি সরলীকরণ, তরল আবেগতাড়িত যান্ত্রিকতা। (বলাই বাহুল্য, আজাদ পরবর্তীতে তাঁর বামপন্থী সাহিত্যাদর্শ থেকে সরে দাঁড়ান)।

এ রচনায় কৃষকের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্য থেকে। সেই সঙ্গে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সুবৃহৎ জনগোষ্ঠীটি থেকে কেমন করে একটি শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা এবং দূরত্ব সৃষ্টি হলো তাকে স্পষ্ট করা, কেননা, এই বিচ্ছিন্ন দূরত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সাহিত্য, আমাদের রাজনীতি।

আমাদের দেশের কল-কারখানার যে শ্রমিক সে শ্রমিক ক্ল্যাসিক্যাল শ্রমিক নয়, তাঁরাও উঠে এসেছেন কৃষিনির্ভর জীবন থেকে, তাঁর মনের ভেতরও রয়ে গেছে জমির ক্ষুধা। যুক্ত হয়েছে নানারকম মধ্যবিত্ত ঝোঁক। অন্যান্য শ্রমিকের মধ্যেও সেই মৃত্তিকার তৃষ্ণা।

শোষণের চেহারাও নানান সূক্ষ্ম জটিল রূপ নিচ্ছে। গ্রামে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে ভয়াবহ রকম। শহরের ওপর চাপ বাড়ছে, জটিলতা বাড়ছে। শহর ক্রমে ঢুকে যাচ্ছে গ্রামে, গ্রাম উঠে আসছে শহরে। চল্লিশ বছর আগের বাস্তবতার সঙ্গে আজকের বাস্তবতা এক হয় না, হতে পারে না। আর একটি বিষয়, বাংলাদেশের শ্রেণীবিন্যাসটিতে এখন চলছে দারুণ অস্থিরতা। এর ফলে শহরে-গ্রামে সর্বত্র জটিলতার নানান মাত্রা যুক্ত হচ্ছে।

এই সমুদয় বিষয় মিলিয়ে একজন লেখকের কাজের ধারাও হয়েছে জটিল এবং কঠিন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাজ বদলের স্ফীত আবেগে যান্ত্রিক সরলীকরণের মাধ্যমে এই বাস্তবতাকে ধরা যাবে না। তা করতে গেলে হবে ব্যর্থ — পুনরাবৃত্তি।

শ্রেণী অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকে নিজের সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা বিষয়ে নিরাবেগ বোঝাপড়ার মাধ্যমে এগোতে হবে আজকের লেখককে।

খুঁজে দেখতে হবে কোথায় লেগেছে ঘূর্ণির টান, সে টানে কেমন করে পাড় ভাঙছে, নতুন ধারা কোথায় বাঁক নিচ্ছে। শহর, গ্রাম—যাঁর যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য সেই সেই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

বলা বাহুল্য, এ অনুসন্ধানের কোনো সহজ উপায় নেই, এক্ষেত্রে একমাত্র হাতিয়ার লেখকের প্রখর চেতনা এবং সামগ্রিক সততা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যে বাস্তবতা

বন্যা সারা বাংলাদেশকে ডুবিয়েছে। মানুষ, পশু, শহর, গ্রাম একাকার হয়ে গেছে। এ বন্যা নতুন নয়, বাংলাদেশের মানুষ হাজারো দুর্যোগের মধ্যে এই দুর্ভোগকেও তার জীবনের অংশ হিসেবে ধরে নিয়েই বেঁচে থাকে, লড়াই করে। বিচিত্র সে লড়াই।

বন্যা সমস্যা স্থায়ী সমাধানের কথা কোন ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, আজ পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি। এবারের বন্যায়ও আবার সেই পুরনো কথা শোনা যাচ্ছে।

বন্যা নেমে যাবে। শহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী—যাঁদের ঘরে পানি ঢুকেছে, নিরাপদ আশ্রয়ে যাঁরা সরে গিয়েছেন কিংবা জলাবদ্ধতার মধ্যেই অবস্থান করছেন, তাঁদের ঘর থেকে পানি নেমে যাবে। মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক জীবন আবার শুরু হবে। বন্যা সমস্যা তাঁদের কাছে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিটিও মিলিয়ে যাবে বিস্মৃতিতে।

কিন্তু যারা মধ্যবিত্ত নগরবাসী নয়, সেই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমস্যা আরো ঘনীভূত হবে।

যাদের ভাষা নেই, যারা কথা বলতে পারে না, সমস্যা তাদেরই। সে সমস্যার এত মাত্রা যে নগরবাসী মধ্যবিত্ত তার সবটা বুঝতেও পারবে না। এমনি চলে আসছে।

আমি নিজেও একজন রাজধানীবাসী। ঘরে পানি ঢুকলেও হাজার হাজার নিম্নবিত্ত মানুষের মতো আমাকে কোনো ত্রাণ কেন্দ্রে আশ্রয় নেবার মতো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়নি। বিত্ত না থাকুক, নিজের শ্রেণীরই আর কারোর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় পাওয়ার মতো কৌলীন্য আমার এখনো আছে।

কোটি কোটি মানুষ থেকে দূরে, তাদের দুর্যোগ এবং সংগ্রাম থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রেখে দেশের কথা, মানুষের কথা ভাববার সুযোগ করে নিতে পারি এখনো।

বেশ কিছুদিন ধরে সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে ঘুরেফিরে ভাবনা আসছে মনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রায় দু'বছর হতে চলল কোনো গল্প উপন্যাস লিখিনি, লিখতে গেলেই মনে হচ্ছে যেভাবে বললে বলাটা যথাযথ হবে সেভাবে আসছে না, ফলে দিন কাটে প্রতীক্ষায়, লেখা আর এগোয় না।

অগ্রজ লেখকের কাছ থেকে চিঠি পাই, তিনিও জানান, বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতাকে ধরতে গিয়ে দেখছেন এতদিনের প্রচলিত কলাকৌশল আর কাজে লাগছে না। তার মানে তিনিও আমার মতো সমস্যায় ভুগছেন। তার মানে ভাঙচুর একটা ঘটে গেছে কোথাও।

বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আমলেই তুমুল হইচই হয়েছিল।

বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সারা পৃথিবী জুড়েই একটা পরিবর্তন এসেছিল, তার ঢেউ এসে লেগেছিল এদেশের সমাজে।

সেই পরিবর্তনকে ধরতে গিয়ে ভাষা ও আঙ্গিকেও পরিবর্তন এল ; কিন্তু সমাজবাস্তবতাকে সাহিত্যে ধারণ করার এই 'কল্লোলীয়' উদ্যোগের মধ্যে ফাঁক ছিল।

এঁদেরই স্বল্প পরবর্তী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই ফাঁকটা প্রথম থেকেই ধরা পড়েছিল, 'মাটির পৃথিবীর কান্না'কে তাঁরা ধরতে চেয়েছেন 'ভাবের আকাশে বাড়' দিয়ে।

সমাজ-বাস্তবতা কোনো অনড় চিত্র নয়, বাস্তবতা মানুষকে নিয়ে, সেই মানুষের সমাজকে নিয়ে, ভেতর-বাইরের রূপ, তার সময়—এ সবের মধ্যেই থাকে বাস্তবতা, সময় বসে থাকে না, সময়ের সঙ্গে বাস্তবতাও বদলে যায়।

এই বদলে যাওয়ার প্রতিক্রিয়াটি চলতে থাকে বড় সূক্ষ্মভাবে, সহজে তা নজরেও পড়ে না, একসময় দেখা গেল সেই সূক্ষ্ম পরিবর্তন প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে।

সজ্ঞান লেখককে এই পরিবর্তন প্রতিক্রিয়াটিকে অনুধাবন করতে হয় প্রতিমুহূর্তে চিকিৎসকের মতো হাত বাড়াতে হয় তাকে সময়ের মণিবন্ধে।

সমাজ, মানুষ এবং সময়কে যিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন তাঁর ভেতর কোনো ভাবালুতা থাকতে পারে না, ভাবালুতা আসে দূরত্ব থেকে যিনি সরাসরি মোকাবেলা করেন অভিজ্ঞতা তার কাছে ভাসিয়ে তোলা বিষয় থাকে না, অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় উপলব্ধির সারাৎসারে, উপলব্ধি লেখকের চেতনায় আনে নৈর্ব্যক্তিকতা, এই নৈর্ব্যক্তিকতাই বাস্তবের ওপরকার সমস্ত বায়বীয় আবরণকে ছিন্ন করে দেয়।

যে নৈর্ব্যক্তিকতার জন্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা অনেক ভিড়ের মধ্যে থেকেও দূর থেকে আলাদা করে চিনে নেয়া যায় তিনি বাস্তবতাকে চিকিৎসকের মতো ধরতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর রচনায় পুনরাবৃত্তি নেই, বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে

~ www.amarboi.com ~
তাঁর গল্প-উপন্যাসের আঙ্গিকেরও পরিবর্তন এসেছে। প্রতিটি উপন্যাসে তিনি যে নতুন নতুন আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন তা ঐ বিষয়ের তাগিদ থেকেই এসেছে।

যিনি বাস্তবতায় এই নব নব রূপান্তর প্রক্রিয়াকে ধরতে পারেন না তাঁর লেখায় থাকবেই, (ভাব বিকাশের বা ইচ্ছা পূরণের বাম্প দিয়ে যতই সেই ফাঁক ভরাট করা হোক না কেন।) একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তির চক্রমনে তাঁর রচনা বন্দি হয়ে যেতে বাধ্য।

আজি যদি এতদিনকার প্রচলিত কলাকৌশল অকেজো বা পঙ্গু হয়ে গিয়ে থাকে সমাজ-বাস্তবতাকে ধরার ক্ষেত্রে, তাহলে বুঝতে হবে সমাজ-বাস্তবতার ভেতরে ভেতরে বেশ বড় রকমের ওলট-পালট হয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, ১৯৭০ পরবর্তী বাংলাদেশ তো আর আগের মতো নেই, এত বিচিত্র ওলট-পালট আগের মতো থাকতে পারে না। এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে ধরতে নতুন আঙ্গিকেই ধরতে হবে।

কিন্তু নতুন আঙ্গিকে ধরতে হলে প্রথমেই চিনতে হবে এই বাস্তবতার স্বরূপটিকে, তাকে যদি যথাযথভাবে শনাক্ত করা যায়, তখনই আসবে তাকে ধরার কলাকৌশলের প্রসঙ্গটি।

নতুন বাস্তবতার অভিজ্ঞতা লেখকের চৈতন্যকে কীভাবে মথিত করছে তার সারাৎসার লেখকের চেতনায় নৈর্ব্যক্তিকভাবে ধরা পড়লেই এই বাস্তবতা তার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

রথীনদা,

তাহলে এভাবেই সব কথা শেষ হয়ে গেল ! কিন্তু এমন তো কথা ছিল না, কথা ছিল আত্মজৈবনিক রচনাটি লিখবেন ; সেখানে কত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, বিশেষত যার সঙ্গে আপনার জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিল সেই চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের শিল্প, সাহিত্য ও রাজনৈতিক তরঙ্গের অভিঘাত ধরা থাকবে। প্রস্তাবটি ছিল আমারই। সেই যেদিন আপনি আপনার সম্পাদিত *অভিধারা* পত্রিকায় প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখন পর্যন্ত অগ্রন্থিত 'নেতা' গল্পটিকে নিয়ে আপনার লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি পড়ে শোনালেন মোহাম্মদপুরে আপনার মেয়ের বাড়িতে বসে, সেদিনই আপনাকে এ প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম। কীভাবে শুরু করবেন সে ব্যাপারেও দুজনে মিলে পরিকল্পনা করেছিলাম। সেই থেকে শুরু। কতবার বলেছি, সাক্ষাতে চিঠিতে ; অনেক সময় রীতিমতো রাগ করে চিঠি লিখে পরে মনে হয়েছে কী জানি বেয়াদবি করলাম না তো ? অমিতের মুখে পরে শুনেছি আহত তো হনইনি, ছেলেকে বলেছেন, লেখাটি এবার শুরু করতে হবে। তোর কায়েস কাকু রাগারাগি করেছে খুব।

হ্যাঁ, খুব তাগাদা দিয়েছি আপনাকে রচনাটি লেখার জন্যে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই জেনেছি আপনি হার্টের রোগী। ওষুধ আপনার নিত্যসঙ্গী, তাগাদা সে কারণেই, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা বুঝতে দিইনি আপনাকে।

আপনি যখন সেই প্রস্তাবিত রচনাটি শুরু না করে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা শুরু করলেন তখন আমার কেবলই আশঙ্কা হতে লাগল যে, এ ধরনের খুচরা রচনায় মেতে গেলে আপনার সঙ্গে বিশিষ্টজনের পরিচয়ের যে বিপুল পরিমণ্ডল তাতে কেবল এই খণ্ড খণ্ড ব্যক্তিরাই ক্রমাগত আসতে থাকবেন, অখণ্ড আত্মজৈবনিক রচনাটি দূরে সরে যেতে থাকবে ক্রমশ এবং এক সময়ে আর সময়ই থাকবে না।

আমার সে আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত ফলে গেল। শান্তিনিকেতনের স্মৃতি থাকল 'রবীন্দ্র তরুমূলে'তে। কিন্তু অনুক্ত থেকে গেল আপনার আসল পরিচয়। সেই

আমার বই
পুরানো পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা শহর, সেই তেরশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘে যোগদান, সেই *অগ্রণী আরণি অভিধারা* পত্রিকা, সেই বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ তেভাগা আন্দোলন, আত্মগোপন সাহিত্য আর রাজনীতির রাখীবন্ধনের সেই ঝোড়ো যুগ, সে যুগের কত খুঁটিনাটি, কত খ্যাত অখ্যাত জনের জীবন ও সময়ের স্পন্দন, তার সঙ্গে একটি অত্যন্ত সংস্কৃতিমান পরিবারের মধ্যে আপনার বেড়ে ওঠা, বিকশিত হওয়া কত গূঢ় অনুভব উপলব্ধি কিছুই জানানো হলো না আপনার।

কিন্তু কেন লিখলেন না শেষপর্যন্ত ? আপনি কি বুঝতে পারেননি আপনার যে অসুখ তাতে একটি মুহূর্তকেও বিশ্বাস নেই ? না কি অন্য কিছু ? বয়েস অল্প ? কোনো কিছুকেই বিবেচনা করেননি ? এক চিঠিতে ঐ রচনাটির ব্যাপারে লিখেছিলেন, পেছনে তাকালে ব্যর্থতারে হাহাকার মনে ভরে ওঠে। হাসিখুশি আলাপী হলেও মূলত আপনি খুব চাপা স্বভাবের মানুষ বলে মনে হয়েছে আমার ; কিন্তু ওই চিঠিতে, ওই একবারই আপনি সামান্য একটু আভাস দিয়েছিলেন নিজের ভেতরটার।

কিন্তু তারপরও আপনাকে ক্রমাগত চাপ দিয়েছি ; আপনি লিখেছিলেন, পুরনো কাগজপত্র গুছোচ্ছেন, সন-তারিখ ভুলে গেছেন অনেক প্রসঙ্গে, সেগুলো যোগাড় করতে হবে।

এই একটি ব্যাপার, খুঁটিনাটি নানান বিষয়ে বড় খুঁতখুঁতি আপনার ; তিরিশ/চল্লিশ বছর কি তারও আগের ছোট্ট এক টুকরো চিরকুটকেও আপনি অমূল্য জ্ঞানে আগলে রেখেছেন। কিন্তু এই রচনাটির ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতার পেছনে মনে হয় সেটাই একমাত্র কারণ নয়, আমার মনে হচ্ছে সেই যে 'ব্যর্থতার হাহাকার' করেছিলেন, এই বোধই আপনার মনে হানা দিয়ে গেছে।

এসবই আমার ধারণা, আজ আপনি নেই বলেই এসব কথা মনে হচ্ছে, যত দিন ছিলেন ততদিন ওই গুছোনোর ব্যাপারটাই সত্যি হয়েছিল, ওই খুঁতখুঁতে স্বভাবটার কথাই বারবার সামনে এসেছে।

খুঁতখুঁতে স্বভাবের কথায় মনে পড়ছে, *সুকান্তের হস্তাক্ষরে কবিতার পাণ্ডুলিপি* বইটা বেরুবে জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী থেকে, কথা পাকা হয়েছে। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে মফিদুল হকের কাছে গিয়েছি, ছাপা শুরু করতে কিছু দিন দেরি হবে, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি মফিদুলের কাছে রেখে আসতে আপনার দ্বিধা, বড় অস্বস্তিকর অবস্থা, আমাদের দুজনের মতো আপনি নিজেও সে পরিস্থিতিতে বিব্রত।

আমি জানতাম পাণ্ডুলিপি শেষপর্যন্ত যদি রেখে যেতে হয় তাহলে আপনার টেনশন শুরু হবে, হার্টের রোগীর জন্যে তা খুবই ক্ষতিকর।

মফিদুল আমার চোখমুখের ইশারা বুঝে বলল, ঠিক আছে আপনার কাছেই থাক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথাবার্তা শেষ করে ফিরে আসার সময় রিক্সায় বসে পাণ্ডুলিপির ফাইল কোলে আপনি বললেন, মফিদুল হক সাহেব বোধ হয় mind করলেন, ওনাকে ব্যাপারটা...

আমি আপনাকে আশ্বস্ত করেছি, না না mind করেনি।

তবু আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন খানিকটা অভদ্রতা হয়ে গেল প্রথম সাক্ষাতেই...

এতেও আপনার খুঁতখুঁতি। পরে একদিন গিয়ে মফিদুলকে ব্যাপারটা বলে আপনাকে জানাতে হয়েছে যে, মফিদুল কিছু মনে করেননি। তবে আপনার স্বস্তি। *ছাড়পত্র* কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা সম্বলিত সুকান্ত ভট্টাচার্যের হস্তাক্ষরের এই মূল পাণ্ডুলিপিটি আপনি কীভাবে পেয়েছিলেন, কত বিপদ আপদের মধ্যেও একে কীভাবে আপনি রক্ষা করেছেন তার ইতিহাস আছে আপনার *সুকান্তের হস্তাক্ষরে কবিতার পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থটির ভূমিকায়। বস্তুত চার দশক ধরে এই পাণ্ডুলিপিটি আপনার শরীরের অংশের মতোই থেকেছিল আপনার কাছে।

সে যা হোক, কিন্তু যে পাণ্ডুলিপির জন্যে আপনার এত দরদ, এত উৎকণ্ঠা, যাকে আপনি চল্লিশ বছর ধরে বুকে আগলে রাখলেন তার এখন কী হবে ? সেই পাণ্ডুলিপি কি ফাইলবদ্ধ হয়ে আপনার ঘরে জীর্ণ হতে হতে শেষ হয়ে যাবে ? কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি সাদরে নিতে চেয়েছিল, আপনি দেননি, আপনার ইচ্ছা ছিল জিনিসটা স্বদেশে থাকবে, কোনো প্রতিষ্ঠান একে যথাযথ মর্যাদায় রক্ষা করবে।

যেমন আপনি নিজে, শান্তিনিকেতনে চাকরির আহ্বান জানিয়ে পুলিনবিহারী সেন বার বার চিঠি লেখা সত্ত্বেও জন্মভূমি ছেড়ে যেতে রাজি হননি। অথচ নানান খুঁটিনাটি বিষয়ে আপনার যে রকম আগ্রহ, জানাশোনা (বিশ্বভারতী আপনাকে রবীন্দ্র গবেষণার ক্ষেত্রে একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য source হিসেবে বিবেচনা করেছে বরাবর, আপনিও বিভিন্ন সময়ে নানা তথ্য দিয়ে, ত্রুটি নির্দেশ করে তার যথার্থতা প্রমাণ করেছেন, পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য তারা মুদ্রিতভাবে সে ঋণ স্বীকার করেননি কখনো। তাতেও আপনার দুঃখ ছিল না, কাজে যে লাগছেন এই ছিল আপনার আনন্দ।) তাতে শান্তিনিকেতনে গবেষণামূলক কাজই আপনার জন্যে যথার্থ ছিল। সে জায়গায় ফরিদপুরের (এখন শরিয়তপুর) কোনো গণ্ডগ্রাম 'বালু চরে' পড়ে থাকলেন।

রিকশা থেকে পড়ে পা ভেঙেছিলেন, ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েও স্বাভাবিক হাঁটাচলা আর ফিরে আসেনি আগের মতো তবুও আপনি সেই ভাঙা পা নিয়েই ঢাকায় এসেছেন গ্রামের লাইব্রেরির জন্যে বই কিনতে।

সেবার ওসমানী মিলনায়তনে বইয়ের মেলায় ভাঙা পা নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে বই দেখেছেন, পছন্দ করেছেন, কেনাকাটা করে নিয়ে গেছেন। কী

পুনরায় পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগ্রহ ! গ্রামের লাইব্রেরিটাকে সমৃদ্ধ করতে হবে, মানুষ পড়বে, জানবে, মানুষ হবে।

প্রচণ্ড দরদ ছিল আপনার নিজের এলাকার মানুষজনের জন্যে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাঁরাও আপনাকে নিজেদের অভিভাবকদের মতো ভালোবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন। ছাব্বিশ বছর একটানা চেয়ারম্যান ছিলেন আপনার এলাকায়। সেও তো মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসার জোরেই।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা [? যখন] সপরিবারে বাড়ি ছেড়েছেন তখন সুদীর্ঘ ন' মাস আপনার বাড়ির এক টুকরো কাগজও নষ্ট হতে দেননি আপনার এলাকাবাসী। নিজেদের বিপন্নতার মধ্যেও সব তাঁরা আগলে রেখেছিলেন। সুকান্তের সেই পাণ্ডুলিপিও।

-কতবার যেতে বলেছেন আপনার গ্রামে, কতবার কথা দিয়েছি যাব, আপনার ভাই রমেনদা, আপনার ছেলেরা অভীক, অমিত বার বার নিয়ে যেতে চেয়েছে, যাইনি বলে অভিমান করেছেন, কিন্তু যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি।

বড় ইচ্ছা ছিল আপনার দেশ, আপনার এলাকা দেখাবেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, আপনাদের প্রাচীন পারিবারিক লাইব্রেরি, দুর্লভ পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ, আরো কত কিছু।

ভবিষ্যতে সেইসব পত্র-পত্রিকা, কাগজপত্র থেকে আমি কাজ করব এমন ইচ্ছা শুধু আমার কাছে নয় ছেলেদের কাছেও ব্যক্ত করেছেন।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন আপনি রবীন্দ্রনাথের আমলে, সেইসব দিনের স্মৃতি নিয়ে লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের তরুমূলের মেলা'। লেখার পর গোটা পাণ্ডুলিপিটি পড়তে দিয়েছিলেন মতামত জানতে বই হিসেবে ছাপার ব্যবস্থা করতে, সেই রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো *সচিত্র সন্ধানী*তে রচনার নামটা একটু সংক্ষিপ্ত করে। 'রবীন্দ্রনাথের তরুমূলের মেলা' হলো 'রবীন্দ্র তরুমূলে'। আগের চেয়ে নামটি যেমন সুখশ্রাব্য তেমনি ব্যঞ্জনাময়। নামের এই সংক্ষিপ্তকরণ আপনারও নয় আমারও নয়, মফিদুল হকের। আপনার অনুমতি না নিয়েই করা, কিন্তু আমার মতো আপনারও খুব পছন্দ হয়েছিল নামটি।

সেই 'রবীন্দ্র তরুমূলে' আর ক'দিন পরেই বই হয়ে বেরুবে *রবীন্দ্র সঙ্গীত* সম্মিলন পরিষদের উদ্যোগে।

বইটি প্রেসে যাবার আগে থেকেই চিঠিতে তাগিদ আসত অমুক ছবিটা যেন যায়, বিশেষত শান্তিনিকেতন উদয়ন ভবনে রবীন্দ্রনাথের মুখে যে আলোচনার অনুলিপি আপনি করেছিলেন এবং সেই অনুলিপির মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে যে মন্তব্য লিখেছিলেন (যা পরে পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল) সেটার ছবি যাতে যথাযথভাবে আসে বইতে সে ব্যাপারে আপনার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। কিন্তু মূল কাগজটি হাতছাড়া করেননি, সেটার ফটোস্ট্যাট থেকে ছবি করলে তা ভালো

~ www.amarboi.com ~

আসবে না জানালে সে কাগজটি লোক মারফত পাঠালেন বটে, তবে নির্দেশ থাকল ছবি তোলার সময় সামনে থেকে কাজটি সমাধার পরই যেন তা ফেরত নিয়ে আসা হয় এবং অভীক বা অমিত যেন আপনার গ্রামের বাড়িতে আপনার কাছে ফেরত নিয়ে যায়।

সেই মূল্যবান কাগজটি এখন আপনার ঘরে। এমনিভাবে নানান বিশিষ্ট জনের অজস্র চিঠি যত্নের সঙ্গে রেখে গেছেন আপনার সংগ্রহে। তেমনি আছে আপনার নানান সময়ের লেখা বিপুল ডায়েরি, ডায়েরি বুক থেকে শুরু করে এক্সারসাইজ খাতা ভর্তি, সে ডায়েরি সংক্ষিপ্ত লেখা নয়, বিস্তারিত খুঁটিনাটিতে পূর্ণাঙ্গ। আপনার সেই চামড়ার ব্যাগের ভেতর থেকে বার করে কতদিন মোহাম্মদপুরে আপনার মেয়ের বাড়িতে পড়ে শুনিয়েছেন। বলেছেন ডায়েরি লিখবেন, খুব ভালো অভ্যাস, লেখা-লেখিতে কত কাজে লাগে।

অথচ রথীনদা, আত্মজীবনী লিখতে গিয়েই আপনি ঠেকে গেলেন ? তার চেয়েও বড় কথা আপনি চলে গেলেন এবং এই ঢাকা শহর থেকেই, অথচ আপনার সঙ্গে, শেষ দেখা হলো না আমার।

বরাবরের মতো এবারও ঢাকায় এসেই খোঁজ করেছেন আমার, যে গেছে তাকেই বলেছেন আমি যেন যাই, রমেনদা সেদিনও বললেন, সাক্ষাতের জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন, কী সব জরুরি কথা আছে।

আমি যাচ্ছি-যাব করে শেষে হারালাম আপনাকে। জরুরি কী কথা ছিল জানা হলো না।

অথচ এমন তো হয়নি কখনো। ঘণ্টার পর ঘণ্টার আলাপ হয়েছে, গেলে উঠতে দিতে চাইতেন না, চলে আসার সময় শিশুর ব্যাকুলতা নিয়ে সেই দৃষ্টি, সেই প্রশ্ন আবার কবে আসবেন ? কিংবা বলেছেন আবার কবে দেখা হবে ?

অথচ এবার এমন কেন হলো ? চলে যাবেন বলে ? আমাকে অনুতাপের পীড়ন সইতে হবে বলে ?

গত বৃহস্পতিবার, ১৬ই জুনেও আমি ভাবছি আগামীকাল শুক্রবার ছুটির দিন রমেনদাকে নিয়ে আপনার কাছে যাব, তখনও জানি না তার আগের দিন আপনি চিরদিনের মতো ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন নিজের গ্রাম বালুচরে। আমি যখন সন্ধ্যায় জানলাম তখন আপনি বালুচরেও নেই। শ্মশানবন্ধুরা আপনার চিতা ধুয়ে চলে গেছে যার যার বাড়িতে।

বরাবর প্রণাম জানিয়ে চিঠি শেষ করেছি, আজো এই শেষ চিঠি শেষ করছি প্রণাম জানিয়ে, কিন্তু এ প্রণামে অপরাধের ভার থেকে গেল।

বিনীত

কায়েস আহমেদ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থালোচনা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাবি খুঁজছি গো মহারাজ

... বিধাতার কাছে আমি একদিন একটিমাত্র চরিত্র চেয়েছিলাম—যে প্রেমিক হোক, কি বেশ্যাগামী হোক, কি সাংসারিক হোক—আমি একটিমাত্র চরিত্র চেয়েছিলাম।

['সমীচীন মানব']

কিন্তু একটিমাত্র চরিত্রে অভিনয় করে কেউ জীবনের কাছ থেকে রেহাই পায় না। *সত্যের মতো বদমাশ*-এর পাত্র-পাত্রী সবাই নাগরদোলায় ঘুরছে। জীবন তাদের কাউকে একটি রোল [?] 'আমি' হয়ে মঞ্চে আসতে দেয়নি। সবাই এখানে 'দণ্ডিত খেলোয়াড়'। 'চাবি' হারিয়ে জীবনের রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করছে। কান্নায় ভাসতে ভাসতে বলছে : 'চাবি' খুঁজছি গো মহারাজ !'

মন্টু ভাবে, সে শহরেরও ছেলে হতে পারল না, গ্রামেরও না : শহর-গ্রামের মধ্যে উদ্বাস্তুর মতো মন্টু, কোথায় যে সে ঘর ফেলে এসেছে তা সে জানে না।

['চমৎকার অবচেতন']

'সত্যাসত্য', 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ', 'ভয়', 'অধঃপতন', 'চমৎকার অবচেতন', 'সমীচীন মানব', 'মাংস', 'সময়ের ঘর', 'দণ্ডিত খেলোয়াড়', 'বান্দা', 'চাবি', 'সত্যের মতো বদমাশ'—এই বারোটি আকুল পৃথিবী উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে।

এই দশকের গল্প আসরের অন্যতম মোহনকথক আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পর্কে *হলিডেতে* একদা আলমগীর কবির বলেছিলেন : I think this writer has a great future provided... সত্যিই সৈয়দ অপরিমেয় শক্তির অধিকারী, যদি কক্ষচ্যুত না হন, তার কাছ থেকে আরো সবল সন্তান প্রত্যাশা অমূলক নয়। এত সত্ত্বেও তবু সত্যের খাতিরে একথা বলতেই হবে যে, বর্তমান দশকের কতিপয় দুঃসাহসী তরুণ অনেক দ্যুতিময় সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন একদা। আজ তাঁদের অধিকাংশই বাণপ্রস্থ নিয়েছেন। মান্নান সৈয়দ এঁদেরই সাথি। এখনো সক্রিয়। কিন্তু সহযাত্রীদের মতোই সম্পন্ন শিল্পের রক্তপদ্ম তাঁর কাছে 'হনুজ দূর অস্ত।' তাঁর গল্পে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিষাদের আদিগন্ত ফেনা আছে, দিব্যস্বর শূন্যতা আছে—কিন্তু নেই সমাজের মাটি যেখানে এইসব যন্ত্রণা বিষাদ পা ফেলতে পারে।

যেন তিনি :

ঈশ্বরহীন ক্যাথিড্রেলে আত্মপ্রতারক সৃষ্টির প্রার্থনায় আমগ্ন।

মান্নান সৈয়দের এই ঘনিষ্ঠ ভূগোলে : রূপক, চেতনাপ্রবাহ, মনোবিকলন, মনোবিশ্লেষণ, অবদমন, বিভিন্ন মহাদেশের বিচিত্র আবহাওয়া প্রবাহিত। কিন্তু ঐ একটি কথা : সমাজের মাটি সেখানে অনুপস্থিত। তাই 'হাওয়াই যন্ত্রণাকে উজ্জ্বল শব্দের গহনায় মুড়ে তিনি উপস্থিত করেছেন।'

তাঁর গল্পের প্রায় পাত্র-পাত্রীই সমকালীন শতাব্দীর দুশ্চরিত্র সন্তান। তরুণ অধ্যাপক মাত্র এক বছরের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার গোপন গহন অন্ধকারময় গুহায় বসে নষ্ট চিন্তায় মগ্ন। বাড়ির চাকরানী, বারবনিতা, মদ, ছোটবেলায় শোনা না-বলা অশ্লীল ভাষায় আচ্ছন্ন চেতনা নিয়ে আত্মবিনষ্টির কথা সোচ্চারে ঘোষণা করে :

> আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে অদ্ভুত পার্থিব জীবনের আর এক মুহূর্ত নষ্ট না করে এইভাবে আগামী বৎসরখানেক অর্থাৎ আমি যতদিন বাঁচি ততদিনের মধ্যে এতকাল সঞ্চিত সম্ভ্রান্তির ভ্রান্তিময় সম্পদ সকল হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করব।
>
> ['অধঃপতন']

'মাংস' গল্পে জালাল সাহেব জীবনের প্রাচুর্য কিনতে চান কথিত ধনী রাজ্জাক সাহেবের কাছে আত্মজার যৌবন ভেট দিয়ে। লোভ, প্রাচুর্যের অপ্রতিরোধ্য লোভ মানুষের সমস্ত শুভ চেতনা, আজন্ম লালিত মূল্যবোধ, মান সম্ভ্রম, সব কিছু নির্মম গ্রাস করছে :

> রাশু জীবনের সবুজ পান নিয়ে ও ঘরে ঢুকলো। পুরোনো বাড়িটা পিঠে নিয়ে লাফিয়ে উঠলো একটা ডানাঅলা হরিণ। জালাল খেতে খেতে অবিরল কথা বলে যাচ্ছিলেন উনি বলছিলেন ওঁর সিনেমার কিছু শেয়ার আমাদের নামে লিখে দেবেন—বুঝলে, অত টাকা দিয়ে করবে কী, এমনিই তো বারো ভূতে খাচ্ছে—তা দু-এক আনা শেয়ার মানে বুঝলে বিরাট-বিরাট টাকা—আর মনিকে পাঠালাম দেখে আসুক, বাড়িতে সব আজে বাজে লোকজন—দ্যাখো তো কী কাণ্ড, ভালো লোক বড় লোক বলে শুষে খাচ্ছে—তুমি একবার যাও না, ঘুরে এসো—বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। কেননা ও ঘরে যেন গুরুভার পতনের শব্দ হয়। রাশুর মা চোখ তুলে কেমন করে তাকাতেই তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন।
>
> পরক্ষণে হাত নেড়ে যেন শব্দটিকে তাড়িয়ে দিলেন। রাশুর মা পানের বাটা টেনে নিয়ে দ্রুত সুপুরি কাটছিলেন, দ্রুত, যথা সম্ভব শব্দ করে। আর

~ www.amarboi.com ~

তিনি, জালাল আহমদ, একবার অনাবশ্যক গলা দিয়ে শব্দ করলেন। তারপর চুপচাপ খেতে-খেতে মুখ তুলে বললেন, মাংসটা খুব চমৎকার তো—।'

গল্পের নাম 'মাংস'। শেষ লাইনটি সমস্ত চেতনায় নির্মম চাবুক হাঁকড়ায়। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে নিতান্তই পুরনো। গল্পের টেকনিকেও কোনো নতুনত্ব নেই। কিন্তু তবু এ গল্প পাঠককে ধরে রাখে যে জন্যে তা হলো লেখকের স্বোপার্জিত ভাষা, মঞ্জুল, হীরকদ্যুতিময় শব্দ সম্ভার, চিত্রকল্প, উপমা। শুধু 'মাংস'ই নয়, বারোটি ভুবনই বর্ণাঢ্য শব্দ-বসন্তে ঝলমল করে এবং এ কৃতিত্ব সৈয়দের পরিশ্রমী শিল্পী সত্তারই একক বিজয় পুরস্কার।

'চমৎকার অবচেতন' এবং 'চাবি' এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প।

'চমৎকার অবচেতন'-এ দেখি কিশোর মন্টুর অবদমিত বাসনার দ্বিধা থরোথরো আকুলতা। বড় সুন্দর, সংযত এবং কুশলী হাতে তিনি গল্পের পরিণতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কী ভাষা ব্যবহারে, কী চরিত্র বিশ্লেষণে, পরিবেশ রচনায় 'চমৎকার অবচেতন' সত্যিই তাঁর হাতে চমৎকার হয়ে উঠেছে।

'চাবি' রূপকীকৃত গল্প। একজন চিত্রশিল্পী ক'একদিনের জন্যে শহরের বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে নিজের ফ্ল্যাটের দরোজায় দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলেন তিনি চাবি হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর নানা পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে লেখক নায়ককে নিয়ে এসে গল্প শেষ করলেন এইভাবে :

> মেয়েরা পরস্পরের গায়ের উপর পড়ে হাসতে লাগল। ওরা হাসছিল, আর আমি ওদের জন্যে মনে মনে কাঁদছিলাম। ওরা খিলখিল করে হাসছিল, 'চাবি' খুঁজছি গো মহারাজ !' আমি মনে মনে হু হু করে কাঁদছিলাম 'চাবি খুঁজছি গো মহারাজ !'
>
> তারপর অনেক দিন চলে গেছে। আমি আরেকটি ঘর ভাড়া নিয়েছি। আমি নিজের ঘরের বাইরে নির্বাসিত ও প্রবাসী থেকে এখনো দিনরাত সেই পুরোনো ঘরের চাবি খুঁজছি ; আমি আরেক জনের বাড়িতে থেকে জীবন ভোর আমার বদ্ধ ঘরের আসল চাবি সন্ধান করে যাব— এই আমার নিয়তি।

আবদুল মান্নান সৈয়দ তরুণ। *সত্যের মতো বদমাশ* তার প্রথম গল্পগ্রন্থ। চরম কিছু বলবার সময় এখনো আসেনি। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় : পূর্ব পাকিস্তানের ছোটগল্পে মান্নান সৈয়দ নির্ভরযোগ্য শক্তিমন্ত হাত। চাই শুধু দেশজ, সমাজের মাটি (সৈয়দের গল্পে যেটার অভাব দুঃখজনকভাবে প্রকট) 'যেখানে যন্ত্রণা বিষাদ পা ফেলতে পারে।'

মনোরম প্রচ্ছদপটে অঙ্গসজ্জার মনোহারিত্বে সর্বোপরি সুরুচিময় প্রকাশনার প্রসাদগুণসম্পন্ন বইটি সত্যিই লোভনীয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মজৈবনিক প্রতিকৃতি

দুর্বিনীত কাল, *বহে না সুবাতাস*, তারপর *সিতাংশু*, *তোর সমস্ত কথা*, বলা যাক, জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের বারো বছরের সাহিত্য জীবনের তিনটি মাইল স্টোন।

তাঁর গল্পে ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রিক চেতনা অহরহ স্পন্দিত হয়। *দুর্বিনীত কাল*-এ তিনি এমন এক স্বরে কথা বলেছেন যা কবিতা এবং প্রবন্ধের হাত ধরে থাকে, একটা ধূসর কুয়াশাচ্ছন্নতা তার সর্ব অবয়বকে ঘিরে রাখে। চরিত্রাবলি প্রায় কথাই বলে না, কিন্তু ঐকাহিক জীবনভাষ্য আমাদের স্তম্ভিত এবং মূক করে দেয়। 'তার ফেরা', 'গোলাপের নির্বাসন', 'পরমাত্মীয়', 'সাজানো ফুলের বাগান', 'আরো কয়েকটি পুতুল', আমাদেরই যে কোনো একজনের কথা হতে পারে।

বহে না সুবাতাস-এ বিস্মিত হয়ে দেখলাম জ্যোতিপ্রকাশ সম্পূর্ণ কথকের ভঙ্গিতে আমাদের গল্প শোনাতে বসেছেন, *দুর্বিনীত কাল*-এ যেমন তিনি কবির মতো ইঙ্গিতময় এখানে তিনি সেই পরিমাণে প্রাঞ্জল। *দুর্বিনীত কাল*-এও সমকালীন জীবন দোল খায় ; কিন্তু এমন বিস্তৃত এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধরা দেয় না, সমস্যা এবং সংকট রং-রেখায় একাকার হয়ে থাকে, গ্রন্থির পর গ্রন্থি জড়িয়ে থাকে শরীরে। পক্ষান্তরে *বহে না সুবাতাস* অত্যন্ত হার্দ্য কণ্ঠে আমাদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে আলাপ জমায়।

সিতাংশু, *তোর সমস্ত কথার* ভাষা *বহে না সুবাতাস*-এর কিন্তু অন্তর্গত রক্তে *দুর্বিনীত কাল* খেলা করে

প্রতিটি গল্প আত্মবাচনিক ভঙ্গিতে লেখা। প্রতিটি গল্প বিষণ্ন দুঃখের চাদরে মোড়া। সরলভাবেই গল্প শুরু হয়, মাঝে মাঝে চমকিত ইঙ্গিত, তারপর আবার পথ চলা, গল্পকার হাত ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে যেতে যেতে এমন এক জায়গায় এনে ছেড়ে দেন যে, তখন দিশেহারা হয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখি নিরাবয়ব শূন্যতায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা খুঁজছি...

> মনিময় হর্ম্যের দ্বারে পৌঁছে গেলাম ক্ষণিকেই। ঠিক আমারই মতোন সেই একই বিন্দুতে ছুটে এসেছেন আর সকলে, দেখলাম। তেমনি অনিদ্র, স্বেদ কম্পিত, ধূলিলিপ্ত বসন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশাল ভবনের কোথাও আজ দ্বীপ নেই, দীপান্বিতা কেবল স্মৃতি। সমস্ত চরাচরের মতোই তার অন্তর ধ্বনিশূন্য, দীপ্তিশূন্য, জনশূন্য !

খোলা দ্বারাপথে হা হা রবে বাতাস আছড়ে পড়ে ! বাগানে আজ কোনো গোলাপ নেই, একটিও পাপড়িও লভ্য নয় কোথাও। একটি বৃক্ষও যেন আমূল প্রোথিত নয়।

আর সেই তরুহীন, পুষ্পহীন উদ্যানে ক্ষীয়মান চাঁদের আলোয় শায়িত তাঁর অলৌকিক দেহ !

সমস্ত ধমনীতে রক্ত স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে জানলাম, কেবল জানুর অস্থি নয়, সমগ্র দেহ সহস্রবার বিচ্ছিন্ন করে আবার নির্মাণ করা যেত যে চিরদাসী বাসনার, সে সকলকে ছেড়ে চলে গেছে !

অকস্মাৎ প্রবল বর্ষণ তারপর ক্রমাগত রোদন করে চলে, হায় বাসনা ! হায় বাসনা !!

['ক্রীতদাসী বাসনা']

এমনি করে একটি অসুখী তরুণকে বুক ভরা শূন্যতা নিয়ে ঘুরে ফিরতে দেখি।

প্রবল অভিমান নিয়ে সে বাড়ি ফিরে দেখে তার বাবাকে, সৎ মা, মামিকে, দেখে সেখানে সে প্রায় নির্বাসিত, ফেরার সময় অভিযুক্ত পিতা বলে : '... খোকা তোর মা নেই, খোকা তোর বাবা নেই, কিন্তু তুই আসিস, তোর বাবার কাছে নয়, তুই আমার কাছে আসিস।' তখন সে ভাবে :

... আমি আবার এখানে আসবো, বোধহয় তাঁকে দেখতে নয়, তাঁর চোখে আমার ছায়া দেখতে।

কিংবা :

যাঁকে রেখে এলাম তিনি আমার পিতা নন, আমার সেই অভিযুক্ত পিতা বর্ণ-শব্দ-স্পর্শে পর্যবসিত মা'র মতো স্মৃতিতে বাসা নিয়েছেন, এঁর চোখে আমি ফুটে আছি প্রোজ্জ্বল হয়ে।

['পিতৃঘ্ন']

কী বলব ? এখানেও সেই দারুণ স্বকাল (আজন্মকালের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ভালোবাসা যখন উপহাস্য প্রায়) করাল হয়ে দোলে।

'আজীবন দিনরাত্রি'র নায়কের জন্যে সত্যি দুঃখ হয়, কী নিদারুণ আত্ম প্রতারণা :

রবি এবং রীনা যদি তাদের অবস্থান মেনে নেয়, তাতে আমারই সুখ। পুরনো প্রথা, সংস্কার এমনকি পুরনো ধরনের অনুভূতিগুলোও কি কিছু পালটে দেয়া যায় না ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারণ :

এমনি সব দিন রাত্রি পার করে আরো অনেক দিন আমাদের বাঁচতে হবে।"

অসহায়তা তখন বুকের ভেতর টনটন করে ওঠে।

'দূর যাত্রা'য় :

মনি মুখ ফেরালো না। আমি তার কথা শুনতে পাই, মাটিটাই খারাপ বুঝলি। কত জল ঢাললাম, কাঁকর বাছলাম, দু'বেলা কত যত্ন নিলাম, কিন্তু ওরা বড় বিশ্বাসঘাতক।

আমি জানতাম কারা বিশ্বাসঘাতক। এই বিশীর্ণ ফসলের ক্ষেত আসলেই অন্য কিছুর দ্যোতক আমি জানতাম। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি।

এইসমস্ত ইঙ্গিতবহ পঙ্‌ক্তি আমাদের হঠাৎ উৎকর্ণ করে তোলে, কার যেন পরিচিত ক্লান্ত পদধ্বনি শুনি।

তারপর :

মনি বাঁশী বাজাতো। মনি আমাকেও বাঁশী বাজাতে শিখিয়ে ছিল। আমি এখন আর বাঁশী বাজাই না। আমি আর বাজাতে পারি না। তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মনি, আর বাঁশী বাজাস না ?

বিশাল চোখ তুলে ধরে মনি জবাব দিল, আর বাঁশী বাজানো যায় না।

আমার খুব রাগ হলো তখন। মনি আমাকে বাঁশী বাজাতে শিখিয়েছিল, আমি না হয় ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু সে ছাড়বে কেন ; মনি আমাকে আরো কিছু শিখিয়েছিল, সবই আমার ভুলে যেতে হবে যদি কোথাও মাথা গুঁজতে পারি এই জন্যে। কিন্তু মনি ছাড়বে কেন ?

তখন আমাদের চিনতে বাকি থাকে না— 'তার ফেরা'র সেই বিপন্ন, বিষণ্ন এবং নির্বাসিত তরুণই ফিরে এসেছে আবার, সেই দণ্ডিত 'দেশবন্ধু' যেন আমাদের সকলের কাছেই কৈফিয়ত চাইছে।

আর :

মনি তখন ধীরে পথের পাশে, ঘাসের ওপরে, নীচে মাঠভরা জল, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে আকাশের দিকে তাকালো, সেই দল ছাড়া পাখিটা আবার ফিরে এসেছে।'

অবশেষে :

তখন আমিও তার পাশে শুয়ে পড়লাম। তারপর দু'জনে সেই দুঃখময় সন্ধ্যায়, বিস্তীর্ণ জলরাশিতে, বিশাল আকাশে একাকী পাখির দিকে চেয়ে রইলাম।

এছাড়া সত্যিই বোধহয় করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

আমি জোরে বললাম, রজব আলী কী দেখছো ?

শুক্রবার পাঠকে এক ঈদ

~ www.amarboi.com ~

অনেক দূর থেকে রজব আলীর আওয়াজ ভেসে এল, যেন কোথায় কোন পাতালে সে নেমে গেছে, কিছু দেখা যায় না হুজুর, তল নেই, শেষ নেই, বড় অন্ধকার।

আমি চিৎকার করে বললাম, আর কিছু নেই, আর কিছু নেই রজব আলী ?

ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, আর কিছু নেই !

আমি আকুল স্বরে বললাম, আরও কিছু বলো রজব আলী। আমি ও যে ট্র্যাংকে কী আছে জানতে চাই।

বাতাসের শব্দের মতো রজব আলী বলল, হুজুর, মনে হচ্ছে এই আমাদের জীবন।

দু'হাতে বুক চেপে বললাম, আর কী রজব আলী ? হুজুর, জীবনটা যদি এমন না হতো। আমাদের বড় দুঃখ। রজব আলীর স্বর বাতাসের সঙ্গে ফিরে চলে গেল।

তারপর সেখানে অনন্ত নৈঃশব্দ্য আর বাক্সের শূন্যতা ক্রমে চরাচর গ্রাস করে নিল !'

['সারা জীবন']

শব্দ বা বাক্য বিন্যাসে কোনো জটিলতা নেই ; কিন্তু থিম, সম্পূর্ণ Abstract ফর্মে এ গ্রন্থের প্রতিটি গল্পকে চিত্রায়িত করেছেন। অনুচ্ছেদের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো প্রতীকের ব্যবহার শ্রীদত্তের প্রায় প্রত্যেক রচনায়-ই ছড়িয়ে থাকে, কখনো কখনো সমস্ত গল্পটিই একটি প্রতীকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এ গ্রন্থেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

'পুনরুদ্ধার' গ্রন্থের শেষতম গল্প। এখানেও 'তার ফেরা' বা 'দূর যাত্রা'র নায়কের সন্ধান পাই ; কিন্তু অন্যভাবে।

গল্পের শুরুতে বলে :

শহর এখান থেকে অনেক দূরে। সেই শহর, শৈশব, কৈশোর ও যৌবন যে আমাকে লালন করেছিলো, তার দরজা এখন আমার কাছে রুদ্ধ।

গল্পের শেষে শুনি :

আমি তখন আমার খেলোয়াড় কয়েকজনকে নিয়ে বারান্দায় এলাম। ক্রোধে ক্ষোভে তারা যেনো উন্মাদ হয়ে উঠতে চায়। চেয়ে দেখলাম তাদের বলিষ্ঠ শরীরের পেশীসমূহ ফুলে ফুলে উঠছে। তাদের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হয়ে চলে ক্রমাগত। অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে তারা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে চায়। কেনো তারা এল না ! কি করি তা হলে আমরা এখন ! কি করি ; তারা ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন স্থির বিশ্বাসে জানালাম, এই আমি আশৈশব চেয়েছি। এখন নিশ্চিন্তে হৃত শহর পুনরুদ্ধারে যাত্রা করতে পারি।

শ্রীদত্তের এই নবলব্ধ আত্মপ্রত্যয় নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ইঙ্গিতই বহন করে। এবং তখন ক্রমাগত মন্ত্রোচ্চারণের মতো ধ্বনিত হয় বিশ শতকের বুলেট বিদ্ধ নীলকণ্ঠ মার্টিন লুথার কিং-এর মৃত্যুঞ্জয় বাণী :

In the spirit of the darkness of this hour, we must not despair, we must not become bitter.

২.

গ্রন্থপাঠ শেষে উপলব্ধি আসে শ্রীমান দত্তের রক্তে আছে অবিরাম পথ অন্বেষণের নেশা। *দুর্বিনীত কাল* থেকে *সিতাংশু, তোর সমস্ত কথা*, ভাষা বদলে, টেকনিক ভেঙে ভেঙে ক্লান্তিহীন Front change করার ইতিহাস।

দর্শন তাঁর *দুর্বিনীত কাল*, এবং এই দুর্বিনীত জরায়ু থেকেই তার সমস্ত সন্তানের জন্ম, যদিও আকৃতির দিক দিয়ে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র।

তথাপি আশঙ্কা জাগে অতঃপর তিনি কোথা যাবেন ; কেন জানি আমার বারবার মনে হয় *বহে না সুবাতাস*ই তাঁর প্রকৃত স্বদেশ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোন খানে'

'এতদিন তাঁকে জানতাম এদেশের প্রতিভাবান চিত্রকর গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান হিসেবে, যিনি এ যুগের গোধূলি সংকটে জ্বলছেন দীপের মতো ; আর এই গল্পগ্রন্থ আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁর জন্যে পাকা করে নিল জ্বলজ্বলে একটি আসন। প্রথাবিদ্বেষী এই শিল্পী এমন কিছু গল্প রচনা করেছেন যা আমাদের সাহিত্যে আনকোরা স্বাদ নিয়ে এসেছে। আধুনিক মানুষের যে সব অতল খাদ রয়েছে, চোরা নদী, তারই সন্ধান দিয়েছেন তিনি ; সেই জটিল-গভীর জগতের আলো অন্ধকার তিনি রূপায়িত করেছেন নিপুণ নিষ্ঠায়।'— সম্প্রতি প্রকাশিত মুর্তজা বশীরের প্রথম গল্পগ্রন্থ : *কাঁচের পাখির গান*-এর ব্যাক কভারে গল্পকার পরিচিতি দিতে গিয়ে কথাগুলো বলা হয়েছে।

মুর্তজা বশীরের চিত্রকলা সম্পর্কে সমালোচকরা প্রশংসামুখর। বিদগ্ধ শিল্প রসিকদের কাছে তিনি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। সে বিষয় আমার কোনো ব্যক্তিগত ভিন্নমত থাকতে পারে না, আমি চিত্র সমালোচক নই। চিত্র প্রদর্শনী হলে দেখতে যাই, বুঝতে চেষ্টা করি, এই পর্যন্ত, কিন্তু তার গল্প সম্পর্কে যে বক্তব্য ব্যক্ত হয়েছে— জানি না এ-ও আমার দৃষ্টির অস্বচ্ছতা অথবা বোধের অপরিপক্বতা কিনা— আমার কাছে কোন জানি মনে হয় তাঁর গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য যথাযথ হয়নি।

তিনি 'প্রথাবিদ্বেষী' চিত্র শিল্পী হতে পারেন ; কিন্তু গল্পে তিনি এমন কোনো নতুন কাজ দেখাননি যার জন্যে তাঁকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না ভাষা আন্দোলনের ওপর লেখা 'একটি বেওয়ারিশ ডায়েরির কয়েকটি ছেঁড়া পাতা' নামীয় নক্সা জাতীয় রচনাটিকে। এমন জীবন্ত, হৃদয়স্পর্শী করে তিনি তৎকালীন খুঁটিনাটি পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোকে এঁকেছেন যে সেই রচনার পাশে বর্তমান গল্প গ্রন্থটিকে কোনোমতেই ভাবতে পারি না। খারাপ লাগে।

কাঁচের পাখির গান-এর প্রতিটি গল্প গতানুগতিক, ভাবালুতায় ভরা, কোনো গল্পেই (না টেকনিকে, না বক্তব্যে) তাঁকে 'প্রথা বিদ্বেষী' হিসেবে দেখলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থভুক্ত প্রতিটি গল্পই নগরকেন্দ্রিক। আধুনিক জীবনের কথাই তিনি বলেছেন ; কিন্তু এ ধরনের চেতনা তো অহরহই প্রকাশিত হচ্ছে।

অবশ্য, স্মর্তব্য যে, তিনি মূলত চিত্রশিল্পী, তাঁর গল্পও তাঁর চিত্রকলার মতো হবে এমন আশা করা হয়ত তার প্রতি অবিচার করা, তবু তিনি জীবনেরই তো শিল্পী, নিত্য নতুন পথ খোঁজাই তো তাঁর সাধনা, গল্পে কি তিনি তাঁর চিত্রকলার মতো আরো বলিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ, গভীর এবং নতুন কিছু দিতে পারেন না ? যাতে আমরাও বলতে পারি তিনি সত্যিই 'প্রথাবিদ্বেষী' গল্পকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলো যাই পরোক্ষে

আবদুল মান্নান সৈয়দের সবচেয়ে বড় বিত্ত— ভাষা। আপন ক্ষমতাবলে তিনি নিজস্ব একটি ভাষা উপার্জন করে নিয়ে সাহিত্যে এসেছিলেন। এমন গ্রাম্যতামুক্ত, স্বচ্ছন্দ, বেগবান, দ্যুতিময় ভাষা আয়ত্ত করা একজন লেখকের কম কৃতিত্ব নয়, (এবং বোধকরি সবচেয়ে জরুরিও বটে) ফলে যা কিছুই তিনি লিখুন না কেন পাঠককে তা পড়তেই হবে। আর তাঁর পক্ষে শ্লাঘনীয়ও বটে যে, তিনিই বোধকরি এদেশে একমাত্র লেখক—অতি অল্প সময়ের মধ্যে যিনি তাঁর পরবর্তী তরুণ লেখকদের প্রভাবিত করতে পেরেছেন।

তাঁর গল্পে এদেশের বহুস্তরা শ্রেণী-শাসিত সমাজের প্রতিনিয়তের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ছায়া পড়ে না। মূলত তাঁর গল্পের চরিত্ররা শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, কিন্তু চরিত্রাবলি এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে না। সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে ঐ কাহিক ক্লীন্নতাকে পাশ কাটিয়ে তাদের অন্য এক জগতে নিয়ে যান তিনি।

তাঁর গল্প পড়ে মনে হয়, যাদের কথা লিখছেন হয় তাদের তিনি বিশ্বাস করেন না, কিংবা তাদের চেনেন না চিনলেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই, মুখ চেনা মাত্র ; কিংবা নিজের স্বপ্ন-কল্পনাকে তাদের ওপর আরোপ করে দেখে তৃপ্তি পেতে চান।

দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *চলো যাই পরোক্ষের* 'শেষ বাস' নামের গল্পটির কথা ধরা যাক : গল্পের নায়ক আমাদের বহুপরিচিত, বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত, সেই যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক কারণে ক্ষতবিক্ষত দিশেহারা, যাদের সাধ্যের চেয়ে সাধ অনেকগুণে বড়, তাদেরই একজন তাঁর গল্পের নায়ক রহিম... সকাল থেকে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত সেক্রেটারিয়েটে কলম পিষে আবার সদরঘাটের এক দোকানে কাজ করে, একরাশ অপগণ্ড ছাড়াও যার বড় ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। 'ছেলে বেশ কয়েকদিন আগে জানিয়ে দিয়েছে পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে শ' দুয়েক টাকা লাগবে।' 'জরিমানাসহ টাকা জমা দেবার আর মাত্র দু'দিন বাকি আছে।' মাসের শেষ, টাকা ম্যানেজ করতে পারেনি। মালিকের কাছে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

... তারপর যখন দোকান থেকে বেরিয়েছে সে তখন সদরঘাটের কর্মচঞ্চলতা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, দৌড়ে এসে ভাগ্যিস শেষ বাসটি ধরতে পেরেছিলো সে, তা নইলে মহামুশকিলে পড়তে হতো, আরো কিছু পয়সা পকেট থেকে বেরিয়ে যেত।

না, রহিমকে দেখে মনে হচ্ছে না এসব এখন মনে পড়েছ তার। দু'দিনের মধ্যে অনেক টাকা জোগাড় করতে হবে, এই ভাবনা যেন তার মধ্যে কোথাও নেই। অলসভাবে বাসের জানালায় তার খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা মুখ রাখা। বাসটা মোড় নিতে রহিম দেখল, পাশেই সমুদ্র। যতদূরে চোখ যায় শুধু অসীম জলরাশি। সমুদ্র যেন সিঁড়ির মতন ওঠে গেছে আকাশে। এতক্ষণ বাসের জানালার মধ্যে দিয়ে চাঁদ দেখা যায়নি। কোথায় কোনো আড়ালে লুকিয়েছিল। এখন সম্পূর্ণ চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে দিগন্তের উপরে। বরফের মতন চাঁদ ফোয়ারা ঢালছে। আকাশে সমুদ্রে অবিরল জ্যোৎস্না। উজ্জ্বল সাগর, ফরসা মেঘ, কিন্তু পানির নিচে কালো স্রোত। ফরসা মেঘের পিছনে কালো মেঘ, এত উজ্জ্বলতার ভিতরে কোথায় যেন এক রকম অন্ধকার মাখানো, কোন গোপন থেকে যেন ফোয়ারার মতন অন্ধকার উঠে আসছে। বাসের জানালায় মাথা কাৎ করে রেখে রহিম শান্ত কৌতূহলে দেখে। শান্ত নীল বিশাল সমুদ্রের কিনারা ঘেঁষে বাস চলতে লাগল ॥'

দারিদ্র্যলাঞ্ছিত একজন কেরানির গল্প, মান্নান সৈয়দ এমনিভাবে শেষ করলেন।

চলো যাই পরোক্ষের গল্পগুলো আশ্চর্য রকম সহজ সরলভাবে শুরু হয়েছে (ভাষা অত্যন্ত নির্ভার, সরল— গল্প বয়নে কোনো জটিলতা নেই)। প্রত্যেক গল্পের শেষ প্যারাগ্রাফটি সমস্ত গল্পের মোড় ভিন্নদিকে ঘুরিয়ে দেয়। এই মোড় নেয়া 'পরোক্ষ'র দিকে, যার অপর নাম 'পরাবাস্তবতা'। এইভাবে প্রত্যেকটি গল্পকে তিনি ভিন্নতর 'ডাইমেনশন' দিতে চেয়েছেন। 'শেষ বাস' নামের গল্পটিতেও তার চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এর যথার্থতার। যেমন 'না, রহিমকে দেখে মনে হচ্ছে না এসব এখন মনে পড়ছে তার।'... গল্পের শুরু থেকে উদ্ধৃত লাইনটির আগের বাক্যটি পর্যন্ত একটি অংশ এবং উদ্ধৃত বাক্যটি থেকে শুরু করে গল্পের শেষ বাক্যটি— 'শান্ত নীল বিশাল সমুদ্রের কিনারা ঘেঁষে বাস চলতে লাগলো ॥'— পর্যন্ত আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অংশ, যার মাঝখানে একটি মোটা দাগ টেনে বলা যায়— গল্পটি ভারসাম্য হারিয়েছে।

রহিম নামের মানুষটি 'মগ্ন চৈতন্যে'র মধ্যে সমগ্র গল্পটি ধরে রাখলে কোনো প্রশ্ন উঠত না, কিন্তু রহিমের সমস্যা এবং তার হঠাৎ ভাবান্তরের ব্যাপারটা পাঠককে হোঁচট খাওয়ায়। প্রশ্ন ওঠে সে কারণেই। অর্থাৎ মান্নান সৈয়দ যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জগতের কথা বলতে চেয়েছেন তার জন্যে উপযুক্ত মাটি তৈরিতে সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেননি।

'রাস্তা', 'গতবৃষ্টি', 'সাপ', 'শেষ বাস', 'এক সন্ধ্যা', 'পশ্চাদ্বাবন', 'একরাত্রি', 'জলপরি', 'একটি আয়না নিয়ে', 'ঝড় ও দরোজা'—এই দশটি গল্প নিয়ে 'পরোক্ষ'র জগৎ। এর মধ্যে 'এক রাত্রি' গল্পটি গ্রন্থভুক্ত গল্পের মধ্যে আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু একই কায়দায় অন্যান্য প্রতিটি গল্পের সমাপ্তি পাঠকের কাছে একঘেয়েমি লাগা বিচিত্র নয়, কিন্তু এ কথা সত্যি, মনোযোগ আদায় করে নেবার ক্ষমতা গল্পগুলোর আছে বলেই প্রত্যেকটি গল্পই পাঠককে পড়তে হবে। এর কারণ বোধকরি যতটা না গল্পের জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি এর অনর্গল প্রবহমান দ্যুতিময় ভাষার জন্যে।

চলো যাই পরোক্ষের আর একটি লক্ষণীয় দিক হলো, তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *সত্যের মতো বদমাশ*-এর থেকে এর ভাষা কিঞ্চিত ভিন্নতর। সচেতন পাঠক একটু মনোযোগী হলেই ধরতে পারবেন। হতে পারে গল্প-গঠনের ভিন্নতাই এর কারণ।

গ্রন্থের গল্পকার পরিচিতিতে বলা হয়েছে : 'বর্তমান গল্পগ্রন্থ দশটি গল্পে একটি চরিত্র, প্রতীক নিয়ে সংকলিত যা বাংলা সাহিত্যে প্রথম।' কথাটি শুনতে বেশ চমকপ্রদ লাগলেও মেনে নিতে পারি না, গবেষকের মতো রিসার্চ না করেও এ কথা বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথা, তিনি 'বিজন' নামক একটি চরিত্রকে নিয়ে একাধিক গল্প রচনা করেছেন, স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তা হলে গ্রন্থের নাম সম্ভবত *ক্রীতদাস ক্রীতদাসী*। সন্দীপন বাবু যদিও তাঁর 'বিজন'কে প্রতীক চরিত্র বলে দাবি করেননি, এবং তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুও ভিন্নতর। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থটির উল্লেখ এই জন্যে যে, 'একক চরিত্র' বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়

চলো যাই পরোক্ষের ব্যাক কভারে বলা হয়েছে : 'এই-যে মাধ্যম তার পরিণত রূপ বিস্মিত করে ছোটগল্পের ঐতিহ্যহীন এ-দেশকে'।

মোটা অক্ষরের বাক্যাংশের হাস্যকর উক্তিটি না করলেই কি চলত না ?

আলোচনার একাংশে উল্লেখ করেছি, পাঠক তাঁর গল্প পড়বেন গল্পের জন্যে যতটা নয়, ভাষার জন্যে তার চেয়ে বেশি— কিন্তু শুধুমাত্র এর ওপরই একজন লেখক দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলে তার পরিণতি খুব সুখকর হয় না। ভিত্তিভূমির জন্যে শক্ত মাটির প্রয়োজন, অতঃপর মান্নান সৈয়দ গল্পে কোন ভূমণ্ডল দেখান তার প্রতীক্ষায় থাকলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোঝাপড়া

কথায় কথায় অনেকদূর চলে এসেছি তোমার সঙ্গে
এবার আমি ফিরতে চাই
আমার কত কাজ, কত সব কাজ পড়ে আছে,
তুমি আমাকে পথের মধ্যে খালি দেরি করিয়ে দাও ;

অনেক দিন তো হলো এখন অন্তত তোমার বোঝা উচিত
আমাদের সামনে সমুদ্র নেই, পেছনে নদী নেই নেই ডানে বাঁয়ে অরণ্য কিংবা পাহাড়
কিছু নেই শুধু পথ আছে—
এমন করে, না জেনে শুধু শুধু হাঁটার কোনো মানে হয় !
এখন আমি ফিরব।

নিজে যেটুকু আমি, তার বেশি আমি নই,
আমার চোখ দুটো আমারই চোখ, দু'হাতের দশটি
আঙুল আমারই আঙুল,
আমি তাদের ভালো করে চিনে নিতে চাই,
আমি চাই আমার নিজের সীমানার মধ্যে শক্তপায়ে দাঁড়াতে।
বুঝলে ?

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

বউ

'বউ' বলে কাকে তুমি ডাকলে কিশোর ?
কাহারে আলিঙ্গন করো তুমি অবেলায়
তিতাসের জলে, জলের কিশরে ?
প্রেমই কি মৃত্যু অথবা মৃত্যুই প্রেম
কাকে তুমি 'বউ' বলে ডাকলে কিশোর ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চোখ

'আকাশে আকাশ নেই, চন্দ্রমা নক্ষত্র গেছে মরে ;
তোমার ও কালো চোখ, ওই দীর্ঘ পল্লবে ছাওয়া চোখ ওখানেই আমার
আকাশ—

মেঘের ছায়ায় তাকে ঢেকো না আঁধারে !'
এই কথা প্রেমিকাকে লিখে যে নির্বোধ গাঢ় দুঃখ
নিদ্রাহীন রাত্রি কাটায়
সত্য থেকে তার বসবাস যোজন যোজন দূরে
কেননা হৃদয়-সম্পূর্ণ পারে না দিতে তাহার হৃদয় !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাখিরা সব জানে

কখন হাওয়া কোন দিকে বয়,
কোথায় ফল পাকে, কোথা আছে তৃষ্ণার জল
পাখিরা সব জানে ;
তাদের বুকেও সুখ দুঃখ আছে ;
জন্ম মৃত্যু, মিথুন আনন্দ— সব জানে তারা ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাকে খোঁজো

ক্লান্ত কিশোর কাকে খোঁজো
কোথায় তোমার ঘর
নাম কী তোমার,—পিতা মাতা ?
আছে কি খবর ?
নিজের কাছে প্রশ্ন করো
কাকে তোমার চাই
মাঠ পেরিয়ে হাট পেরিয়ে
যেদিক পানেই যাও
—ছায়া বিহীন বিষম খরা
দেখবে শুধুই ছাই
তারচে বরং
যে দিকে তাকাও ছায়াহীন বিষম খরার
চিহ্ন—শুধু ছাই।
উড়ছে, বিগত দিনের স্মৃতির মতো।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

নিজের সঙ্গে কথা

তুমি যেখানেই যাও
ফেলে আসা দিনগুলো
তোমার সঙ্গে যায়।

কোথায় লুকোবে তুমি ?

যেখানেই যাও
ফেলে আসা দিনগুলো
তোমার সঙ্গে যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বৈরথ

স্বাধীনতার মতো প্রিয়
তোমার কাছে কিছু নেই

ভদ্রতায় ভালোবাসায় উদারতায়
তুমি তাকে বারবার
শৃঙ্খল পরিয়েছো।

পরাধীনতার মতো ঘৃণ্য
তোমার কাছে কিছু নেই
স্বাধীনতার মতো প্রিয়
তোমার কাছে কিছু নেই

এই দ্বৈরথ নিশি দিন
তোমার ভেতরে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুপুর

ঝাঁ ঝাঁ রোদ।
চষা মাঠ।
দূরে গাছপালা।
একটা ফড়িং শুধু
স্থির ছবির মতো দুপুরকে
জাগিয়ে রাখে
ডানার স্পন্দনে।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

কুষ্ঠব্যাধি

কই যাও চন্দ্রমোহন ?
তোমার ক্ষ্যাত, তোমার পুষ্কন্নী, তোমার
আম-জাম, কাঁঠাল, কলা, নারকেল ঘেরা
বাড়ি, উঠোন, হলুদ গাঁদা, নীল
সন্ধ্যামালতি, বাঁধানো তুলসী মঞ্চ,
গোয়াল ঘর, তোমার রাজ্যপাট
কালাইয়া রাইতের আন্ধারে
কই যাও ? ক্যান
যাইতে হয় !

বক্কেশ্বর পণ্ডিতের কথা মনে পড়ে ?
দ্বাপর যুগ সমাপ্ত হইলে প্রজাপতি
ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশে অধম্যের জন্ম হইল
মিথ্যা হইল অধর্মের সহধর্মিণী।
দম্ভ তাহাদের পুত্র। দম্ভ আপন
সহোদরা মায়াকে বিবাহ করিল এবং
তাহাদের লোভ নামে এক পুত্র
জন্মগ্রহণ করিল। লোভও
ভগিনীগমন করে, ফলত তাহাদের
ক্রোধ নামে এক পুত্র এবং হিংসা
নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়।

মনে পড়ে চন্দ্রমোহন ? বক্কেশ্বর পণ্ডিত
সেই কোনকালে চিতাখোলার ছাই
হইয়া পঞ্চভূতে মিশ্যা গেছে। কথা
মিশে নাই। মুনি ঋষিগো বাণী তো
জগতে রইয়া যায়। দম্ভ আর
মায়ার বিয়া আইজও হয়, লোভ
নামের পুত্রের জন্মও কেউ ঠেকাইতে
পারে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাই তো চন্দ্রমোহন : রাইতের আন্ধারে
চৌদ্দ পুরুষের ভিটা ছাইড়া নদীর
জলে চক্ষের জল মিশাইয়া নির্বাসনে
যাইতে হয়। ভাইস্যা যায়গো নদীর
জলে প্রতিমা ভাইস্যা যায়।

বড় দুঃখ চন্দ্রমোহন, বড় কষ্ট !
তবু মাটির বড় মায়া। রাইত নাই
দিন নাই মাথার ভেতরে বুকের ভেতরে
খালি পাড় ভাঙে। নদী খালি
কল-কল কল-কল কইরা বইয়া যায়।

চন্দ্রমোহন, মনে পড়ে আশ্বিন মাসের সেই পূজা !
ভরা বর্ষার আন্ধার রাইতে মাঠ বিল
ভইরা লণ্ঠনের আলো। কালো কালো
মানুষের হাতে ট্যাটা আর কোচ।
মাছ, জলের জিন বড় তড়পায়।
আহারে মাছ। সেই নদী মনে পড়ে
চন্দ্রমোহন ? বর্ষার নদী। আশ্বিনের
নদী। কাশবন। শীতের পিঠা।
নবান্ন। মনে পড়ে।

তবে, কই যাও চন্দ্রমোহন ? রাইতের আন্ধারে
রাজ্যপাট ছাইড়া কোন নির্বাসনে
যাও নদীর জলে চক্ষের জল মিশাইয়া।

চন্দ্রমোহন, ইংরাজ গেল, কিন্তু
তোমারে ক্যান নির্বাসনে যাইতে অয়।
দ্যাশ অইলো জননী। জননী ক্যান
সন্তান বিসর্জন দেয়।

'৭১-এর যুদ্ধের কথা মনে
পড়ে ? মানুষের কী কষ্ট !
প্রাণের কী মায়া ! লাখো লাখো

আমার বই
পৃথিবীর পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষ। রক্ত ! আগুন ! ভয় !
কান্না ! দীর্ঘশ্বাস ! অতঃপর
স্বাধীন হইল দ্যাশ। হায়রে স্বাধীন !

আমরা য্যান কোনো রাক্ষসের প্যাটের
মইদ্যে আছি। আমাগো চোখ
নাই, শরীর নাই। কেবল
মাংসের তাল। হিংসা আর
লোভের তাল।

চন্দ্রমোহন, এখনো এতকিছুর
পরও ক্যান নিজের শিকড়ে টান
পড়ে। এখনো ক্যান সন্ত্রস্ত
থাকতে হয় সদা, দ্যাশ তো স্বাধীন।
তবু ক্যান তুমি হও ভীত।
কেবল এই জন্যে যে— তোমার
নাম চন্দ্রমোহন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গৃহীত সাক্ষাৎকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রংরাজ ফেরে না

'আমার গল্পে যে চরিত্রটি সবচেয়ে বেশি Suffer করছে দেখবেন, সেটাই আমি।'

আলাপ হচ্ছিল জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের সাথে। কথা ক'টি বলতে গিয়ে চোখমুখে তাঁর বেদনার গাম্ভীর্য এসে ছায়া ফেলল। থিরথির করে কেঁপে উঠল তাঁর গলা। ঠিক যেন 'কেষ্টযাত্রা'র সুখেন। হ্যাঁ, আমি জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের ভেতর সেই কিশোর সুখেনকে দেখছিলাম—যার 'ঠিক তলপেট থেকে কেমন একটা ব্যথা উঠল, তারপর উঠতে উঠতে সেটা এসে বুক ভরে গেল, আর খানিকটা গলা দিয়ে বেরুতে না পেরে কণ্ঠার কাছে এসে জমাট বাঁধলো।'

তিরিশ বছরের জীবনে তাঁকে অনেক চড়াই উৎরাই পেরুতে হয়েছে। জীবন তাঁকে নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর সব অবয়ব দেখিয়েছে বারবার। কখনো পানের দোকানে, কখনো মনোহারি দোকানের কর্মচারী, খবরের কাগজের ফেরিঅলা, পরের বাড়িতে কাজকর্ম করে পেটেভাতে থাকা, পুস্তক ব্যবসায়ীর দোকানে ৭৫ টাকা বেতনের প্রুফরিডার থেকে শুরু করে দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক পর্যন্ত অনেক পথ। আঁকাবাঁকা, ধূসর, রুক্ষ, ছায়াহীন পাথুরে পথ।

অবস্থা খুব ধনী না হলেও মোটামুটি সচ্ছলই ছিল। বাবা কাজ করতেন এক ইন্ডিয়ান ফার্মে. দেশ ভাগ হলো। আমরা ওপারে গেলাম না। বাবার চাকরি গেল। গ্রাম থেকে বগুড়া টাউনে এলাম সংসার একেবারে ছোট ছিল না। সম্পত্তির ওপর হাত পড়ল। গ্রামে পড়তাম ক্লাস থ্রিতে, শহরে এসে ফাইভে ভর্তি হলাম। পড়াশোনা চলল। তারপর...

হ্যাঁ, তারপর শুরু হলো হাঁটা। বালক জ্যোতি নামল পথে। জীবনের সাথে পাঞ্জা কষতে। স্কুলের বেতন দেবার সঙ্গতি নেই। কাজেই স্কুল ছাড়ো। অতঃপর পানের দোকানে চাকরি। হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটি পানের দোকানে চাকরি করে। বিভিন্ন পরবে মেলা বসে। জ্যোতি মেলায় পানের দোকান নিয়ে যায়। মালিক নয় কর্মচারী।। দেখে : হাসিখুশি সচ্ছল ছেলেমেয়েরা রঙিন জামা কাপড় পরে ঘুরে ঘুরে মেলার জিনিস কিনছে। পথ দিয়ে বই বগলে সমবয়সীরা স্কুলে যায়,

আমার বই
পুস্তকের পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দোকানে বসে জ্যোতি বুক ঠেলে ওঠা দীর্ঘশ্বাস চাপে। ভাল্লাগে না। কিচ্ছু ভাল্লাগে না। খবরের কাগজ ফেরি করা। তা-ও ভাল্লাগে না। কী করা যায়। এক ব্যবসায়ীর চোখে পড়ে গেল। টাউনের ওপরই তার মনোহারির দোকান। সেই দোকানে কর্মচারী। তার বাড়িতেই থাকা খাওয়া। বাচ্চা ছেলেটাকে একটু পড়া দেখিয়ে দেয়া, বাড়ির কাজকর্ম দেখা আবার দোকানে বসা পেটভাতে থাকে, পালা-পার্বণে জামা কাপড়টা পাওয়া যায় আর মাস গেলে নাম মাত্র মাইনে। দশটি টাকা। তাই সই।

পড়াশোনার আগ্রহ দেখে মালিক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আগের মতোই সব চলে। নতুনত্বের মধ্যে স্কুলে যাওয়া। কিন্তু একটা জায়গায় একটু ওলটপালট হলো। মাস শেষের দশটি টাকা মাইনে বন্ধ হলো। মালিক বললেন : স্কুলে পড়াশোনা করছ। এখন আবার মাইনে কিসের। থাকছ খাচ্ছ। আবার কী !

তথাস্তু ! পড়াশোনা করতে হবে, বড় হতে হবে কাজেই সুযোগ হাতছাড়া করে লাভ নেই। বাবার কাছ থেকে ইস্কুলের মাইনের টাকাটা চেয়ে আনে। মাঝখানে গরিব ছেলে বলে ফ্রি হাফ ফ্রি'র চান্সটাও পাওয়া গেল। অসুবিধে হলো ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে। মনের ভেতর ভয় ঢুকল : পাস করতে পারব তো ! অঙ্কে ভীষণ কাঁচা। যদি গচ্চা মারি ! লজ্জার সীমা থাকবে না। অন্যান্য সাবজেক্টে ভালো। কিন্তু যত মুশকিল এই বিদঘুটে অঙ্কটাকে নিয়ে। স্যার বললেন : তুই আমার কাছে আসবি। অঙ্কে তো তুই ভীষণ কাঁচা।

: কিন্তু স্যার, আপনাকে বেতন দেবার সঙ্গতি তো আমার নেই...

: সে কথা তোকে ভাবতে হবে না। তুই ওদের সাথে এসে বসে যাবি।

ম্যাট্রিক পাস করলাম। কলেজে ভর্তি হলাম। এবার আর দোকান কর্মচারী নয়। টিউশনি করি।

আইএ পাস হলো ঢাকায় এলেন যুবক জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। সেটা ১৯৫৭ সালের কথা ইসলামপুরের এক পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে কাজ নিলেন প্রুফ রিডারের। মাইনে ৭৫ টাকা সেখানেই, সেই স্বল্প পরিসর জায়গায় থাকা খাওয়া চলল। মাঝে আর একটি লাইব্রেরিতে ক'দিন কাজ করেছেন তিনি। ইসলামপুরের সেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, কিন্তু ওখানে থাকতে বড় অসুবিধে। জগন্নাথ হলে চলে এলেন। এর ভেতর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়ে গেছেন। *মজলুম* নামে ঢাকার আশেক লেন থেকে তৎকালে প্রকাশিত পত্রিকায় চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছেন। সকালবেলা এখন রমনা থেকে যান ইসলামপুরে প্রুফ দেখতে। দশটা পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন। দুপুরে ইউনিভার্সিটির ক্লাস। সন্ধে ছ'টা থেকে আবার রাত দশটা পর্যন্ত প্রুফ দেখা। তারপর সেখান থেকে *মজলুম* অফিসে রাত দুটো পর্যন্ত পত্রিকার কাজ। অতঃপর হলে ফেরা। হলে গেট বন্ধ

~ www.amarboi.com ~

হয়ে যায়। পাঁচিল টপকে ঢুকতে হয়। একদিন রাতে পাঁচিলের ওপর উঠেছেন সবেমাত্র, এমন সময় দারোয়ান চেঁচিয়ে উঠল : চোর চোর। ধরা পড়লেন। প্রভোস্টের কাছে সোপর্দ করা হলো তাঁকে। বলা হলো : স্যার, এ ছেলে রোজই এই কাণ্ড করে। মাঝখানে তৎকালীন ছাত্রনেতা সত্য ভট্টাচার্য পরে সে যাত্রায় তাঁকে রক্ষা করলেন। ধরা পড়ে শাপে বর হলো। তিনি হল প্রভোষ্ট ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের চোখে পড়লেন। জ্যোতিপ্রকাশের ভাষায় : সত্যদা আমার সব জানতেন, তিনিই ওঁকে সব বললেন।

ড. দেব বললেন, তুমি আমার ওখানে একবার এসো হে।

ড. দেবের বাড়িতে যাওয়া আসা করতে করতে হৃদ্যতা গড়ে উঠল। তখন তিনি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। জগন্নাথ হলে জায়গার বড় অভাব। প্রভোস্ট ড. দেব ফরাশগঞ্জের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে খুললেন বিবেকানন্দ ছাত্রাবাস।

: নতুন হোস্টেলে আমিই হলাম প্রথম আবাসিক ছাত্র। জ্যোতিপ্রকাশ বললেন।

ঢাকায় আসার পর সেই '৫৭ থেকেই কিন্তু তিনি লিখছেন।

: তখনো কনভেনশনাল পথেই গল্প লিখি। সিরিয়াসলি এবং এক্সপেরিমেন্টাল গল্প শুরু করি আরো পরে।

ঢাকার ঝুলনবাড়ি থেকে এনামুল হকের সম্পাদনায় বেরুত মাসিক *উত্তরণ*। স্বল্পায়ু হলেও পত্রিকাটি পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক সাহিত্যান্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল একদা। সেই উত্তরণে ১৯৫৯ সালে বেরুল তাঁর গল্প : 'মৃত্যু অনেক'।

: *উত্তরণ* সম্পাদক এনামুল ভাই একটা গল্প চাইলেন। গল্প দিলাম। ছাপা হলো না। তিনি বললেন গল্পটার শুরু তো বেশ সুন্দর, কিন্তু গল্প সম্বন্ধে তুমি ভাব না কেন ? সেই আমার মনে প্রথম দোলা দিল ; নতুন করে নতুনভাবে বলতে হবে। গতানুগতিক পথে নয়। লিখলাম 'মৃত্যু অনেক'। *উত্তরণে* ছাপা হলো। আগের গল্পটা আর কোথাও ছাপিনি। ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।

বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে থাকতে থাকতে ড. দেবের সঙ্গে জ্যোতিপ্রকাশের সম্পর্ক আরো গভীর হলো। চিরকুমার নিঃসন্তান ড. দেব তাঁকে নিজের কাছে টেনে নিলেন ছেলের মতো। সেই থেকে তিনি ড. দেবের কাছেই আছেন। জ্যোতিপ্রকাশের ভাষায় : তিনিই এখন আমার সব। তাঁর পরিচয়েই আমার পরিচয়। আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই।

ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারের পর থেকে অর্থনৈতিক চিন্তাটা তাঁকে রেহাই দিয়েছে। কিন্তু মানসিক অস্বস্তিবোধ পীড়িত করেছে সারা ইউনিভার্সিটি জীবনটা। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন। আমি আর তার কারণ তাঁকে জিগ্যেস করিনি। পাছে তিনি অপ্রস্তুত হন। আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। স্ত্রী পূরবী দত্ত, গল্প লেখেন পূরবী বসু নামে। এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

: পূর্ব পাকিস্তানের পঞ্চাশের দশকের গল্পকারদের সাথে পরবর্তীকালের আপনাদের মৌলিক পার্থক্যটা কী ?

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে থাকলেন। একটু সময় নিয়ে ভাবলেন। তারপর বললেন—

: পঞ্চাশের লেখকরা পুরনো valuesগুলোকে নিয়ে তাদের লেখায় নাড়াচাড়া করেছেন, পরবর্তীকালে লেখকরা ঠিক পুরনো মূলবোধগুলোকে পুরোপুরি অস্বীকার করল না ; কিন্তু সেগুলোকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না ভেবে বরং নতুন নতুন valuesগুলোকে সংযোজন করেছে। আর একটা ব্যাপার হলো যে, আমাদের এখানকার পঞ্চাশের গল্পকাররা মোটামুটিভাবে চল্লিশের গল্পকারদের প্রিয় যে পথ সমাজবাদ, সেই পথকেই অনুসরণ করেছেন। অতিরিক্ত রাজনীতি ও সমাজ-সচেতনতা তাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে জীবনের আর সমস্ত দিকগুলোর দিকে তাঁরা দৃষ্টি দেননি। কিন্তু তাঁদের পরবর্তীকালে যারা এল তারা জীবনের ঐ surface-এর নিচে যে আরো কিছু আছে বা থাকতে পারে তা প্রথম দেখল। আমার মনে হয় পঞ্চাশের গল্পকারদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এটাই। আর তাছাড়া চল্লিশের বাংলা সাহিত্য fail করেছে, বিদ্রোহ যা হয়েছিল তা তিরিশে এবং বিকাশ ঐ তিরিশেই, চল্লিশের যুগ completely failure।

: আপনার প্রথম বই *দুর্বিনীত কাল* এর গল্পগুলোর তুলনায় *বহে না সুবাতাসের* গল্পগুলো সরল এবং হার্দ্য। বই দুটির অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো সমসাময়িক কালের লেখা। অথচ পাঠকমহলে যেগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য, ধূসর এবং কুয়াশাচ্ছন্ন বলে পরিচিত সেই গল্পগুলো নিয়ে প্রথম বইটা প্রকাশ করলেন কেন ?

: দেখুন, '৫৯ সাল থেকে যখন সিরিয়াসলি গল্প লেখা শুরু করলাম তখন থেকেই মনে একটা জেদ ছিল যে কনভেনশনাল গল্প লেখার চেয়ে না লেখাই ভালো, লিখতেই যদি হয় নতুন কিছু লিখব এবং সব সময় এই ইচ্ছাটা আমার মনে কাজ করে। সেই জন্যেই আপনি আমার যে গল্পগুলো পাঠক মহলে দুর্বোধ্য বা কুয়াশাচ্ছন্ন বলে অভিযুক্ত বললেন, সেগুলো দিয়েই প্রথম সংকলনটি প্রকাশ করেছিলাম। বই বেরুতে চারদিক থেকে গুঞ্জন উঠল এসব নাকি আদৌ গল্প হয়নি ইত্যাদি... ইত্যাদি ...।

কাজেই তাড়াহুড়ো করে অপেক্ষাকৃত সরল গল্পগুলো দিয়ে দ্বিতীয় সংকলন বার করলাম।

: তাহলে আপনি মনস্থির করতে পারছিলেন না কোন ধরনের লেখাগুলো শেষ পর্যন্ত stand করবে, তাই নয় কি ?

আমার বই
পুনরায় প্রকাশ এক হও

~ www.amarboi.com ~

: না, ঠিক তা-ও নয়।

একটু থামলেন। রাত বাড়ছিল। সোয়া দশটার সময় গেছি। আগের দিন যাওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। পরদিন তিনি আমেরিকা যাবেন জার্নালিজমের ওপর পড়াশোনা করতে। আরো একবার গিয়ে ব্যক্তিগত কারণে ফিরে এসেছিলেন। আবার যাচ্ছেন দীর্ঘদিনের জন্যে। স্বদেশের শেষ রাত। আমি এক মূর্তিমান আপদের মতো বসে আছি। খারাপ লাগছিল। বেচারা তখনো খাওয়া দাওয়া করেননি। স্ত্রী পূরবী বসু ঘুরঘুর করছেন। মাঝে মাঝে চেয়ারে এসে বসছেন। আমাদের পরস্পরের আলাপ শুনছেন, আবার উঠে যাচ্ছেন। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল। মায়াও হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই।

: না, তা নয়— গল্পকার কথা শুরু করলেন, আমি তো বলেছি যে এক ধরনের গল্প আমি লিখব না, নতুন নতুন পথ খুঁজে আমার লেখায় বৈচিত্র্য আনব। আমি চিন্তা করি কত ভাবে গল্প লেখা যায় এবং সে জন্যে আমাকে একেকটি গল্প লিখতে ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়। আমি তো মনে করি গল্পকাররা কবিদের চেয়ে এদিক দিয়ে অনেক বড়। কবিতার চেয়ে গল্প লেখা অনেক 'টাফ' কাজ, তাই না ? আপনি তো গল্প লেখেন, আপনার তো ধারণা আছে।

: ইদানীং আপনার গল্প abstract হয়ে যাচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। আর আপনার গল্পে কখনো কখনো যে দার্শনিকতা থাকে তা ঠিক গল্পে ধারণ করতে পারে না। আপনি কী বলেন ?

: আমি বুঝি না মানুষ একথা কেন বলে। কবিতার কাছ থেকে আমরা এত কিছু দাবি করছি। কবিতায় abstract ফর্ম, আরো নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন নতুন উদ্ভাবন ঘটছে অথচ গল্পের ব্যাপারে আমরা ভীষণ সনাতন পন্থী। গল্পের গায়ে কোনোমতে হাত দেয়া যাবে না। সেখানে একটি নিটোল গল্প থাকতেই হবে। এ দাবি আমি মানতে মোটেই রাজি নই। এমন হলে তো গল্প কবিতার কাছে মার খেয়ে যাবে। আর আমার গল্পে যে দার্শনিকতার কথা বললেন, ওঠা ঠিক দার্শনিকতা নয় এবং আমার ধারণা আমার গল্প ধূসর বা কুয়াশাচ্ছন্ন নয়।

: বিদেশি কোন লেখকের লেখা আপনার ভালো লাগে ? আপনি কি কোনো বিদেশি লেখকের দ্বারা নিজেকে influenced বলে মনে করেন ?

: আমেরিকান লেখক ট্রুম্যান ক্যাপোট আমার প্রিয়। তাঁর গল্পে এমন একটা জিনিস আছে যা আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় না, মনে হয় যেন যা দেখতে পাচ্ছি তার নিচে, surface-এর তলায় কোথাও যেন একটা মিষ্টি নদী বয়ে যাচ্ছে। ট্রুম্যান ক্যাপোটকে আমার ভালো লাগে, আমার প্রিয় লেখক, কিন্তু তাঁর দ্বারা আমি influenced নই। আমি নিজের মতো করে আমার কথা বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজকের সাহিত্য জগতে নতুন একটি চিন্তা প্রসার লাভ করছে existentialism, এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী ; বাংলা সাহিত্যে এই চিন্তার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বলতে গেলে একমাত্র ধারক অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা কেমন লাগে ?

প্রবল অনীহার সাথে জ্যোতিপ্রকাশ বললেন existentialism বা অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে আমার কোনো বক্তব্য নেই। ওসব ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাই না। কোনো Philosophy-র যূপকাষ্ঠে নিজের সাহিত্যকে আমি বলি দিতে নারাজ। তবে অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখার আমি অত্যন্ত মুগ্ধ পাঠক। সেটা তাঁর চিন্তাগত দিকটার জন্যে নয়, তাঁর লেখায় কী আছে জানি না এবং কেনই যে আমায় তিনি এত মুগ্ধ করেন তা-ও জানি না, তবু আমার মনে হয় তাঁর লেখায় এমন কিছু আছে যা বাংলা সাহিত্যে আর কারুর ভেতর নেই। তিনি অনন্যসাধারণ, অপূর্ব। তাঁর সাথে কারুর তুলনাই হয় না।

: আপনাদের পরবর্তীকালে, আজকের যারা তরুণতম গল্পকার তাদের সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা ? আপনি কি মনে করেন এদের কেউ কেউ আপনার দ্বারা influenced ?

: আজকে যে সমস্ত তরুণ আমাদের সাহিত্যে এসেছেন তাঁরা আহামরি কিছু না লিখলেও আমি মনে করি তাঁদের ভেতর অনেকেই প্রতিশ্রুতিশীল এবং তাঁদের অনেকেরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আর আমার লেখার দ্বারা এরা কেউ প্রভাবিত কি না বলে যে প্রশ্ন করলেন সে সম্বন্ধে আমি বলব, হ্যাঁ, তাদের কারুর কারুর লেখায় আমার লেখার ভাব, এমনকি হুবহু লাইন পর্যন্ত লক্ষ করি। তবে এটাই শেষ কথা নয়, তাঁরা ভবিষ্যতে ভালো লিখবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

: আপনায় তৃতীয় গল্পের বই *সিতাংশু তোর সমস্ত কথা* ক'দিন নাগাদ বেরুচ্ছে ?

: সে আর বলবেন না। ম্যানস্ক্রিপ্ট দিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলাম, সে-ও তো আজ দু'বছর হতে চলল। এখন আমার আর উৎসাহ নেই। এতে lingering করলে কি আর উৎসাহ থাকে ! ওদের যা খুশি করুক আমি আর কিছু বলব না। কেমন আহত শোনাল তাঁর স্বর।

: আপনার এ বইয়ের গল্পগুলোর সঙ্গে অন্য দুটোর পার্থক্যটা কী ;

: *সিতাংশু তোর সমস্ত কথার* গল্পগুলো আমার আগের বই দুটোর পরবর্তীকালের গল্পগুলো দিয়ে সাজানো। এই বইয়ের গল্পগুলো আত্মবাচনিক ভঙ্গিতে লেখা। আমার দ্বিতীয় বই *বহে না সুবাতাস*-এর চেয়ে ভিন্ন। বরং *দুর্বিনীত কাল*-এর সগোত্রীয় না হলেও, কাছাকাছি।

আমার বই
মুনিরাদ প্রাইভেট এক ছ

~ www.amarboi.com ~

: গল্প তো আপনি বহুদিন থেকেই লিখছেন, উপন্যাসে হাত দেয়ার ইচ্ছা আছে ? উপন্যাস লিখবেন না ?

: হ্যাঁ, উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আছে। তবে কথা কি জানেন, ভয় হয়, কারণ আমার লেখার ধাঁচ তো আপনার জানা আছে। বড় কম কথা থাকে, মোটেই বড় করতে পারি না, হাসান আজিজুল হক তো বলেন, এক লাইন বর্ণনা দিতেও নাকি আমার ভীষণ আলস্য। আসলে তা-ই, আর সে জন্যেই ভয় হয় বড় ক্যানভাসে কাজ করতে আমি কি পারব ; তবু আশা রাখি আমি উপন্যাস লিখব। আর এই কম কথা বলার স্বভাবটা হয়েছে আমার চেখভের লেখা পড়ে, ওই তিনি যে বলেছেন, যে লাইনটা সবচেয়ে প্রিয় মনে হচ্ছে সেটাই কেটে দাও, যা লিখবে তার চেয়ে বেশি যা মন্দ লেখা তা কাটবে। এ কথাটা আমার ভেতর এমন বদ্ধমূল হয়ে বসেছে সেই প্রথম থেকে যে এখন আমার উপন্যাসে হাত দিতেই ভয় হয়। হাসান আজিজুল হক এ ব্যাপারে দক্ষ, এত সুন্দরভাবে vividly বর্ণনা দেয়, গল্পকে detail-এর ভেতর নিয়ে যায়... আমার খুব ভালো লাগে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে দেখেছি অনেকবার ড. দেবের কোয়ার্টারের লনে, গেটে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির বারান্দায় হেঁটে যেতে। কিন্তু তিনিই যে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত একথা তখনও জানতাম না। জানলাম আরো পরে।

তখন শীতকাল। ঠাণ্ডা তেমন নেই। সন্ধে পেরিয়ে অন্ধকার রাতের দিকে পা বাড়িয়েছে। ভিকটোরিয়া পার্কের কাছে একটি বুকস্টলে আমরা ক'জন দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হাসছি, সিগারেট টানছি, কেউ কেউ পত্রিকা দেখছি, একজন প্যান্ট পরা ভদ্রলোক হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন।

: কী ফিরোজ সাহেব, কেমন আছেন ?

: আরে আপনি ! বন্ধুর সোৎসাহ উক্তিতে ফিরে তাকালাম ভালো করে। অন্যান্য লেখক বন্ধুরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে আলাপ শুরু করল। কৌতূহলী হয়ে এক বন্ধুকে কানে কানে জিগ্যেস করলাম, 'ভদ্রলোক কে' ; বন্ধু বলল, চিনিস না, জ্যোতি, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত... গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত।

অবাক হয়ে দেখলাম। আরে, এ লোককে তো ঢাকা শহরে কতবার দেখেছি, সকাল দুপুর সন্ধ্যায়। অথচ ...

: হাঁটতে হাঁটতে বাংলাবাজারের বিউটি বোর্ডিঙে এলাম। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন : ওহ্ বহুদিন পর এলাম এখানে।

চা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আলাপ চলছে। আমেরিকার কথা, (আমেরিকা থেকে ফিরেছেন সবেমাত্র) তাঁর অভিজ্ঞতা, আপনজনদের ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার দুর্বিষহ নিঃসঙ্গতার ব্যথা, স্বদেশের একটি চিঠি পাবার সীমাহীন আকুলতা। পাশের টেবিল থেকে কানাডা ফেরত আর্টিস্ট বন্ধু ইয়াকুব কথায় যোগ দিলেন।

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আমি চুপ। চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছি। কোণঠাসা অবস্থায় বসে বসে কথা শুনছি। অই আমার এক বদ স্বভাব, কোনো অপরিচিত মানুষের সাথে আলাপ করিয়ে না দিলে কথা বলতে পারি না। যেচে পড়ে আলাপ করা আমার হয় না। ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। বন্ধুদের সামাজিক জ্ঞানের অভাব দেখে মনে মনে ফায়ার হচ্ছি। সেই সঙ্গে আমার স্বভাব অনুযায়ী ভদ্রলোকের গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি, বিভিন্ন মুদ্রা লক্ষ করছিলাম। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত চাঁছাছোলা, ঝরঝরে, ভদ্রলোক বেশ চৌকস table talker, কথা বলার ধরন ধারণ থেকে শুরু করে সবকিছুতেই একজন টিপটপ modern youngman-এর ছাপ। আমি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম এই ব্যক্তিই সেই 'কেষ্ট যাত্রা'র লেখক। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিকীতে* গল্পটা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। ক্লাস নাইন কি টেন-এ পড়ি 'কেষ্ট যাত্রা'র সুখেন আর কেষ্ট বাবু আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। তারপর জ্যোতিপ্রকাশের প্রকাশিত প্রায় সব গল্পই পড়েছি, পড়ছি এবং সাহিত্যগুণ বিচারের কেষ্ট যাত্রার চেয়ে আরো উৎকৃষ্ট গল্প তিনি লিখেছেন সত্যি ; কিন্তু কেন জানি না জ্যোতিপ্রকাশের 'কেষ্ট যাত্রা' তাঁর লেখা সমস্ত গল্পের ভেতর আজো আমার সবচেয়ে প্রিয়। গল্প পড়ে তখনই মনে হয়েছিল লেখক অত্যন্ত কাছাকাছি থেকে জীবনকে দেখেছেন, এ গল্প তাঁর ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। পরে তার অন্যান্য গল্প পড়ে এ ধারণা দৃঢ় হয়েছে আমার। আর সে জন্যেই আমি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বলেছিলাম : আপনার গল্প পড়ে আমার মনে হয় গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আপনার নিজের জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি উঁকি দেয়। উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন ... আমার গল্পে যে চরিত্রটি সবচেয়ে বেশি suffer করছে দেখবেন, সেটাই আমি।'

এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে ১৩৭২ সালের পৌষ-চৈত্র সংখ্যার *সমকালে* 'পাঠকের প্রতিক্রিয়া'য় আমাদের এক তরুণ কবি তাঁর গল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় মন্তব্য করেছিলেন : 'আসল কথা হলো জীবনবোধ এবং ঐখানটায় যদি কারো ঊনতা থাকে, তবে আর কারো কিছু বলার নেই।' কথা ক'টির ভেতর কেমন প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল। আজ হাসিও পায় লজ্জাও লাগে। 'জীবনবোধ' কথাটা আজকে আমাদের সাহিত্যের বাজারে যেন একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন শিল্পীকে না জেনে কত সহজেই আমরা মন্তব্য করে বসি।

আলাপ করতে করতে রাত বারোটা প্রায়। ওঠা দরকার। কথা শেষ করে বেরিয়ে এলাম। স্বল্পালোকিত বারান্দার অন্ধকারে জ্যোতিপ্রকাশ হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন করতে করতে বললেন : সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। যাচ্ছি, অন্তত তিন বছরের আগে তো আর দেখা হচ্ছে না।

~ www.amarboi.com ~

গলার আওয়াজে কেমন বেদনা ঝরল। একটু থেমে হালকা হবার জন্যে আবার হাসতে হাসতে বললেন : এসে দেখব আপনারা তখন সব বড় বড় লেখক হয়ে গেছেন।

বললাম : ওখানে গিয়ে লেখা কিন্তু বন্ধ করবেন না।

: না, না, লিখব, আর এই তিন বছর যদি না লিখি তাহলে আমি তো পাঠক মহলে মরে যাব। এদেশে একজন লেখক তিন বছর না লিখলে তো মানুষ আর তার কথা মনেও রাখবে না।

কেমন বিষণ্ন আর অভিমানী শোনাল কথাটা। তারপর দূরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বললেন : লিখব, লেখা আমি ছাড়ব না।

রাতের রমনা তখন আলো আঁধারিতে মাখামাখি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারের ঘোড়সওয়ার

'চুপ করে থাকে সবাই। মা বাপ সন্তান চুপ করে থাকে। আগুনে কাঠের চ্যালা পোড়ে, পটপট শব্দ হয়। ধীরে ধীরে আবার কথা বলে মন্তাজ আলী। মনোহর বোষ্টমের গানের কথা বলে, ধান নিয়ে আধিয়ার কিষাণের কথা ওঠে। মহাজন সেদিনও এমনি করেই মেরেছিল। মহাজনরা চিরকাল এমনি করে মারে।

হাসান আলী বুড়োর বুকের ভেতর আশঙ্কা দুলে ওঠে। আশঙ্কা দোলে—কিন্তু সেই সঙ্গে স্মৃতি সোচ্চার হয়।

কহিস না বাপ উকথা কহিস না। বড় ডর করে। সোনাডাঙ্গার কান্দরে মানুষ তো নয়, মানুষের বান। বেশুমার আধিয়ার কিষাণ, কুন কুন মুলুকের মানুষ কেহ জানে না। কহিস না বাপ উকথা, কেহ শুনে ফালাবে। কুন আধিয়ার কিষাণ আর উকথা কহে না। কিষাণের বড় সাধের কথা উসব, বড় মমতার কথা। অক্ত কি গো, অক্তের বান বহে গেল। গুলি আর লাঠির কী আওয়াজ। রহিম শেখ মরে রহিল। সান্তাল পাড়া জ্বালায়ে দিলে আগুন লাগায়ে। মানুষের মুখের আওয়াজ তো নহে, যেন আসমানের ঠাটা। মানুষের মাথার মগজ আইলের ধারে ধারে চান্দের আলোত চকচক করিলর রাত ভর। আর শুনিস না বাবা।

ভয়ে শিউরে ওঠে হাসান আলী। তবু বলে যায়। নির্জন কুয়াশা ঢাকা অন্ধকার রাত, স্মৃতি কিন্তু ভয় পায় না, কেবলই মুখর হয়। কথা তো নয় যেন গান। মন্তাজ আলী বাচ্চা ছেলের মতো দুহাতের ভাঁজে ঘাড় গুঁজে কান পেতে শোনে। মায়ের ভাঙাচোরা মুখে আগুনের শিখার প্রতিফলন কাঁপে। হাওয়া বইছে, উত্তরের হিম বয়ে আনছে সে হাওয়ায়। আগুনের আলোয় দেখা যায় বাচ্চাটা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর কিছু নয়, চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে শুধু সেই রক্তের আর কান্নার গল্পের স্রোত এবং নবজাত গোবৎস জেগে থাকে মন্তাজ আলীর চোখের সম্মুখে।'

'৬৮ সালে প্রকাশিত 'নবজাতক' গল্পে অবাক বিস্ময়ে দেখলাম আর এক শওকত আলীকে। তারপর 'না কান্দে মা', 'থির আসমান'। পঞ্চাশের আলাউদ্দিন

~ www.amarboi.com ~

আল আজাদদের রচনায় যে প্রবাহের ঊর্মিল উত্তালতা দেখেছিলাম (এবং অবশেষে যা যৌনতার পাঁকের সাথে compromise করল) শওকত আলী সেই মরাগাঙে আবার জোয়ান কাটালের উদ্দামতা দেখতে চাইছেন।

অথচ মজার ব্যাপার যে, পঞ্চাশের তরুণরা যেখানে এসে শেষ হলেন, শওকত আলী একদিন সেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। রঙ্গিনী, দিগন্ত রেখা, কুলায় প্রত্যাশী, ডাইন, জানোয়ার, বিকলাঙ্গ পিপাসা-য় যে অন্ধজলের ঘূর্ণি পাক খায় তা ছাড়া শওকত আলীকে যেন কল্পনাই করা যায় না।

সেই শওকত আলী আমাদের দারুণভাবে নাড়া দিলেন আটষট্টির শেষ প্রান্তে এসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, গণমানুষের বিক্ষোভ আর বিদ্রোহের চিত্র যেখানে তিনি আঁকছেন সেখানেও দেখি সেই আদিম আন্ধারের কীট আনাগোনা করে, তার গল্পের টুঁটি চেপে ধরে। এই অনাবশ্যক সেক্স তার প্রায় গল্পে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, বিকলাঙ্গ এবং স্থান বিশেষে হাস্যকর রকম দুর্বল, চটুল এবং সস্তা করে দিয়েছে।

অথচ পূর্ব পাকিস্তানের কথাসাহিত্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার গল্পে জীবনের বিপুল পৃথিবী ছায়া ফেলে।

বলা যাক, শওকত আলীর বড় বিত্ত—অভিজ্ঞতা। সারা উত্তর বাংলার জীবনের ওপর তাঁর বিপুল দখল।

নানা ঘাত সংঘাতের ভেতর দিয়ে তাঁকে বড় হতে হয়েছে। সেই সাথে আহরিত হয়েছে টুকরো টুকরো জীবনের অসংখ্য নিটোল, কোণছেঁড়া, ধূসর, রুক্ষ, রক্তিম ছবি। সেই সঙ্গে পরিবেশ আর প্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ছায়া ফেলে তাঁর লেখায়। যদিও প্রথম দিকের রচনায় সমরেশ বসুর প্রভাব তীব্রভাবে লক্ষ করি, তথাপি আমার মনে হয় তাঁর গল্পকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাব (বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র যেখানে তিনি আঁকেন) যে, প্রকৃতি এবং পরিবেশ রচনার ব্যাপারে তিনি সেই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একজনের স্বগোত্রীয়—তিনি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। বাংলা সাহিত্যের এই ঈর্ষণীয় ব্যক্তিটি যেমন চারপাশের পরিবেশকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন শওকত আলীর লেখা আজ নানা রকম বাঁক, মোড় নিলেও এই ঝোঁকটা এখনো প্রবলভাবে বিদ্যমান। এবং এটা তার রচনার একটি বড় ঐশ্বর্যও বটে।

স্মর্তব্য যে, ওই একটি বিষয় ছাড়া শওকত আলীর সাথে তাঁর কোনো মিল নেই। যদিও শ্রীনন্দী সেক্সের ওপর মূলত লিখেছেন, এক সময় তাঁকে মর্বিড লেখক বলে বহু ধিক্কৃত হতে হয়েছে, অথচ তাঁর লেখায় যে সেক্স আসে, তাকে কোনো সময়ই imposed মনে হয় না, অনাবশ্যক মনে হয় না, কিংবা হালকা। তা থাকে লেখার সাথে মিশে এবং সে লেখা অশ্লীল নয়—নিগূঢ় সৌন্দর্য দর্শনের।

~ www.amarboi.com ~

শওকত আলীর শক্তির ওপর কোনোরকম সন্দেহ প্রকাশ করছি না, (তিনি সহস্রবার নমস্য, সে ধৃষ্টতা আমার যেন না হয়) তবু আমি বলব, যে সব স্থানে তিনি সেক্সকে আনেন (অনেক সময় অনাবশ্যকভাবে) সে সব জায়গায় মনে হয় যেন লেখক কত খোলাখুলিভাবে তার বর্ণনা দেবেন সে জন্যেই ব্যস্ত, গল্পের আবহ তাতে নষ্ট হোক সেদিকে খেয়াল নেই আপাতত। এবং অধিকাংশ সময়ে সে সব জায়গার বর্ণনাও অত্যন্ত কাঁচা হয়। ফলে তা হয়ে ওঠে হালকা এবং জোলো।

তবু তিনি জীবনের নিবিড় এবং অন্তরঙ্গ চিত্রকর। জীবনকে ফাঁকি দিয়ে ভাসাভাসা ধারণাকে আশ্রয় করে, একটি কথাও লেখেননি। দুটি তীক্ষ্ণ চোখ এবং একটি সহানুভূতিশীল মন নিয়ে তিনি জীবনকে পড়েন। তাঁর গল্পের চরিত্রাবলি কোনো আদর্শবাদের প্রচারক নয়। তারা মানুষ—লোভ-লালসা, ঈর্ষা, হিংসা, ঘৃণা-ভালোবাসা, সুখ-দুঃখে গড়া সাধারণ মানুষ। প্রবৃত্তির তাড়নায় দিশেহারা মানব সন্তান। আভরণহীন দগদগে জীবন থেকে উঠে এসে হাসে, কাঁদে, ভালোবাসে, ঘৃণা করে, অপরাধ করে, অনুতপ্ত হয়, হিংসা, ঈর্ষা আর লোভের আগুনে জ্বলে, মারে, মার খায়, মরে।

কিন্তু এদের প্রতি লেখকের কী অসীম দরদ ! প্রতিটি চরিত্রকে আঁকেন গভীর সহানুভূতি নিয়ে।

তার গল্পের প্রধানতম উপজীব্য : প্রেম। নরনারীর অন্তর্গত রক্তের গভীরে যে কথা কানাকানি করে ফেরে তিনি তাকে ধরে রাখেন। অত্যন্ত প্যাসনেট। প্রতিদিনকার অস্থির আর সমস্যা জর্জরিত জীবনের ধূসর রুক্ষতা দাঁত বার করে থাকে না সেখানে। আসলে আগাগোড়া তার মেজাজটাই রোম্যান্টিক। ফলে কিছুটা Sentimental, এবং আবেগপ্রাবণ।

শালবন, পটুইয়ের মাতাল করা গন্ধ সাঁওতাল জীবন, বেপরোয়া ট্রাক ড্রাইভার, বিপন্ন মধ্যবিত্ত, উত্তর বাংলার মোহনীয় প্রকৃতি, দিনাজপুর অঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে আসে, সেই প্রথম দিক থেকে লক্ষ করে আসছি। স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন পড়েছি 'চৈত্র মেঘ', 'চিতা', 'পুশনা', 'রঙ্গিনী', 'অপত্য' (পরে নামকরণ করা হয় : 'ফাগুয়ার পর'), 'তৃতীয় রাত্রি', 'কুলায় প্রত্যাশী'। (এবং আজো লক্ষ করি উত্তর বাংলার পটভূমিতে যখন তিনি লেখেন সেখানে তাঁকে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ মনে হয়।)

আলাপ হলো জগন্নাথ কলেজে এসে। অ্যাডভান্স বাংলার স্বল্প কটি ছেলে। আলাপ হয় সহজেই। পরিচয় গড়ে উঠল ধীরে ধীরে। অবসর সময়ে গল্প হয় বাংলা ডিপার্টমেন্টের ছোট্ট রুমটায় বসে। (এমনও দিন গেছে যখন বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত একটানা আড্ডা দিয়েছি)। বিভিন্ন বিষয়ের আলাপ। সাহিত্যের কথা, ব্যক্তিগত জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কাহিনী।

~ www.amarboi.com ~

দিনাজপুরের জীবন যাত্রা, পাল-পার্বণ, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের খুঁটিনাটি, তাদের বিশ্বাস, কুসংস্কার, প্রকৃতি, মানুষ জন, 'কালমেঘে'র ভয়ংকর দুফুরু মিয়া ; কানা চৌধুরী, ঠাকুরগাঁ বাসস্ট্যান্ডের ফজল খান— এমনি কত মানুষ। লোভী, ভয়ংকর, উদ্দাম, দুঃখী, অসহায় মানুষ, ছবির মতো আসে, দিনের পর দিন।

সেই বৃদ্ধ সাঁওতাল সর্দারের কথা : সি দিনটা আবার কবে আসবে বাবু ? তেভাগা আন্দোলনের গল্প শোনাতে শোনাতে বুড়োর রক্তে দোলা লাগে : লড়াইটা আর হবে নাই ; সি দিনটা আবার কবে আসবে বাবু ;

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বাংলার অধ্যাপক। সন্তানের পিতা : মিশুক এবং আলাপী। কোনো কোনো সময় হঠাৎ কেমন নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন, অনেক সময় সেটা রীতিমতো চোখে লাগার মতো। প্রথম দর্শনে তাঁকে রাগী দুর্বিনীত মনে হয়েছিল। পরে অনেককেই সে কথা বলতে শুনেছি। যদিও তিনি মোটেই সে রকম নন।

উন্নত নাসা, অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ চোখ, শ্যামলা, লাবণ্যময় average বাঙালির মতো লম্বা লোকটা কোনো দল বা গোষ্ঠী গড়ে নিজের ঢাক ঢোল পেটাননি। তিনি নিঃসঙ্গ। তার কোনো দল নেই, সাহিত্যে আদর্শের নামে গোষ্ঠী বা দল গড়ার জন্যে লড়াই করেননি, কিন্তু নিঃশব্দ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন সাহিত্যের জন্যে।

সাম্প্রতিক তরুণদের গল্প যেন আত্মজৈবনিক, শওকত আলীর গল্প তেমন নয়। হাসান আজিজুল হকের মতন মানুষ আর প্রকৃতি নিয়ে যে চারপাশের জীবন, তিনি তাঁদের কথকতা শোনান।

এই প্রসঙ্গে হায়াৎ মামুদের কথার প্রতিধ্বনি করি : 'এই পরিশ্রমী, অবঞ্চক, বিবেকবান ব্যক্তিটিকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। তাঁর গল্প তথাকথিত আধুনিক নয় হয়তো, কিন্তু দৃপ্ত বিশ্বাস ও স্থির প্রতিজ্ঞায় সর্বদা জ্বলছেন ; এলিট নয়, সমগ্র জনগণকে ধারণ করে আছেন চৈতন্যে।'

প্রশ্নোত্তর

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে জনজীবনকে ঘিরে সাহিত্য রচনার যে প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : কল্লোল যুগের লেখকরা সাধারণ জনজীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা কোনো বিশেষ মতবাদ প্রচারের জন্যে সাহিত্য করেননি, সে বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যগত। শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, যুবনাশ্ব— এরা সবাই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে নতুন কিছু করবার নেশায় এ সমস্ত করেছেন। জীবনকে পুরোপুরিভাবে জেনে তার গভীরে গিয়ে দেখেননি। চল্লিশের যুগের লেখকরা মার্ক্সীয় দর্শনকে গল্পের ভেতর প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। সেখানে

~ www.amarboi.com ~

জীবনের চেয়ে থিসিস-থিওরিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বেশি। তাঁদের গল্পে অভাব, দুঃখ, দুর্দশা, মন্বন্তর, এ সমস্তই এসেছে সত্যি, কিন্তু তা শুধু করুণা উদ্রেক করেই হারিয়ে গেছে। বলিষ্ঠ কিছু দিতে পারেনি। এর কারণও ওই একটি : জীবনকে গভীরভাবে দেখবার অভাব। একমাত্র মানিকবাবু কিছু কাজ করেছেন যা স্মরণীয় ; কিন্তু তা-ও শেষপর্যন্ত পরিপূর্ণতা পেল না।

জগন্নাথ কলেজের বাংলা ডিপার্টমেন্টের ভেতর হার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি ছোট্ট রুমটায় বসে আলাপ হচ্ছিল। বাইরে এতক্ষণ নির্বাচনী প্রচারের যে শ্লোগান চলছিল এবার তা উত্তাল হয়ে উঠল। আওয়াজটা কমে এলে প্রশ্ন করলাম : আচ্ছা, আপনি তো পঞ্চাশ এবং ষাটের মাঝামাঝি সময়ে সাহিত্যে এসেছেন, এঁদের দুদলের সাথে আপনার কি কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে ; থাকলে সেটা কোথায় ?

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবলেন। তারপর—দেখো, আমাদের এখানকার পঞ্চাশে যারা গল্প লেখা শুরু করেছিলেন তাঁরা জীবনের ওপরের চেহারাটা দেখেছেন, ভাসাভাসা ধারণাকে আশ্রয় করে লিখেছেন। তাঁদের লেখায় লড়াইয়ের কথা, স্বাধিকারের কথা ইত্যাদি সব আছে ; কিন্তু জীবনের গভীরে গিয়ে তার ভেতরের চেহারাটাকে বুঝতে চেষ্টা করেননি, লেখার ভেতর অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। আমি যা করেছি তা হলো কোনো বিশেষ মতবাদকে জোর করে আমার লেখায় Impose করতে চাইনি। জীবন যেমন, তাকে আমি যেভাবে দেখেছি, আমার চোখে যেভাবে ধরা পড়েছে, সেভাবে লিখতে চেয়েছি, কোনো কিছু ধারণা করে নিয়ে লিখিনি। সাম্প্রাতিক কালের তরুণরা, হাসান আজিজুল হক এবং জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বাদে, আমার মনে হয়, জীবনকে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে দেখছেন না। একটা শব্দ বা বাক্যকে নিয়ে যে সময়টুকু ব্যয় করেন সেই পরিমাণে জীবনের দিকে নজর দিচ্ছেন না। শব্দ এবং আঙ্গিকের মারপ্যাঁচে আধুনিক হতে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন।

—তাহলে কি আপনি বলতে চান আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই, Flatly গল্প বলে জীবনকে তুলে ধরলেই কি একজন গল্পকার দায়িত্ব শেষ করলেন। এই মুহূর্তে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' গল্পটা ধরুন, তার ভেতর দারিদ্র্য, দাঙ্গা, যৌনতা এবং আনুষঙ্গিক সমস্যা—যা আপনার গল্পেও থাকে, মানে, একেবারে নিম্নবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা, অথচ কনভেনশনাল পথে Flatly গল্প না বলে তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসিক টেকনিকে গল্পটা বলেছেন, তথাপি তা আঙ্গিকসর্বস্ব তো হয়ইনি বরং ওই টেকনিকে গল্পটি বলেছেন বলেই তা এত ভালো লাগে। অথচ ওই গল্পটিকেই

আমার বই
পুনিকান প্রাইভেট এক হও

~ www.amarboi.com ~

গতানুগতিক ধারায় লিখলে আমরা একটি ভয়ংকর সুন্দর সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হতাম।

: না, আমি সে কথা বলছি না, আমি বলছি লেখক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন, কিন্তু তা থাকবে লেখার সাথে মিশে একাকার হয়ে, বাইরে থেকে তা স্পষ্ট হয়ে থাকবে কেন ; তার চিহ্ন প্রকট হয়ে চোখে ধরা পড়বে কেন ? অথচ আমাদের তরুণদের গল্প টেকনিক এবং শব্দসর্বস্ব হয়ে যাচ্ছে, প্রশ্ন আমার সেখানেই।

—ইদানীং একটা কথা বেশ জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে : গণসাহিত্য। গণসাহিত্য বলতে আপনি কী বলেন ?

: যে সাহিত্যে জনগণ এবং দেশকাল সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয় তাকেই আমি বলব গণসাহিত্য। গণসাহিত্য বলতে যে ধারণা সাধারণভাবে ব্যক্ত হচ্ছে তা আসলে সাহিত্যগতভাবে যথাযথ নয়।

—গণসাহিত্য সৃষ্টির জন্যে কি প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা উচিত ? চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে সেখানকার পুরনো সাহিত্যকে বুর্জোয়া সাহিত্য বলে বর্জন করা হচ্ছে বলে শোনা যায়, এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী ?

: চীনে আদৌ এমন কোনো কিছু হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের যা ঐতিহ্য তাকে অস্বীকার করব না। যেমন কালিদাস কিংবা ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে এমন অনেক কিছু আছে যা আপাত দৃষ্টিতে খারাপ লাগতে পারে ; কিন্তু তা বলে তাকে আমরা বর্জন করতে পারি না। আমাদের সাহিত্যের গতিধারার সাথে এর যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য ; কিন্তু এমন কিছুকে আমরা অবশ্যই আমাদের ঐতিহ্য বলে গ্রহণ করব না আদৌ যা আমাদের ঐতিহ্য নয়, বাৎসায়নের *কামসূত্র* নিশ্চয়ই আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য নয়। আমার জনগণ যাতে বিভ্রান্ত না হয় সেদিকে আমার অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

—ইদানীং আপনার গল্প নতুন দিকে মোড় নিয়েছে, 'নবজাতক'-এর মতো গল্প আজ আপনি লিখছেন, অথচ তখনো এ জীবন ছিল তা সত্ত্বেও এ ধরনের গল্প আপনি পূর্বে একটিও লেখেননি। এর কারণ কী ?

: আমি তো বলেছি কোনো কিছু ধারণা করে নিয়ে আমি কিছু লিখিনি। তখন আমি জীবনের যে রূপ দেখেছি, তাকে এঁকেছি। এখন আমি দেশের মানুষ এবং পরিবেশের ভেতর একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি। তারা কিছু একটা করে ফেলতে চাইছে। আমার চোখে দেখা মানুষগুলোর এই পরিবর্তন আমাকে নতুন করে ভাবাচ্ছে, নাড়া দিচ্ছে, কাজেই আমার লেখায় তার প্রতিফলন ঘটবে এ আর বিচিত্র কী !

–আপনার লেখায় সেক্স ঘুরে ফিরে আসে। অনেক সময় অযৌক্তিকভাবে আসে। আমার মনে হয় তা আপনার শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

: আমি যাদের নিয়ে লিখেছি, যাদের দেখেছি, তাদের ভেতর পেটের ক্ষুধা এবং যৌন ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল। যৌনজীবনটা তাদের কাছে এক উত্তেজনাকর বিষয়। এ জন্যে তাকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্যে অমন জ্বালাময় বর্ণনা থাকে আমার লেখায়।

—তবু আমার মনে হয় অনেক গল্পে তা অপ্রাসঙ্গিকভাবে এসে যায়।

এ কথায় তিনি আর কোনো উত্তর দিলেন না।

কথা প্রসঙ্গে জানালেন (এ সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগেও শুনেছিলাম) তিনি একই সঙ্গে দুখানি উপন্যাসে হাত দিয়েছেন। উপন্যাসের জীবন-প্রবাহ নগরকেন্দ্রিক। আমি বললাম : উত্তর বাংলার জীবন আপনার গল্পে অত্যন্ত নিবিড় এবং আন্তরিকভাবে আসে, এবং তা সম্ভব হয়েছে ওখানকার পরিবেশ, প্রকৃতি এবং মানুষ সম্পর্কে গভীরভাবে জানাশোনার ফলে। আপনি ওই পটভূমিতে উপন্যাস লিখুন।

: হ্যাঁ, সে বিষয় আমি চিন্তা করছি। উত্তর বাংলার জীবনের ওপর আমি উপন্যাস লিখব।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ধূসর উনিশশো তেষট্টিতে তাঁর প্রথম এবং একমাত্র উপন্যাস *পিঙ্গল আকাশ* প্রকাশিত হয়েছিল। লক্ষ করেছি উপন্যাসটির কথা উঠলেই তিনি কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে প্রবলভাবে হাত নেড়ে বলেন : আরে ওই বইটার কথা আর বোলো না, অত্যন্ত কাঁচা লেখা, ওটা যে আমার লেখা এ কথাটাই আমি ভুলতে চাই, ওটা আসলে কিছু হয়নি।

সাহিত্য পুরস্কার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : সাহিত্যের জন্যে প্রাইজ লেখকের পক্ষে ক্ষতিকর। সামগ্রিকভাবে একজন লেখকের লেখা বিচার করে যখন তাঁকে প্রাইজ দেয়া হয় সেটা চলতে পারে ; কিন্তু একটা বিশেষ বই-এর ওপর প্রাইজের ফলে হয় কি লেখক স্বাধীনভাবে লিখতে পারে না, যারা প্রাইজ দেবেন, সেই বিচারকমণ্ডলীর মুখ চেয়ে লিখতে হয় ; ফলে তা ফরমায়েশি লেখার পর্যায়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ! তারপর প্রতিযোগিতার মতো তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিল্পী হিসেবে তিনি কী কী অসুবিধে অনুভব করেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আমরা যারা লিখছি, আমাদের দেশে সবাই কোনো না কোনো চাকরি করছি, করতে হচ্ছে, ফলে অধিকাংশ সময় আমরা সাহিত্যের জন্যে দিতে পারি না। তারপর ধরো প্রকাশের ব্যাপারটা, আমি যা বলব তা প্রকাশ করতে পারছি না, নানারকম ঝামেলা। এইসমস্ত সমস্যা একজন লেখককে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিদেশি লেখকদের মধ্যে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এবং আলবেয়ার কামু তাঁর প্রিয়। সাহিত্যে এঁদের কলাকৌশলগত দিকটা তাঁকে আকৃষ্ট করে।

Existentialism সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন Existentialism-কে সাহিত্য থেকে বাদ দেয়া যায় না, আমরা দিন দিন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠছি, চারপাশের পরিবেশ অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে দেয় জীবন থেকে।

বললেন : আমার সাহিত্যে আমি কোথাও সচেতনভাবে অস্তিত্ববাদ আনিনি।... একটা প্রবাহ আসছে কিছুদিন পর আবার এটা না-ও থাকতে পারে।

এ ব্যাপারে তিনি খুব একটা আগ্রহ বা অনীহা দেখালেন না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অফুরন্ত অন্ধকারে মরাচাঁদ

পল্লবীর নির্জন কোণে ছিমছাপ ড্রয়িংরুমে তখন দেশ, সমাজ, সময়, পৃথিবীর ছায়া ফেলেছে। ঘরের ভেতর ফ্যান ঘোরে। বাইরে উজ্জ্বল আলোয় দেয়ালে ঝকমক করে, কাইয়ুম চৌধুরীর অয়েল পেন্টিং। অন্য কারুর আর একটা অয়েল পেন্টিং এবং ওয়াটার কালারও রয়েছে এপাশে মাঝখানে তারা বসে রয়েছে আর তার ভেতর জল থইথই দিশেহারা বাংলাদেশ, আতঙ্কিত মুখ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, মারী করাল হয়ে দোলে। সব কিছু কেমন গম্ভীর আর ক্লিষ্ট হয়ে আসে।

ঢোলা আদ্দির পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা লাবণ্যময় ভরাট ফর্সা মুখ, কালো ফ্রেমের চশমার ভেতর একজোড়া সুন্দর চোখ। গভীর এবং তন্ময়। লম্বা বেশি নন— আবার বেঁটেও নন, মাঝামাঝির চেয়ে অবশ্য কিছু কম মনে হয়। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, সামান্য কথায় হেসে ওঠেন এবং সে হাসি ভেতর থেকে কেমন চাপা শব্দে বেরিয়ে আসে কাঁধের দুপাশ কাঁপিয়ে। সেই মানুষ তার সুমুখে বসে তখন কথা বলছেন মৃদু কণ্ঠে। চোখ-মুখে কখনো বেদনার ছায়া ঘনিয়ে আসে। কথা বলতে বলতে মনে হয়, কী যেন ভাবছেন। হয়ত দেশ, কাল, সমাজ, মানুষ, হতাশা, বিষাদ, অনিশ্চয়তা। পঞ্চাশের যুগের সেই অনেক স্বপ্ন দেখা তরুণ গল্পকার বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সত্তর সালে বসে বোধহয় হিসাব মেলাচ্ছেন। সময় গড়িয়ে গেছে অনেক দূর পারিপার্শ্বিকের গায়ে প্রগতির হাওয়া লেগেছে অনেক কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা বিপুল ক্লান্তি জমে উঠছে বাইরের জঙ্গম পৃথিবীটার ভেতরে কোথায় যেন স্থবিরতা অটল হয়ে রয়েছে।

দীর্ঘক্ষণ আলাপের পর কায়েস আহমেদের মনে হলো তিনি প্রতি মুহূর্তে কী যেন একটা খুঁজছেন। মনে হলো তিনি সুদূর আর নির্জন। আপন ভুবনে তিনি একা। একা এবং বেদনার্ত। কিন্তু কোনোকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন নন। চারপাশের সব কিছুকে গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন। চলমান পৃথিবী তাকে প্রতিনিয়ত নাড়া দিচ্ছে। অথচ তিনি নিঃসঙ্গ। কিন্তু তাঁর এ-নিঃসঙ্গতার জন্ম নাস্তি থেকে নয়। মনে হয় স্বপ্ন আর বাস্তবের নিরন্তর দ্বন্দ্বে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন। তাঁর গল্পের নায়ক ডায়রিতে লিখছে : শিল্পীর জ্ঞান দিয়ে সময়কে আমি বুঝতে চাই। সময় যেসব

~ www.amarboi.com ~

ঘটনায় গাঁথা, তার স্বরূপ আর জিজ্ঞাসা আমার কাছে যেন গভীরভাবে উন্মোচিত হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতা তো তাকেই বলে যার অন্য নাম আত্মজ্ঞান, নিজের ও মানুষের সম্পর্কে। মানুষ যতদূর অবধি মুক্তি পেতে পারে, ততদূর মুক্তি জীবনে যেন সত্য হয়ে ওঠে। কোন বইতে পড়েছি লক্ষ্য থাকলেই চলবে না, লক্ষ্যে তাকানোর ক্ষমতাও সঙ্গে চাই। ('অবিচ্ছিন্ন')

কায়েস আহমেদের মনে হয় গল্পকার বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের মনোগঠনে, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি শিল্পীসত্তা তার আপন ভুবন উন্মোচিত করেছে এখানে। অভিজ্ঞতার অপর নাম যাঁর কাছে আত্মজ্ঞান, তিনি অন্তর্মুখী হতে বাধা, কিন্তু পলায়নবাদী তিনি নন, কারণ মানুষের মুক্তি চিন্তায় তিনি উন্মুখর। এবং এই দুই কারণেই পারিপার্শ্বিকের ঘাত-সংঘাত বিস্তৃত সমাজপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেয় না, তা দেখি তাঁর গল্পের কোনো বিশেষ চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের ফাঁকে উঁকি দিতে।

'অবিচ্ছিন্ন', 'দূর দূরান্ত' ঘটনায় গাঁথা সময়ের স্বরূপ আর জিজ্ঞাসা উন্মোচনে তাঁর অবিরাম অন্বেষার স্বাক্ষর। আর তাঁর সাম্প্রতিক 'বিশাল ক্রোধ' তো শুধুমাত্র কতকগুলো মৌল প্রশ্ন। গল্পের পাত্রপাত্রী আমাদের পরিচিত জগতেরই নামধারী মানুষ কিন্তু মনে হয় তাঁরা যেন এক একটি মূর্তিমান প্রশ্ন। গল্পকার বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তাদেরকে সামনে রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উত্তর নিতে চেষ্টা করছেন। কখনো চরিত্র নয়, গল্পের সামগ্রিক অবয়বটাই প্রশ্ন।

পঞ্চাশের যুগে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য আধুনিকীকরণের ঊষালগ্নের কনিষ্ঠতম যুবরাজ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের এই নবলব্ধ প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে কায়েস আহমেদকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বরং শঙ্কিত করে, তিনি বুঝি এবার চোরাবালিতে পথ হারাবেন। যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই সত্যের খাতিরে বলতে হয় তাঁর ভাষা কেমন কৃত্রিম আর দুর্বল। তবে পূর্বোক্ত বক্তব্যের পুরাবৃত্তি করে সে বলে, কিছু একটা খুঁজছেন তিনি। সেটা যেমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, তেমনি তাঁর গল্পে।

২.

পল্লবীর আকাশে তখন দুপুরের রোদ। জানালার বাইরে চারপাশের ঝিমধরা সবুজ আর হলুদে সেই রোদ আলপনা আঁকে। এবং তখন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরকে সে জিজ্ঞেস করে : সাহিত্য চিন্তার দিক দিয়ে আপনাকে আলাউদ্দিন আল আজাদের সমধর্মী বলা হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে আপনি কী বলেন ;

: দেখুন সবচেয়ে বড় সমস্যা কি জানেন, আমাদের এখানে এখনো উপযুক্ত সমালোচনার ক্ষেত্র গড়ে ওঠেনি। ফলে এমন বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে

~ www.amarboi.com ~

হয়। কবে হয়ত কোনো সময় কেউ একটা মন্তব্য করল সেটাই প্রচলিত হয়ে যায়।

কেন অমুক অমুকের সমধর্মী তার কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় না। কথাটাকে আরো স্পষ্ট করে বলছি, যেমন ধরুন বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারের অনুবাদটা, তার ভূমিকায় বোদলেয়ারকে বুদ্ধদেব বসু যেমন করে আঁকতে চেয়েছেন ঠিক সেভাবে দেখিয়েছেন ; কিন্তু বোদলেয়ার যে কী তীক্ষ্ণ রাজনীতি সচেতন ছিলেন, বিভিন্ন লেখায় আর্ট সম্পর্কে তাঁর যে মারাত্মক ধরনের কথাবার্তা রয়ে গেছে বুদ্ধদেব বসু তার ধার কাছ দিয়েও যাননি।

আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং আমি পরস্পর বন্ধু, এক সঙ্গে ওঠা বসা করেছি। কাজেই এই সমস্ত মন্তব্যের পেছনে সে কারণটাও হয়ত কাজ করেছে। তাছাড়া একই সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার ভেতর লেখা শুরু করেছি, পরস্পর ওঠা বসা এবং আলোচনা হয়েছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের উভয়কেই দোলা দিয়েছে, কাজেই পরস্পরের লেখায় তার ছায়া পড়তে পারে।

এই পর্যায়ে জনান্তিকে কায়েস আহমেদ বলে নিতে চায়, পূর্ব পাকিস্তানের গল্প এবং কবিতায় আধুনিকীকরণের প্রথম সূত্রপাত পঞ্চাশে। গল্পে এ যুগের ত্রয়ী অগ্রনায়কের (আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর) মধ্যে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ মোহান্ত।

আলাউদ্দিন আল আজাদ শ্রেণি সংগ্রাম ও নিষ্ঠুর বাস্তবকে তাঁর গল্পে প্রত্যক্ষভাবে ধরতে চেয়েছেন। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের গল্পে এ জগৎ ছায়া ফেললেও তিনি প্রকরণের দিক দিয়ে অধিকতর আধুনিক এবং জীবনের অপরাপর মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের জগৎ মানুষের চেতন-অবচেতনের বহুমুখী জটিলতায় আকীর্ণ। মননের দিক দিয়ে জনাব হক রোম্যান্টিক। ভাষা তাঁর কাব্যময় এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে তীক্ষ্ণ।

—শিল্পের সঙ্গে মানবতার এবং সমাজের কী সম্পর্ক ?

: প্রশ্নটা বহু পুরনো এবং জটিল, এ সম্পর্কে বহু বাদানুবাদ হয়েছে, আজো হচ্ছে, কথা হলো কি জানেন, এ দুটোর মধ্যকার ব্যবধান এত সূক্ষ্ম যে এর পার্থক্য নির্ণয় করা এক দুরূহ কাজ। যিনি শুধু সমাজের কথা বলবার জন্যেই সাহিত্য লিখছেন তিনিও সাহিত্যগতভাবে সত্যবাদী নন আবার যিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থেকে শুধু শিল্পের জন্যেই শিল্প বলেন তাঁরাও সত্যবাদী নন। আমি আগেই বলেছি জিনিসটা খুব সূক্ষ্ম। সাহিত্যের কতকগুলো সাধারণ নিয়ম আছে সেগুলো মেনে নিয়েই সবকিছু করতে হবে, এবং এই নিয়ম যেমন বুদ্ধদেব বসুও মানেন তেমনি কড়া মার্ক্সিস্ট বিষ্ণু দে-ও তা মেনে নিয়েই সাহিত্য করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের এখানে গত দশ বছরের একটানা দোর্দণ্ড শাসনের মধ্যে ৬০-এর দশকের তরুণ যাঁদের বলা হয়ে থাকে তাঁদের ভেতর এমন একটা চেতনা লক্ষ করা যায় যে, পঞ্চাশের লেখকরা রাজনীতি নিয়ে বেশি মাতামাতি করেছেন আমরা তা নই। লেখক কারু কাছে দায়ী নয় একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া। এ চেতনার জন্ম ওই যে বললাম, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব, কিন্তু এখন অন্যরকম একটা পরিবর্তন আসছে না কি ? একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, জ্যোতিপ্রকাশ দত্তর 'পুনরুদ্ধার' গল্পটা ধরুন, চারপাশে যখন ঘেরাও আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে গল্পটা তখন প্রকাশ পেল, তারপর আরো উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কলাকৈবল্যবাদের কথা যিনি বর্তমানে বেশ জোরেশোরে বলছেন সেই আবদুল মান্নান সৈয়দের একটা নাটিকাতেও ঘেরাও আন্দোলনের কথা অসচেতনভাবে হলেও এসে গেছে এবং খুবই স্বাভাবিক, কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাবিকে কোনো শিল্পীই অস্বীকার করতে পারেন না।

—গল্প লেখার সময় কি আপনি টেকনিকের কথা আগে ভাবেন না গল্পই আপনার টেকনিককে নিয়ন্ত্রিত করে ?

এমন সময় বাইরে গাড়ির শব্দ থমকে গেল। তিনি অপেক্ষা করতে বলে উঠে গেলেন, অল্পক্ষণ পর এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাসহ তিনি ফিরে এলেন আবার। আমি বসে আছি। ওঁদের সঙ্গে কথা শুরু করলেন। সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়। আবার বন্যা, স্বদেশ, সমস্যা ফিরে ফিরে আসে। এবং আমি বসে থাকি। বেলা বাড়ছে, সঙ্গে ঘড়ি নেই কিন্তু বুঝতে পারি এখন দুপুর। ঝড় বৃষ্টি চিন্তা করে সকালে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু পুরনো ঢাকার শেষ মাথা থেকে পল্লবী আসা যে কী ব্যাপার তা টের পাওয়া গেল। এক সময় তাঁরা বিদায় নিলেন। বন্যার অবস্থা দেখতে বেরিয়েছিলেন গাড়ি করে। যাবার পথে পরিচিতজনের সঙ্গে আলাপ করে গেলেন।

আবার আলোচনা শুরু হলো। সেই ফ্যানঘোরা ঘর, দেয়ালে অয়েল পেন্টিং, ওয়াটার কালার, সোফাসেট, পুতুল, চেয়ে থাকল তেমনি

প্রশ্নের জের টেনে বললেন : না, এক একটা গল্প এক একটা অবস্থা বা চিন্তার ফল, কাজেই গল্পের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন টেকনিক আসবে, এটা নির্ভর করে গল্পের ওপর।

—অ্যাবস্ট্রাক্ট গল্প যদি 'ডি লোকালাইজড' হয় তাহলে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের অ্যাবস্ট্রাক্ট গল্পের গুণগত পার্থক্য কীভাবে ঘটে ?

: অ্যাবস্ট্রাক্ট গল্প বলতে আপনি যদি বিষয়হীন গল্প বুঝিয়ে থাকেন তাহলে বলব, তা যতই বিষয়হীন হোক না কেন এক দেশের গল্প অপর দেশে অনূদিত হলে মূল দেশটির ছায়া তাতে কোথাও না কোথাও পড়তে বাধ্য, চেখভের এমন অনেক বিষয়হীন গল্প আছে, কিন্তু তা আমাদের ভাষায় অনুবাদ হলে আমাদের

~ www.amarboi.com ~
একটুও বুঝতে অসুবিধে হয় না এটা বিদেশি গল্প। কাজেই পার্থক্য বিচার সেভাবেই এসে যায়।

—ইদানীংকার গল্প সম্পর্কে বিতর্ক উঠেছে, আমাদের গল্প কবিতা আক্রান্ত হচ্ছে, এ সম্পর্কে আপনার কী অভিমত ?

: কোনো নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতাকে গল্পের আশ্রয় নিয়ে চালিয়ে দেয়ার মানে গল্প নয়, যে বক্তব্য কবিতায় আমি বলতে অক্ষম তার আশ্রয় নিশ্চয় গল্প নয়।

—গল্প কি ছবির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে ? আপনার গল্পে যে রঙের প্রাধান্য দেখা যায় তা কি ছবিরই প্রভাব ? এবং তা যদি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এর দ্বারা আপনি কী বোঝাতে চান ?

এ প্রশ্ন গল্পকারকে উৎফুল্ল করে তুলল বলে মনে হলো। তাঁর চোখ মুখে তখন কেমন একটা উৎসাহ আর খুশির ভাব ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। তিনি নড়েচড়ে বসলেন। দেয়ালে টাঙানো ছবিরা যেন চোখ বড় করে কান খাড়া করে শুনতে লাগল।

: প্রথমত, যিনি ছবি আঁকেন তিনি যদি গল্প লেখেন তাঁর গল্পে ছবির প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, আমার নিজের ব্যাপারে যদি বলেন তা হলে বলব আমি ছবি ভালোবাসি, ছবি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করি, পরিচিত শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে বহুদিন থেকে ওঠা বসা আলাপ-আলোচনা করছি, কাজেই তার প্রভাব আমার গল্পে পড়া স্বাভাবিক। হ্যাঁ, আমার গল্পে আমি বিশেষ অর্থেই রঙের ব্যবহার করি। আমি ছবি আঁকি না, চিত্রশিল্পীর কাছে যেমন রং আমার কাছে তেমনি ভাষা, এই ভাষার সীমাবদ্ধতায় আমি বন্দি, অনেক সময় আমার বক্তব্য যখন ভাষার সীমাবদ্ধ পরিধির ভেতর প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না তখন আমি রঙের আশ্রয় নিই। ভাষার এই সীমাবদ্ধতা ভেঙে দিয়ে রঙের মাধ্যমে আমার বক্তব্যকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।

—হালের বাংলা ছোটগল্পে যে জটিলতা এসেছে সে কি সময়ের পরিবর্তনের ফলে যে মানসিক অভিজ্ঞতা পরিবর্তন ঘটে গেছে তার জন্যে হয়েছে মনে করেন, না গল্পকার তাঁর গল্পে প্লটের দীনতা ঢাকবার জন্যে তা করছেন ; কিংবা এই দুর্বোধ্যতা কি তার অক্ষমতারই নামান্তর ?

: প্রথমে দুর্বোধ্য কথাটিকে স্পষ্ট করে নিই তারপর আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরে আসছি। ধরুন, যিনি ছবি আঁকেন বা সাহিত্য করেন তিনি আঁকা বা লেখা শুরু করার আগে চারপাশের দিকে তাকান না, তিনি প্রথমে দৃষ্টি দেন তাঁর পূর্ববর্তীদের সৃষ্টির দিকে। নতুন যিনি আসেন তাঁর সব সময় চেষ্টা থাকে পূর্ববর্তীদের থেকে ভিন্নভাবে তিনি সৃষ্টি করবেন। ফলে অনেক সময় তাঁর এই প্রচেষ্টা অনুকূল সমর্থন পায় না। প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে তিনি যেহেতু

~ www.amarboi.com ~

নতুনভাবে কিছু করতে না বলতে চাইছেন কাজেই এ ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। কারণ আমরা প্রত্যেকেই প্রচলিত অভ্যাসের দাস।

তারপর সমস্ত পৃথিবী আজ আমাদের নাড়া দিচ্ছে। বিভিন্ন দেশের নতুন নতুন চিন্তাধারা, শিল্প প্রকরণের নতুন নতুন প্রচেষ্টার সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি টি. এস. এলিয়ট বলেছেন, একজন শিল্পীর কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁর ঐতিহ্য এবং এ কথা সত্য যে একালের লেখক কোনো সময়ই গণ্ডিবদ্ধ পরিধির ভেতর সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। স্বাধীনতা উত্তরকালে এখানকার সাহিত্য কী রকম হবে, ইসলামি হবে না Secular হবে তা নিয়ে তুমুল হইচই হয়েছে ; কিন্তু আমরা যারা সে সময়ে সাহিত্যে এসেছিলাম তারা তো তিরিশের ঐতিহ্য ধরেই যাত্রা শুরু করেছি এ সমস্ত উদ্ভট চিন্তা আমাদের স্পর্শও করেনি।

আপনার প্রশ্নের আর একটা অংশের উত্তরে বলতে হয়, কেউ যদি অনাবশ্যকভাবে জটিলতা সৃষ্টি করে নতুনত্বের নামে নিজের অক্ষমতা ঢাকতে চান, তাহলে তা কখনো সমর্থনযোগ্য নয়।

—বিদেশি কার কার গল্প আপনার ভালো লাগে এবং কেন ? তাঁদের গল্প কি আপনাকে প্রভাবিত করে বলে আপনার মনে হয় ?

: বিশেষ করে কার নাম বলব। বিভিন্ন লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। আমি আগেই বলেছি সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টির আগে প্রত্যেকেই তাঁর পূর্ববর্তীদের সৃষ্টির সাথে পরিচিত হয়। শুধু পাশ্চাত্য কেন, বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তীদেরও প্রভাব থেকেও আমি মুক্ত নই এবং তা সম্ভবও নয়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেন তারা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই লিখছেন।

—আমাদের তরুণতম গল্পকারদের লেখা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?

: তরুণদের সম্পর্কে আমি সব সময় আশাবাদী তাঁরা ভালো লিখেছেন, যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন। তবে তাদের কারু কারু ভেতর যে অহংবোধ আছে, আমরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এ কথা ঠিক নয়। আমাদের ভেতরও এমনি একটা ধারণা ছিল যে আমরা ঢাকায় বসে তিরিশের সাহিত্য থেকে ভিন্ন একটা আন্দোলনের সূত্রপাত করেছি। আজ দেখছি একথা সত্য নয়, আমরা পূর্ববর্তীদের আন্দোলনকেই আরো আগিয়ে দিয়েছি মাত্র এবং একথা বর্তমান তরুণদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁরা নিঃসন্দেহে ভালো লিখছেন ; কিন্তু ভিন্ন কিছু নন বা পূর্ব প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্নও নন।

—Surrialism-এর প্রথম প্রকাশ ঘটে বিদেশি চিত্রকলার মাধ্যমে এবং তা ছিল গোষ্ঠীগত আন্দোলন। পরে একই উপায়ে তা কবিতা ও গল্পেও আসে। ইদানীং বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের এখানকার কারো কারো রচনায় এর প্রকাশ ঘটছে ; এ সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য ?

আমার বই
পুনরায় প্রকাশ এক হও

~ www.amarboi.com ~

: দেখুন আমাদের এখানে সবকিছু লাফ দিয়ে এগুচ্ছে, ধারাবাহিকতা নেই। এখানে এখন যে সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে আমরা নতুন মনে করছি, বিদেশে তা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

Surrialism-এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ফরাসি চিত্রকলায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সারা পশ্চিমকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। সমস্ত প্রাচীন মূল্যবোধ, বিশ্বাস নিদারুণভাবে ভেঙে পড়ল। চার পাশের সেই চরম অবক্ষয়ের ভেতর বড় বড় কেতাবি কথায় আর কাউকে ধরে রাখা যাচ্ছিল না, এই পটভূমিতে বিদ্রোহ হলো Impressionist-দের বিরুদ্ধে, Academic Education বর্জন করলেন কতিপয় শিল্পী। তাঁরা বললেন, সামনে যা দেখা যাচ্ছে সেটাই সত্য নয়, এর আড়ালে যা লুকিয়ে রয়েছে এবং নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে তাকে উদ্ধার করতে হবে। এভাবে জন্ম নিল Surrialism বা পরাবাস্তববাদ।

আমাদের এখানে এখন সেই প্রবাহ এসে নাড়া দিচ্ছে অথচ মজার কথাটা কি জানেন, তৎকালে যাঁরা Surrialism-কে সাহিত্যে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা কলাকৈবল্যবাদের বিরুদ্ধে একে একটি প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এদের ভেতর আমরা পাই পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ প্রমুখ কবিদের। আর আমাদের এখানে যারা Surrialism-এর আশ্রয় গ্রহণ করছেন তারা কলাকৈবল্যবাদ প্রচার করছেন। অর্থাৎ ঠিক উলটো। এর কারণও আছে, যেহেতু তাঁরা বাইরের সংঘাত থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখবেন কাজেই নিজের মনের কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে এবং শেষপর্যন্ত Surrialism-কে তাঁদের একমাত্র আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করছেন।

—গল্প রচনা করতে গিয়ে কি কোনো সময় আপনি Existentialism সম্পর্কে চিন্তা করেছেন ? আমাদের দেশজ পরিবেশে এর কি কোনো প্রত্যাসন্ন ভবিষ্যৎ আছে ?

: Existentialism-এর উদ্ভব ঘটে এক বিরুদ্ধবাদী চেতনা থেকে। এবং তা হলো Christianity-র বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিবাদ ইয়োরোপীয় জীবনের যে অবক্ষয় আর নৈরাশ্য যুদ্ধ পরবর্তীকালে দেখা দিল সেখানে ধর্মীয় কোনো বিশ্বাস মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারল না। কিন্তু আমাদের দেশে এ অবস্থা আপনি কল্পনা করতে পারেন ? আমি আমার 'দেয়াল' গল্পে এর ওপর আলোকপাত করেছি। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ইবরাহিম তাঁর ছেলে ইসমাইলকে খোদার নির্দেশে কোরবানি করতে যান। অথচ তিনি যখন নিজের সন্তানকে কোরবানি দিচ্ছেন তখন বলছেন, আমি তোমায় শুধু আল্লার নামেই নয়... সেই সঙ্গে আমার পূর্ববর্তী সমস্ত দেবদেবীর নামে কোরবানি দিচ্ছি। কিন্তু এ সত্য যদি আপনাকে বিশ্বাস করতে হয় তাহলে আমাদের প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় একবার কল্পনা করুন। এবং এ কথা আপনি যদি আপনার সাহিত্যে গ্রহণ করেন

~ www.amarboi.com ~
তা হলে আমাদের এই সমাজে আপনার কী অবস্থা হবে ? তাহলে সত্য কী ? আপনি যা বিশ্বাস করছেন তা প্রকাশ করতে পারছেন না, কেননা পারিপার্শ্বিক অবস্থা আপনাকে ক্ষমা করবে না। অথচ আপনি সেই সত্যকে প্রকাশ না করতে পারলে নিজের কাছে Insincere থেকে যাচ্ছেন। সুতরাং আপনি নিজেই কল্পনা করুন আমাদের এখানকার পরিবেশে এর কতটুকু সফলতা আপনি আশা করেন।

আলাপ শেষ হলো অবশেষে। দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষ করতে হলো গল্পকারের সঙ্গে। তারপর বিশ্রাম। এক সময় দুপুরও শেষ হয়ে এল। বললেন : এত দূরে থাকি, মানুষকে আবার যে আসতে বলব তার সাহস হয় না। গাড়িতে উঠলাম। নিজেই ড্রাইভ করে পৌঁছে দিতে এলেন। গাড়ি থামল সেই বিপুল জলরাশির সামনে। গাড়ি থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে দিলেন : অনেক কষ্ট ভোগ করলেন আজ। কথায় কেমন আন্তরিকতা ঝরে পড়ল। নৌকোয় উঠলাম। সেই নৌকোও ভেসে চলল এক সময়। তিনি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর পা ফেলে এগিয়ে গেলেন গাড়ির দিকে। চারপাশটা একবার বুঝি চেয়ে দেখলেন। গাড়ি থেকে নেবেই বন্যায় ডোবা পরিপার্শ্ব দেখতে দেখতে তাঁর চোখ মুখে যে কষ্টের রেখা আর বিষণ্ন নির্জনতা দেখেছিলাম, এখন এত দূর থেকে তা দেখা যাচ্ছে না। শুধু দেখছি সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা পরা একটা মানুষ গাড়ির দিকে এগুচ্ছেন। গাড়িতে উঠার সময় কি তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ! কী জানি !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্ষমাহীন বিশ্বের স্থপতি

'হাওয়া লেগে কলাগাছের পাতা নড়ছে—গল্পে এর কি বর্ণনা দেবেন ? '—বন্ধু শাকের চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন হঠাৎ করে, রিকশা তখন ভিকটোরিয়া পার্কের কাছের গির্জা পেরিয়ে লক্ষ্মীবাজারের দিকে মোড় নিচ্ছে। ইংলিশ রোডে মাসিক *বর্ণালী*র অফিসে অভিনয়ের (অভিনয়কুমার দাস) কাছ থেকে ফিরছি। যাব গেণ্ডারিয়া, গেণ্ডারিয়া ঠিক নয়, ফরিদাবাদ পোস্ট অফিসের সামনে, শাকের চৌধুরীর বাড়িতে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এবং হায়াৎ মামুদের সম্পাদনায় প্রকাশিত *কালবেলার* তৃতীয় সংখ্যা সদ্য বেরিয়েছে। এখনো দেখিনি, বাজারেও ছাড়েনি। বর্ণালী অফিসে বসে শাকেরের কাছ থেকেই প্রথম শুনলাম।

সেই উনিশ শো সাতষট্টি সাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন। নতুন দাঁত ওঠা শিশু যেমন যা পায় মুখে পুরে চিবুতে চায়, সাহিত্যের ব্যাপারে আমার তখন সেই অবস্থা। কাজেই *কালবেলা* বেরিয়েছে, হায়াৎ মামুদ শাকের চৌধুরীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তারপর বলতে গেলে এক পাড়াতেই থাকেন, এই মুহূর্তে *কালবেলা* দেখতে হলে শাকের চৌধুরী ছাড়া উপায় নেই। অতএব অভিনয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শাকেরের সঙ্গে চলেছি ওর বাড়িতে।

শাকের বারবার বলছিল, হাসান আজিজুল হকের গল্পের কথা। এবং এখন রিকশায় যেতে যেতে বেমক্কা এমন এক প্রশ্ন— হাওয়া লেগে কলা গাছের পাতা নড়ছে তার কী বর্ণনা দোবো। মুহূর্তেই, বুঝতে অসুবিধে হলো না, *কালবেলায়* প্রকাশিত হাসান আজিজুল হকের গল্পের কোনো বর্ণনাকে স্মরণ করে কথাগুলো বলছে। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম, স্মিত হাসি নিয়ে যেন নিবিড় কোনো সুখকে অনুভব করছে ও তখন। আমার কোনো উত্তর দেবার আগেই ও বলল, হাসান আজিজুল হক এর বর্ণনা দিয়েছেন, 'অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়।'—বলে আবার সেই পরিতৃপ্তির আভা

বাংলাদেশ ই-বুক
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাখানো মুখ নিয়ে আনমনা হয়ে চেয়ে থাকল রাস্তার দিকে। ওর কথায় যেন চমকে উঠল ভেতরটা, সত্যি, ভারী সুন্দর বর্ণনা তো ! একেবারে হুবহু ছবিটা চলে আসে, মনে হয় যেন কলাপাতার দুলুনিটা দেখতে পাচ্ছি।

অবশেষে গল্পটা পড়লাম। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'। লেখক হাসান আজিজুল হক। সেই উনিশশো সাতষট্টি সালের বিকেল, কিন্তু এখানো স্পষ্ট দেখতে পাই : দুহাতের ফাঁকে কোলের ওপর পিজবোর্ডের নীল মলাট লাগানো ফর্মা তিনেকের চটি একটি পত্রিকা— *কালবেলা*। আর আমি বিস্ময় আনন্দ আর টনটন করে ওটা ব্যথার এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে স্তব্ধ বসে রয়েছি।

সেই আমার হাসান আজিজুল হক আবিষ্কার। এর আগে, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত *সাম্প্রতিক ধারার গল্প*তে তাঁর *বৃত্তায়ন* পড়েছি। আর কোনো গল্প নয়। আর তৎকালীন লেখক সংঘের মাসিক পত্রিকা *পরিক্রম*-এর ব্যাক কভারে একটি বিজ্ঞাপন দেখতাম : হাসান আজিজুল হকের গল্পগ্রন্থ : *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য*। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পরে নিজের এই মূঢ়তাকে ধিক্কার দিয়েছি বারবার।

যাহোক, বইটি পড়লাম। তারপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একে একে পড়তে লাগলাম, 'পরবাসী', 'সারা দুপুর', 'অন্তর্গত নিষাদ', 'মারী', 'উটপাখী', 'সুখের সন্ধানে' এবং সেই বিস্ময়কর মহাকাব্যিক গল্প— 'আমৃত্যু আজীবন' ; মানে গল্পগুলো *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* নামের বইটিতে সংকলিত হওয়ার আগেই পড়া হয়ে গেল।

বইটির জন্যে তিনি আদমজি প্রাইজ পেলেন, লোকমুখে শুনি, ভদ্রলোক দর্শনের অধ্যাপক, খুলনার দৌলতপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন, দারুণ আড্ডাবাজ লোক। কখনো শুনি, এই তো কয়েকদিন আগে ঢাকায় এসেছিলেন, 'নাইল ভ্যালী বোর্ডিং'-এ ছিলেন, কেউ বলে, সেদিন হাটখোলার মোড়ে 'রয়েলে' আড্ডা দিলাম তাঁর সঙ্গে পাক্কা চার ঘণ্টা, এমন আড্ডাবাজ লোক দুটো দেখিনি, আর ভদ্রলোক একাই একশো। কামাল ভাই (কামাল বিন মাহতাব) একদিন বললেন, এহঃ, আর একটু আগে এলে হাসান আজিজুল হকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, আমি তোমার কথা বললাম, উনিও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক, জ্যোতিপ্রকাশের ওপর লেখা তোমার সাক্ষাৎকারটা বসে বসে পড়লেন, অনেকক্ষণ ছিলেন।

আমি আর কী বলব। চুপ করে থাকি। এর ভেতর তাঁর একখানা গল্প, 'আততায়ী আঁধার' *ছোটগল্প*-এ ছাপা হয়েছে। গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার বেশ কয়েক মাস আগে *ছোটগল্প*-এ গল্প দেবার অনুরোধ জানিয়ে তাঁকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম আমি। উত্তর পাইনি। শুনেছি চিঠিপত্রের উত্তর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া নিতান্ত দুর্লভ ঘটনা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাহোক, দেখা সাক্ষাৎ আর হলো না। সামনাসামনি, চাক্ষুষ দেখা হলো না ; কিন্তু খবরের কাগজে ছবিতে দেখলাম, ঢাকায় অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখকদের কী যেন এক সভার ছবি, ছবির নিচে ক্যাপশন পড়ে চিনলাম, বলতে দ্বিধা নেই, ভদ্রলোকের ছবি আমার কল্পনার সঙ্গে একটুও মেলেনি। তাঁর 'উটপাখী' গল্পে বর্ণিত লেখকটির মতো 'বেশ মসৃণ, গোল, তৈল চিক্‌কন।' আর হাসিখুশি এবং আড্ডাবাজ তো আগেই শুনেছি। চশমা চোখে গোলগাল হাসান আজিজুল হকের সেদিন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আলাদা করে চোখে পড়েছিল তাঁর নাক, (নাকে ছিদ্র দুটো বেশ বড়, ওপরের দিকে একটু তোলা) ঈগলের ঠোঁটের মতো কিঞ্চিৎ বাঁকানো। এ ছাড়া অতি সাধারণ, নিতান্ত সাধারণ একজন শান্তশিষ্ট পরিতৃপ্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের চেহারা।

দেখা হলো দেশ স্বাধীন হবার পর, সম্ভবত ৭২-এর শেষ দিকের এক সন্ধ্যায়, বাংলা বাজারে, টোনাদার 'পানীয়মে' গিয়ে বসলাম। সেই সন্ধ্যায়ই টের পেয়েছিলাম ভদ্রলোক কী রকম জমিয়ে আড্ডা দিতে পারেন।

এক সময় হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাংলাবাজার পেরিয়ে যাচ্ছিলাম, প্রশ্ন করলাম, উপন্যাস লিখছেন না ; মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটা বড়সড়ো কাজ করুন না !

হ্যাঁ, লিখবার ইচ্ছা আছে, তবে এই মুহূর্তে সম্ভবত লেখা যাবে না, আপনারা কী চিন্তা করছেন এখানে জানি না, তবে আমার মনে হয়, গোটা ব্যাপারটার স্মৃতি এখানো আমাদের ভেতর দগদগে হয়ে আছে, একটা আবেগ গ্রাস করে আছে সব কিছুকে, আরো কিছুদিন গেলে, থিতিয়ে আসার পর মুক্ত মন নিয়ে তখন বোধহয় লিখলে ভালো হয়।

ভিক্টোরিয়া পার্কের মোড়ে গির্জার সামনে থেকে রিকশা নিয়ে চলে গেলেন। কথা ছিল পরে আলাপ হবে। তা আর হয়নি।

সে যাহোক, বিস্তারিত আলাপের সুযোগ এল চলতি বছরের ২০ ফেব্রুয়ারিতে।

২.

হাসান আজিজুল হকের গল্প ধারণ করে আছে দুই বঙ্গের দুটি ভিন্নতর ভূগোল— একদিকে আছে ধূসর, রুক্ষ, বৃক্ষবিরল রাঢ় এবং অন্যদিকে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষা সজল শ্যামল নরম পলির দেশ খুলনা এলাকা।

মানুষ তো বটেই, সেই সঙ্গে সহজীবী নিসর্গ, আবহাওয়া, ঋতু বৈচিত্র্য, আলো আঁধারি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিশে আছে তাঁর গল্পে যে, বর্ণিত চরিত্রাবলি

~ www.amarboi.com ~

থেকে তাকে আলাদা করে ভাবা যায় না, বরং বলা যাক, তাঁর গল্পের চরিত্রাবলি এবং এই প্রকৃতি যেন একে অপরের পরিপূরক।

জন্ম তাঁর পশ্চিম রাঢ়ে, (বর্ধমান জেলার কাটোয়ার মঙ্গলকোট থানার আওতাধীন 'যবগ্রামে' ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে, সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১৯৩৯-এর ২রা ফেব্রুয়ারি) বাল্যকাল কেটেছে সেখানে ৬০/৬৫ জন মানুষের বিরাট পরিবারের মধ্যে।

এমন পরিবার যে, কে কখন খাচ্ছে কি না-খাচ্ছে, কোথায় সারাদিন কোন শিশু কাটাচ্ছে তার খোঁজ নেবারও সুযোগ হয়ে ওঠে না মায়ের পক্ষে। অতএব পিতার সান্নিধ্য পাওয়া তো দূরের কথা, মা'র কাছ থেকে আদর যত্ন পাওয়াও দুর্লভ ছিল।

সঙ্গী-সাথিদের সঙ্গে মুক্ত হরিণ শাবকের মতো শিশু কিংবা বালক হাসান আজিজুল হক ঘুরে বেড়াতেন সারাদিন।

এতে করে আর যাই হোক, লাভবান হয়েছি আমরা, কেননা, এই অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা থেকেই তো শিশুমনে আহরিত হয়েছে মানুষ এবং প্রকৃতি থেকে স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা, পরিণত বয়সে লেখক হাসান আজিজুল হক জন্মগ্রহণ করেছেন এই সমস্ত কিছুকে নিয়েই তো।

হাসান আজিজুল হক বললেন, আমার প্রতিটি গল্প আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো গল্প আমি লিখি না। 'শকুন' গল্পটি (১৯৬০ সালে অধুনা লুপ্ত *সমকাল*-এ প্রকাশিত, এটি তাঁর প্রথম গল্পও বটে) আমার শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে, ঠিক যেমন যেমনটি দেখেছিলাম, হুবহু সেই রকম করেই লিখেছি, গল্পের শুরুতে যেমন এক সন্ধ্যায় কতগুলো ছেলের বসে থাকার বর্ণনা আছে, অমনি করে আমরা বসেছিলাম, অমনি করেই একটা শকুন এসে পড়ে গিয়েছিল আর আমরা হইহই করে তার পেছনে মাঠের ওপর দিয়ে, গ্রামের গলিঘুঁজি দিয়ে অমনি করেই তাড়া করে ছুটেছিলাম এবং গল্পের শেষাংশে যা আছে— ওই রকম ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল।

১৯৫৪ সালে তিনি জন্মভূমি যবগ্রাম ছেড়ে চলে এলেন খুলনার দৌলতপুরে বোন ভগ্নিপতির কাছে (এঁরা এখানে আগে থেকেই ছিলেন)। দৌলতপুরেই তাঁর কলেজ জীবনের শুরু। খুলনায় তিনি চলে এলেন ঠিকই, কিন্তু ফেলে আসা রাঢ়ের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক চুকিয়ে নয়, বছরের দু-তিন বারই তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় ; ১৯৬৩-তে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে সম্পত্তি বিনিময় করে চলে এসে খুলনার ফুলতলাতে বাসা বাঁধলেন।

হাসান আজিজুল হক বললেন, আমার 'উত্তর বসন্তে' নামের গল্পটিতে যে বাড়ির বর্ণনা আছে তা ওই ফুলতলির বাড়ি, এবং গল্পের ভেতর যে খিনখিনে

~ www.amarboi.com ~
বুড়োর কথা আছে তা আমার আব্বার চরিত্র এবং পরিবারের যে কর্ত্রী চরিত্রটিকে দেখানো হয়েছে তা আমার মায়ের ছায়া। পরবর্তী কালের গল্পগুলো, খুলনা এলাকাকে নিয়ে লেখা গল্পগুলো ফুলতলা এবং তার আশপাশের গ্রামের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পের ঘটনা তো ফুলতলার। অমনি একটি মেয়েকে দিয়ে দেহ ব্যবসা করানো হচ্ছে, দেখছি, অনুভব করছি, সেই অভিজ্ঞতা থেকে গল্পটির জন্ম। বুড়ো চরিত্রটি একটু বদল করেছি কেবল, গল্পে বুড়োটিকে 'বাবা' দেখানো হয়েছে আসলে তা না হয়ে ওটা হবে 'মামা'—বাস্তবের সঙ্গে এই যা তফাৎ। 'মারী' নামের গল্পটিও সম্পূর্ণ দেখা অভিজ্ঞতা থেকে।

আর একটা কথা, আমি ঘুরি, সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি, কারুর কোনো আমন্ত্রণ আমি 'মিস্' করি না। বিয়ে কিংবা ঐ জাতীয় কোনো উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পেলাম হয়ত, আজো পাড়াগাঁ, দশ পনেরো মাইলের পথ, অসম্ভব রকমের কাদাপানি, মোটেই সুখকর যাত্রা নয়, কিন্তু আমি সুযোগ ছাড়ি না, এমনি করেই তো দেখা হয়েছে 'আমৃত্যু আজীবন'-এর রহম আলী করম আলীর সঙ্গে। ঐ সব চরিত্র, ঐ সব জীবনযাত্রা তো আছে এদেশে। কী নির্মম বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করে তারা বাঁচে ! আসলে আমি বাংলাদেশ বলতে বুঝি সুবিস্তৃত গ্রাম এবং তার মানুষজনকে। জন্ম আমার গ্রামে, সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর পরিবারে আমার বড় হওয়া, আমার পরিবারের মধ্যে এক চাচা কেবল বর্ধমান শহরে অফিসে কাজ করতেন। তাছাড়া আমার মনে হয়, ঢাকায় বসে ঢাকা শহর-কেন্দ্রিক যে সাহিত্য হচ্ছে তা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে না। আমি মনে করি, একজন লেখককে তার দেশের ভূগোল, তার ইতিহাস, তার মানুষকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হবে।

হাসান আজিজুল হককে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, আপনার দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *আত্মজা ও একটি করবী গাছ*-এ আপনার আব্বাকে উৎসর্গ করে যে লিখেছেন, 'যাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার রৌদ্রে বারবার ফিরে গেছি'—এর মানে কী, কেন আপনি অমন কথা বলেছেন ?

—দেখুন, আমার আব্বা সত্যিই এক বিস্ময়কর চরিত্র আমার কাছে, খুব যে লেখাপড়া তিনি জানেন এমন নয়, রোগাপাতলা বেঁটেখাটো মানুষ, দারুণ দাপটের লোক ছিলেন এক সময়, পাঁচ-দশ গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত মান্যগণ্য ব্যক্তি, খুলনায় আসার আগে পর্যন্ত তিনি বরাবর গ্রামেই কাটিয়েছেন, জমি-জমা দেখাশোনা করেছেন। কিন্তু মানব চরিত্রের ওপর অদ্ভুত তাঁর দখল, সেই সঙ্গে রাঢ় অঞ্চল, তার ইতিহাস, সংস্কৃতি এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর আয়ত্তে যে কী আর বলব, তাঁর চরিত্রে সমস্ত রাঢ়কে ধারণ করে আছেন তিনি ; এবং বলতেও পারেন তেমনি ! বললে হয়ত বাড়াবাড়ি শোনাবে, কিন্তু সত্যিই আমার মনে হয়, যদি লিখতেন

~ www.amarboi.com ~

তাহলে অনায়াসেই তিনি 'তারাশঙ্কর' হতে পারতেন, নিজের বাবা বলে নয়, আমার অন্তত তা-ই মনে হয়। কাজেই, বুঝতেই পারছেন কেন আমি ও কথা আমার বইতে উল্লেখ করেছি।

—আচ্ছা আপনার গল্পে 'মৃত্যু' বারবার ঘুরে ফিরে আসে, কেন, এর পেছনে কি 'দর্শন'-এর কোনো ভূমিকা আছে ?

—গল্প লেখার সময় কিন্তু কখনো সচেতনভাবে তা করিনি, পরে অবশ্য আমারও মনে হয়েছে, আমার অনেক গল্পে 'মৃত্যু' এসেছে ঘুরে ফিরে, আসলে ওসব এসেছে খুব স্বাভাবিক, জীবনকে ভোগ (ব্যাপক অর্থে) করতে করতে, জীর্ণ হতে হতে এক সময় মৃত্যু ঘটেছে ; না, দর্শনের অধ্যাপনা করি বলে নয়। আর তাছাড়া নেতিবাদী দর্শনে আমার কোনো বিশ্বাস নেই, কোনো দুর্বলতা নেই, আমি তার চর্চাও করি না, কোনো আকর্ষণও নেই তার ওপর, আমার আগ্রহ বরং জীবনবাদী দর্শনের ওপর। 'দর্শন' যদি আমার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে থাকে তা জীবনের গভীরে যাওয়ার অন্বেষায়।

'শোণিত সেতু' এবং 'জীবন ঘষে আগুন' নামের গল্প দুটি হাসান আজিজুল হকের এ পর্যন্ত লিখিত গল্পাবলির মধ্যে নানান কারণে বিশিষ্ট এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশভঙ্গি, বিশেষত বক্তব্যের দিক দিয়ে এ দুটি গল্প তাঁর অন্য সমস্ত গল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, গল্প দুটো ১৯৬৯-এ লেখা, ঐ সময়কার অবস্থাটা আমাকে নাড়া দিয়েছিল দারুণভাবে, তার ফলশ্রুতি ঐ দুটো গল্প।

'শোণিত সেতু' গল্পটি সম্পর্কে আপত্তি তুললাম এর সোচ্চারতা সম্পর্কে, তিনি স্বীকার করলেন সে ত্রুটির কথা। 'জীবন ঘষে আগুন' নামের গল্পটি সম্পর্কে তিনি বললেন, এই গল্পে আমি সমগ্র রাঢ়, তার নিসর্গ, তার সংস্কৃতি, সংস্কার, বিশ্বাস, জীবনকে ধরে রাখতে চেয়েছি এবং এর আদিম আলো-আঁধারিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে সেই সময় আমার মনে হয়েছিল বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপটাই এর জন্যে আদর্শ হবে। আমি প্রশ্ন করলাম, 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পটির ভাষার ব্যাপারে কমলকুমার মজুমদারের *অন্তর্জলী যাত্রার* প্রসঙ্গ আসে, এ সম্পর্কে আপনার কী মন্তব্য।

হাসান আজিজুল হক : হ্যাঁ, লেখার পর এমন অভিযোগ বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে উঠেছিল ; কিন্তু সত্যি বলতে কি আমি তখন পর্যন্ত *অন্তর্জলী যাত্রা* পড়িনি। কেবল তাঁর (কমলকুমার মজুমদার) গল্পগ্রন্থ *নিম অন্নপূর্ণা* পড়েছিলাম। যা হোক, *অন্তর্জলী যাত্রা* তারপর পড়ে দেখলাম। পড়ে আমার মনে হল, বিষয় বক্তব্যে তাঁর সঙ্গে আমার গল্প ভিন্ন তো বটেই, সে প্রশ্নই ওঠে না, ভাষার ব্যাপারেও তাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে আমার এ

~ www.amarboi.com ~
গল্পের ভাষা কঠিন, কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে অসুবিধে হয় না। পক্ষান্তরে তাঁর ভাষা দুর্বোধ্য। আমার ভাষাকে সরলীকৃত করা যাবে, কিন্তু তাঁর *অন্তর্জলী যাত্রার* ভাষাকে সরলীকরণ অসম্ভব।

(এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের বক্তব্য বোধকরি সঠিক, কমলকুমার মজুমদারের *অন্তর্জলী যাত্রার* একটি লাইন : ... 'শূন্যতা লবণাক্ত এবং আকাশ অগ্নিময় হইবে।'—পঙ্‌ক্তিটির কোনো সরলীকরণ হয় না ; একে বুঝেতে হবে, উপলব্ধিতে আনতে হবে সর্বোপরি মনের ভেতর চিত্রটিকে টাঙাতে হবে, অন্যথায় এ লাইনের মর্মোদ্ধার সম্ভব নয় এবং সেজন্যে কাহিনীর ধারাবাহিকতার সঙ্গে পরিচিতিও আবশ্যক।)

হাসান আজিজুল হক লেখেন গল্প কিন্তু দৃষ্টি তাঁর ঔপন্যাসিকের। এ কথার সায় মিলবে তাঁর উক্তিতে, 'আসলে আমি চেয়েছিলাম ঔপন্যাসিক হতে, হয়ে গেলাম গল্পকার। আমার প্রথম রচনা কিন্তু গল্প নয়, একটি উপন্যাস, ম্যাট্রিক পাস করার পরপরই লেখা, *মাটি ও মানুষ*, অপুর মতো একটি ছেলের চরিত্র এতে প্রধান, *পথের পাঁচালীর* প্রভাব অত্যন্ত প্রকট ছিল তাতে।

১৯৫৭-এর শেষ দিকে লিখি *শামুক* নামে একটি উপন্যাস। কলকাতার একটি পত্রিকায় মানিক স্মৃতি উপন্যাস প্রতিযোগিতায় লেখা আহ্বান করা হয়। সেই তাগিদে এর জন্ম। প্রায় তিনশোর মতো উপন্যাস নাকি জমা হয়েছিল পত্রিকার দপ্তরে। আমার *শামুক* ছ'-সাতজনের মধ্যে বিচারকের রায়ের অপেক্ষায় থাকলেও শেষপর্যন্ত মতি নন্দীর *নক্ষত্রের রাত* ফার্স্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তা গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়। মতি নন্দী সেদিন এইভাবেই বেরিয়ে এসেছিলেন সাহিত্যে।

১৯৫৭ সাল আর একভাবেও তাঁর জীবনে অত্যন্ত স্মরণীয়, দৌলতপুর কলেজের ছাত্র তিনি, কলেজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি, তুমুল ছাত্র রাজনীতি করেন। অদ্ভুত সব খামখেয়ালিতে গা ভাসানো দিন তখন, কখনো মাথা ন্যাড়া মুখভরতি দাড়ি, কোনো কারণ নেই, স্রেফ খেয়াল, আর তেমনি আড্ডা দিনরাত চলে, রাত জেগে পোস্টার লেখা, হঠাৎ হঠাৎ এখানে ওখানে চলে যাওয়া—এই সব করে সময় কাটে, এমনি সব দিন রাত্রি যখন চলছে তখন এক কাণ্ড হয়ে গেল। খুলনা থেকে দৌলতপুর আসার সময় ট্রেনে এক পাঞ্জাবি মিলিটারি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দৌলতপুর কলেজের কয়েকজন ছাত্রের হয় বচসা ; দৌলতপুর স্টেশনে গাড়ি এলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়... আর যায় কোথায় ! কয়েকশো ছাত্র ক্যাপ্টেনকে এই মারে এই মারে অবস্থা, কলেজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হাসান আজিজুল হক এবং আরো কয়েকজন পরে সে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। এর মাস তিনেক পরে হঠাৎ দেখা গেল কলেজ এলাকার

~ www.amarboi.com ~

চারপাশে সামরিক গাড়ির আনাগোনা। নানান রকম কানাঘুষো চলছে। এমন একদিনে হাসান আজিজুল হক খুলনা যাবেন এক দরকারে। কেউ কেউ তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, তিনি স্টেশনে গিয়ে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলে, তারপর শুরু হয় বেদম প্রহার, 'পাঁচ-সাতজন জওয়ান মিলে অবিরাম কিল ঘুসি লাথি—সে এক অমানষিক কাণ্ড।' হাসান আজিজুল হক বললেন, 'একটা জিনিস হয়ত জানেন না, শরীরের ওপর যখন প্রহার চলতে থাকে তখন এক সময় আর কোনো অনুভূতি থাকে না, আঘাতগুলো আপনার গায়েই পড়ছে কিন্তু আপনি অনুভব করছেন না, ভারি অদ্ভুত লাগে শুনতে, কিন্তু সত্যি তাই।'

তিনি বললেন, এর ফলে তাঁর শরীরে স্থায়ী ক্ষতি হলো, কোমরে ব্যথা এবং অ্যাজমা। এ ঘটনার পর কলেজ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে কলেজ থেকে বের করে দেয়া হলো, তাঁকেও (হাসান আজিজুল হককে) বাধ্য করা হলো কলেজ ছাড়তে, তখন তিনি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। রাজশাহীতে গিয়ে ভর্তি হলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি এম. এ. পাস করেন

হাসান আজিজুল হক বললেন, রাজশাহীতে গিয়ে পড়াশোনার খুব ক্ষতি করেছি, খালি আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছি ওই সময়টা, বরাবরই ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলাম, কিন্তু সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতার জন্য পরীক্ষার ফল খুব ভালো করতে পারলাম না।

এম. এ. পাস করার পর কিছুদিন রাজশাহীর এক কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর কিছুদিন সিরাজগঞ্জের এক কলেজে, অতঃপর দৌলতপুর কলেজে বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন দর্শন বিভাগে। ছাত্রাবস্থায় ইচ্ছা ছিল তাঁর ইংরেজিতে অনার্স পড়ার, কিন্তু দৌলতপুর কলেজে তখন বিভাগটি না থাকার দরুন বাধ্য হয়ে 'দর্শন' নেন।

সে যাহোক, হাসান আজিজুল হক এখন পরিপূর্ণ একজন সুখী, বিবাহিত সংসারী মানুষ। তিনি বললেন, মানুষের অনেক ধরনের ব্যর্থতা থাকে জীবনে, আমার তা নেই, আমি সুখী সেদিক থেকে

বিয়ে করেছেন তিনি নিজের মনোবাসিতাকেই। হাসতে হাসতে বললেন, সে সেই ছেলে বয়েস থেকেই, বুঝলেন না, 'কাফ লাভ' আর কি !

৩

সব শেষের প্রসঙ্গটি হলো তাঁর গল্পবিষয়ক। জীবনকে এমন নির্বিকার, ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় বোধকরি আর কেউ চিত্রিত করেননি গল্পে তাঁর মতো, আর সেই সব চরিত্রের, সেই সব গল্পের জন্মদাতা হাসান আজিজুল হক, অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র,

~ www.amarboi.com ~
সদাহাস্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাজুকও—নিজের গল্পে বর্ণিত চরিত্রাবলি সম্পর্কে বললেন, জানেন, বাস্তবকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে এমন করে লিখেছি, কিন্তু নিজের লেখা গল্পগুলো যখন পড়ি তখন মানুষগুলোর জন্যে আমার চোখের পাতা ভিজে আসে।

স্তব্ধ হয়ে বসে বসে দেখলাম, কথাগুলো বলতে বলতে সেই ক্ষমাহীন বিশ্বের স্রষ্টা হাসান আজিজুল হকের চোখের পাতা থির থির করছে, মুখের ওপর বেদনার পাতলা এক ছায়া কাঁপছে, কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে এল !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট ১ ক

চলে যাওয়া
কামাল বিন মাহতাব

সুশান্ত মজুমদার প্রিয়বরেষু, আপনার নাছোড় চিঠিটা জিয়া হাশান সময়মতোই আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে, এমনকি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন তাগাদা দেয়ার ব্যাপারেও তার উৎসাহ ছিল অফুরন্ত, তবু সিদ্ধান্ত নিতে যে এতটা দেরি করলাম সেটা আমার ত্রুটি। কায়েসকে নিয়ে কোনোরকম লেখালেখি করার ইচ্ছা আমার ছিল না। সে দিনগুলো চুকে-বুকে গেছে, যার কথা মনে পড়লে আজ এতদিন পরেও অস্তিত্বের সংকট তুমুলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়, করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনার পরও সেই প্রসঙ্গ থেকে অব্যাহতি পেলাম না বলে আমার সত্যি খুব কষ্ট হয়েছে। *দৈনিক খবরের* একজন শিফট ইনচার্জও সেদিন রাতে আমার সাথে প্রায় আপনার মতোই নির্দয় আচরণ করেছিলেন। তবে তার জবরদস্তিটা ছিল কর্তৃত্ব ফলানোর অসুস্থ উৎসাহ আর আপনি জোর করেছেন আন্তরিকতার দাবিতে, পার্থক্যটা এখানে, যদিও এই পার্থক্য আমার কষ্টের কোনো হেরফের করতে পারেনি।

ভাবপ্রবণতা একটা অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। কথাটা শুধু যে বিশ্বাস করি তা নয় এ বিশ্বাসকে আমি আমার জীবনেও প্রয়োগ করতে চাই, তবু মানুষ কি আদপেই ভাবপ্রবণতাকে পুরোপুরি বর্জন করে চলতে পারে। এখনো যখন সেই আপাত কঠিন এবং বাহ্যত নিরাবেগ মানুষটার চলে যাওয়ার কথা মনে পড়ে তখন আর বিশ্বাসে অটল থাকা সম্ভব হয় না মনে হয় বিনা নোটিশে এভাবে চলে গিয়েই যেন কায়েস আমাদের জানান দিয়ে গেল সে আমাদের জীবনের কতটা জায়গা জুড়ে ছিল

রাতের পালা প্রায় শেষ। টেলিপ্রিন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আমি চেক করছিলাম শেষ মুহূর্তে যদি অতি জরুরি কোনো আইটেম এসে পড়ে। বার্তা সম্পাদক মাশুক চৌধুরী তাঁর টেবিলে বাড়তি থেকে যাওয়া রিপোর্টগুলোকে ঝাড়াই বাছাই করে দেখছিলেন ভুলবশত কিছু বাদ পড়ে গেল কি না। ক্রাইম রিপোর্টের ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে সে হঠাৎ 'কায়েস ভাই' বলে ডুকরে ওঠায় কিছুটা অবাক হয়েই আমি টেবিলে ফিরে এসেছিলাম।

প্রিয় সুশান্ত, এখন যত অবলীলায় কথাগুলো লিখে যাচ্ছি চৌদ্দই জুনের সেই মধ্যরাতে কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পৃথিবীটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোথাও কোনো স্পন্দন নেই, শব্দ নেই, আলো নেই, এমনকি বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের আকুল উথালপাতাল ছাড়া অন্য কোনো বোধও অবশিষ্ট নেই।

দৈনিক খবরের ক্রাইম রিপোর্টার সম্ভবত কায়েস আহমেদের পরিচয় জানতেন না। অন্তত নামটা শোনা থাকলেও তিনি নিশ্চয়ই যাবার আগে মাশুক চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেতেন। কিন্তু তা হয়নি, সূত্রাপুর থানার ওসির বরাত দিয়ে নেহাত গৎ-বাঁধা ভাষায় কায়েস আহমেদ নামে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের জনৈক শিক্ষকের ইউ. ডি. অর্থাৎ আনন্যাচারাল ডেথের একটা মামুলি রিপোর্ট লিখে রেখে উনি চলে গিয়েছিলেন। খবরটা ছাপা হবে কি হবে না, সে ব্যাপারেও কেন বাড়তি আগ্রহ ছিল না তাঁর। বাংলাদেশে তো আজকাল প্রতিদিনই কত অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তাদের সবার কথা কি আর সংবাদপত্রে আসে ?

মাশুক চৌধুরী আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা জানতেন বলেই হয়ত সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। কী এক কাজের ছুতোয় তিনি সরে গেলেন টেবিল থেকে। কিন্তু সেই ক্ষমতাপরায়ণ শিফট ইনচার্জের কাছে কোনো ওজর-আপত্তি খাটল না, ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করে তিনি আমাকে দিয়েই আবার নতুন করে লিখিয়ে নিলেন সেই বীভৎস ঘটনার ভুল বিবরণ। হয়ত একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব এ ধরনের নিষ্ঠুরতা করা।

প্রিয়বরেষু, আপনার একান্ত ইচ্ছা আর জিয়া হাশানের ক্রমাগত তাগিদে বাধ্য হয়ে এখন যে লেখাটা লিখছি সেটা যে খুবই মধ্যবিত্ত টাইপের আহাজারিতে পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে তা আমি বুঝতে পারলেও করার কিছু নেই। কায়েসকে নিয়ে লিখতে বসে নিরাবেগ অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ রচনা করা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিংবা সোজাসুজি বলা যাক এজন্য যে পরিমাণ বিদ্যাবুদ্ধি থাকা দরকার আমার ঘটে তার খুবই অভাব

২.

গাঢ় ছাই রঙের প্যান্টের ওপর ফুলহাতা নীল শার্ট কনুই পর্যন্ত গোটানো, কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে লম্বা লম্বা অবিন্যস্ত চুল, আর চোখে মুখে অপরিচয়ের চাপা সংকোচ। ভিক্টোরিয়া পার্কের দোতলায় *ছোটগল্পের* অফিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম দিন বেশ ইতস্তত করছিল শেখ কায়েসউদ্দিন আহমদ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে বয়স অল্প হলে কী হবে জীবনের বাস্তবতা নিশ্চয়ই এর মধ্যে তাকে অনেক রকম কালো অভিজ্ঞতা দিয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছোটগল্প পত্রিকার জন্য সেদিন একটা গল্প নিয়ে এসেছিল কায়েস, 'ফেরারী বসন্তকে খুঁজে'। চিরাচরিত প্রেমের গল্প, বক্তব্যও তেমন কিছু অভিনবত্ব ছিল না ; কিন্তু আমার মন কেড়েছিল তার ধারালো সুঠাম গদ্যভঙ্গি।

নিয়মিত মাসিক পত্রিকা হিসেবে *ছোটগল্প* প্রকাশের ঘোষণা দিয়ে আমরা রীতিমতো ফাঁপড়ে পড়ে গিয়েছিলাম। বদ্ধ জলাভূমির মতো নির্জীব, নিস্তরঙ্গ গল্পচর্চার সাথে আধুনিক চিন্তার সংযোগ ঘটানোর যে প্রবল উৎসাহ নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের কাজে ব্রতী হয়েছিলাম কাজে নেমে দেখা গেল সেটা খুবই দুরূহ ব্যাপার। একটা নিয়মিত পত্রিকার উদরপূর্তির জন্য যে পরিমাণ লেখার প্রয়োজন তা পেতে হলে রীতিমতো একটা স্কুল খোলা দরকার ; কিন্তু মাস্টারি করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তো আমাদের ছিল না। শশাংক পাল আর আমি প্রায় দু'মাস দৌড়ঝাঁপ করে যে ক'টা লেখা জোগাড় করেছি অল্প দুয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া তার বেশিরভাগই ছিল আধুনিকতার নামে দুর্বোধ্য শব্দ আর ছন্দ মাত্রাহীন কবিতায় মাখামাখি।

প্রথম বয়সের অতি উৎসাহ তো ছিলই, নির্দিষ্ট কয়েকজন বিজ্ঞাপনদাতার কাছে যোগ্যতার প্রমাণ দেবার কিছুটা বাধ্যবাধকতাও ছিল, অতএব নিরুপায় সম্পাদকের মতো শুধু পৃষ্ঠা ভরানোর তাগিদে ওই লেখাগুলো থেকেই ঝাড়াই বাছাই করে একটা কিছু দাঁড় করাতে চাইছিলাম আমরা। সুতরাং শেখ কায়েসউদ্দিন আহমদের গল্পটা অমনোনীত হবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। শশাংক পাল তো উৎসাহে একেবারে লাফিয়ে উঠেছিল প্রায়।

দিন তিনেক পর আবার একদিন দুপুরের দিকে কায়েস এল গল্পটা সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানার জন্য। সেদিনই সে লেখকের নামটা একটু কাটছাট করে দিল। 'শেখ' আর 'উদ্দিন' শব্দ দুটো বাদ গেল আর 'আহমদ'কে করা হলো 'আহমেদ'।

বললাম আহমেদ শব্দের উচ্চারণটা ইংরেজি বানান রীতিতে হয়ে গেল না ? তখন, আমার জীবনে প্রথমবারের মতো, কায়েসের সেই বিখ্যাত এবং বহুল কথিত পোলাইট ডিসিসিভনেসের (কী বলব, মার্জিত দৃঢ়তা ?) সাথে পরিচয় ঘটে গেল, একটু লাজুক হেসে সে বলল, নামটা আমি ওভাবেই লিখতে চাই।

ওর ঘরোয়া নাম যে মিন্টু তা জানলাম আরো পরে। ততদিনে সে পুরোপুরি জড়িয়ে গেছে *ছোটগল্পের* ভালোমন্দের সাথে। 'ফেরারী বসন্তকে খুঁজে'র পর 'প্রতারক জোস্না', 'অপূর্ণ, তুমি ব্যর্থ বিশ্ব' প্রকাশিত হয়েছে। একদিন বলল, শওকত স্যারের (শওকত আলী) একটা ইন্টারভিউ আনলে কেমন হয় ; প্রস্তাবটা মাটিতে পড়তে দিলাম না। আমরা তখন পত্রিকাটিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য নানারকম চিন্তাভাবনা করছিলাম। শুধু কয়েকটা নির্বাচিত গল্প আর গল্প সংক্রান্ত প্রবন্ধের গতানুগতিক বৃত্তের বাইরে গিয়ে ছোটগল্প পত্রিকায় তখন সমালোচনা,

সুদিনের পথে এক ইও

~ www.amarboi.com ~
আলোচনা, সাময়িক প্রসঙ্গ, অনুবাদ, প্রতিচিন্তা, পুনর্মুদ্রণ প্রভৃতি বিভাগগুলো যুক্ত হচ্ছিল একে একে। কায়েস সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালু করল সাক্ষাৎকার বিভাগ। ও তখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিল। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে টিচার্স কমনরুমে শওকত আলীর সাথে কয়েকটা সিটিঙের পর লিখে নিয়ে এল সেই বিখ্যাত ইন্টারভিউ 'অন্ধকারের ঘোড়সওয়ার'। ছোটগল্পের বাইরে সম্ভবত এটাই হচ্ছে কায়েসের প্রথম সৃজনশীল গদ্য রচনা। এরপর সে হাসান আজিজুল হক, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ আরো কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল এবং তার প্রতিটি সাক্ষাৎকারই ছিল একজন পরিণত গদ্যশিল্পীর লিপিকুশলতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

যা বলছিলাম। প্রথম পরিচয়ের তিন চার মাসের মধ্যেই কায়েস পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন যোগাড় করা, এজেন্ট ঠিক করা, কাগজ কেনা, প্রুফ দেখা, দফতরির কাছে ছোটাছুটি করার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলো নিজের কাঁধে নিয়ে আমাকে ক্রমাগতভাবে তার ওপর নির্ভরশীল করে ফেলেছিল। এমনকি সত্তরের দিকে আমার প্রথম মেয়েটির জন্মের পর সে আমার পারিবারিক জীবনের সাথেও যুক্ত হয়ে গেল।

বয়সে আমার চেয়ে অন্তত চার-পাঁচ বছরের ছোট ছিল কায়েস, তবু আমার খাওয়া, পরা, পোশাক-আশাক এমনকি স্বভাব চরিত্র নিয়েও গার্জেনি করার একটা অনায়াস অধিকার যে কীভাবে তার করায়ত্ত হয়ে গিয়েছিল তা আমি আজও ভেবে পাই না। ব্যাপারটা যদি দ্বিপাক্ষিক হতো তবু না হয় কথা ছিল ; কিন্তু সে তো তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কখনো কিছু বলত না। পরিচয়ের অন্তত বছর খানেকের মধ্যে তার সম্পর্কে যেটুকু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তা হলো সে তার বাবার সাথে তাঁতিবাজার এলাকার (প্রসন্ন পোদ্দার লেন ?) এক মেসবাড়িতে থাকে। ওর বাবা ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এল. মল্লিকের একজন পদস্থ কর্মকর্তা ; কিন্তু তখন তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন বলে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছিলেন

সংগৃহীত খবরগুলো কোনোটাই আমার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না ; কিন্তু আমার প্রায় দমে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে কায়েস একদিন হেসে ফেলল, বলল, আমি কিন্তু কোথাও যাচ্ছি না। সদরঘাটের মোড় থেকে পাটুয়াটুলিতে ঢোকার মুখে হাতের ডান দিকে ব্রাহ্মসমাজের যে লাইব্রেরি তারই নিচের তলায় এল. মল্লিকের বিরাট দোকান। তিন চারদিন ধরে কায়েস আসছিল না বলে একদিন খোঁজ করতে সেখানে গিয়ে তার আব্বার সাথে পরিচয় হয়ে গেল। ডেকে নিয়ে তার টেবিলে বসিয়ে জোর আপত্তি সত্ত্বেও চা আর সমুচা আনালেন। বললেন, মিন্টুটার মাথায় আসলে কিস্সু নেই। জানে যে আমার শরীর ভেঙে পড়ছে, কাজ করার শক্তি নেই। দেশে আমাকে ফিরতেই হবে। তবু দ্যাখো কী

~ www.amarboi.com ~
গো ধরেছে ছেলে, সে নাকি এখন বড় তাজপুর যাবে না। ঢাকাতে থেকেই জগন্নাথে লেখাপড়া করবে। কিন্তু এতটুকুন একটা ছেলে শুধু টিউশনির ওপর নির্ভর করে একা একা ঢাকায় থেকে যাবে, তাই কি কখনো হয় !

বাইরে থেকে দেখতে গম্ভীর মনে হলেও কায়েস আসলে চুটিয়ে আড্ডা দিতে ওস্তাদ ছিল। অপরিচয়ের আড়ষ্টতা কেটে গেলেই খলবল করে বয়ে যেত তার কথার নদী। তবে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রাখা একটা খুবই ব্যক্তিগত জীবন ছিল তার, একান্তই তার, আমি তো দূরের কথা, সন্দেহ করি হয়ত বা ফেরেশতারও প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। একটু বাড়তি উৎসাহের গন্ধ পেলেই এমনভাবে চোখের দিকে তাকাত যে, তারপর আর মিথ্যা চালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি হতো না।

আমি জানতাম তার আব্বা অসুস্থ শরীর নিয়ে দেশে চলে গেছেন। ঢাকায় তখন সে একেবারে একা। গার্জেন বলতে একজন মামা থাকতেন মোহাম্মদপুরে, মনে হচ্ছে যেন একজন খালার কথাও হয়ত শুনেছিলাম ; কিন্তু কারো সাথেই কোনো যোগাযোগ রাখত না কায়েস। কিছু এটা অভিমানসঞ্জাত কারণ নিশ্চয়ই ছিল ; কিন্তু নেহাত অনুমান ছাড়া এ ব্যাপারে আমার প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

ওর আব্বার পরিচয়ের সূত্রে এল. মল্লিক কর্তৃপক্ষ কায়েসকে তাদের মেসবাড়িতে থাকার একটা সুযোগ দিয়েছিলেন। শুনেছি একটা চাকরি দেবার কথাও নাকি উঠেছিল ; কিন্ত সেলসম্যানের চাকরি করলে পড়াশোনা কিংবা সাহিত্য কোনোটাই করা যাবে না বলে সে তাদের চাকরির অফারটা নেয়নি। সাহা একাডেমি নামে তখনকার এক কোচিং স্কুলে নামমাত্র বেতনের একটা পার্টটাইম কাজ আর টিউশনির ওপর নির্ভর করে এই নিষ্ঠুর নষ্ট শহরে কায়েস যেন ক্রমান্বয়ে শুধু নিজের সাথে বাস করার একটা অদ্ভুত অভ্যাস রপ্ত করে ফেলল এবং তাতে যথেষ্ট দক্ষতাও দেখাল সে।

গম্ভীর ছিল, সংযত ছিল, সতর্ক তো বটেই ; কিন্তু তা বলে রূঢ়ভাষী ছিল না কায়েস আহমেদ। তার কথায় এবং আচরণে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যা দিয়ে সে একই সাথে সবার কাছ থেকে শ্রদ্ধা আর সখ্য দুটোই আদায় করে নিত

ওর একুশ কি বাইশ বছরের সেই বাড়ন্ত শরীরের জন্য যতটা রসদ আর পরিচর্যার প্রয়োজন ছিল তার যোগান দেয়া কায়েসের পক্ষে যে সম্ভব হতো না তা আমি বুঝতাম ; কিন্ত করার কিছু ছিল না। ধুলোভরতি এলোমেলো চুল, বসে যাওয়া ক্লান্ত চোখ মুখ আর কথা বলার সময় নিশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসা এক ধরনের অম্লজাত গন্ধ কখনো কখনো তার জীবনযুদ্ধের তীব্রতা প্রকাশ করে দিলেও আমাকে সে কোনোদিনও তার সহমর্মী হবার সুযোগ দেয়নি।

কায়েসের চরিত্রই ছিল একটু অস্বাভাবিক। আমি অনেকদিন ওর মুখের ওপরই ওকে আজগুবি চরিত্রের মানুষ বলে গালাগাল করেছি, দাম্ভিক বলেছি,

পুনরায় পাঠকে এক হও

~ www.amarboi.com ~
অস্বাভাবিক বলেছি, এমনকি ঠুটো জগন্নাথ বলতেও ছাড়িনি ; কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। যা কিছু বলি আর যতভাবে বলি, কায়েস তার ব্যক্তিগত ভালোমন্দের ব্যাপারগুলোকে যেন ততবেশি করে আরও দুর্ভেদ্য দেয়াল দিয়ে আড়াল করে রাখে। সবার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখা সেই নিষিদ্ধ জগতে কারোরই প্রবেশাধিকার ছিল না। আমারও না।

শুধু একটা খুব ঝাপসা আর অস্পষ্ট স্মৃতির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পরের সেই অস্থির আর অরাজক দিনগুলোর স্মৃতি। আর্মি ক্র্যাকডাউনে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া ঢাকা শহর তখনো ত্রাস আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। সারি সারি পিঁপড়ার মতো দলবেঁধে লোকজন সব এক কাপড়ে পালিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে যে কোনো মুহূর্তে মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আব্বা আর অপেক্ষা করতে রাজি হলেন না। এপ্রিল মাসের ছসাত তারিখের দিকে সবাইকে নিয়ে ফরিদপুরের গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন তিনি। অফিস আর বাসা আগলাবার জন্য একজন চাচা মিয়া ধরনের কাজের লোক নিয়ে আমি তখন একা ছিলাম ঢাকায়।

সকালের দিকে কারফিউ তুলে নেয়া হলে দশটা কি সাড়ে দশটায় গিয়ে লোকজন শূন্য অফিস খুলে বসে থাকতাম, আবার তিনটা বাজতে না বাজতেই সেই চাচা মিয়ার উপর্যুপরি ফোনের তাড়নায় বাসায় ফিরে আসতে হতো। ওই সময়েরই কোনো এক দুপুর বেলা দেখি কোথা থেকে যেন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে কায়েস এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের অফিসে। চোখ মুখ দেখে চেনার উপায় ছিল না ; কিন্তু কায়েস তো কায়েসই। প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত দু'জনেই বেঁচে আছি দেখে বিহ্বলের মতো একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা, তারপর মুখটা একটু হাসির মতো করে বলল, ওখানে আর থাকা গেল না, সিগারেট আছে আপনার কাছে ?

তখন কয়েকটা দিন, মাসখানেক কিংবা কিছু কম অথবা বেশি হবে, কায়েস আমার সাথে আমাদের শিল্প এলাকার বাসায় ছিল। জীবনে ওই প্রথম এবং ওই একবারই মাত্র কায়েসের ভালোমন্দের সাথে নিজেকে যুক্ত করার একটা বিরল সুযোগ পেয়েছিলাম আমি।

৩.

১৫ জুন দিনটা ছিল সোমবার। গা ঝলসানো রোদ আর প্রচণ্ড গরম মাথায় নিয়ে নাখালপাড়া থেকে গেন্ডারিয়ার দীননাথ সেন রোড পর্যন্ত পৌঁছুতে প্রায় সাড়ে বারোটার মতো বেজে গিয়েছিল। বহু দিন যাবত যোগাযোগ না থাকায় ওর নতুন বাসাটা আমি চিনতাম না। তবু ভেবেছিলাম এরকম একটা কাণ্ড ঘটে গেল, লোকজনের কাছে নিশ্চয়ই খবর পাওয়া যাবে ; কিন্তু এই প্রবল পরাক্রান্ত জৈষ্ঠ্যের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুপুরেও দেখি দীননাথ সেন রোড একেবারে সুনসান নির্জন। পথে বলতে গেলে একজন লোকও ছিল না। একে তো সারারাত ঘুম হয়নি। তার ওপর অনাহারের ক্লান্তিতে আমার তখন মাতালের মতো অবস্থা। হাঁটছি না দাঁড়িয়ে আছি বুঝতে পারছি না, ওদিকে আবার মাঝে মাঝেই পৃথিবীটা যেন দুলে উঠছিল। এ সময় কপালগুণে দেখা পাওয়া দুই কিশোরের কাছে জানা গেল যে, এখানে এক ভদ্রলোক মারা গেছেন বটে তবে তার লাশ ঢালকানগরে তার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর এখানে কাটিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা থাকায় কায়েসের শ্বশুর বাড়িটা খুঁজে পেতে খুব বেশি সময় লাগল না। কিন্তু নীলুদের বাসা পর্যন্ত যাবার আগেই মহল্লার লোকদের কাছে জানতে পারলাম যে, কায়েসকে এখন পাড়ার মসজিদে রাখা হয়েছে। জোহরের নামাজের পর সেখানে তার নামাজে জানাজা হবে। এক পানঅলা বললেন, এই তো, সামনে মোড়টা পেরুলেই দেখবেন মসজিদ।

আগুনের হলকার মতো রোদের ঝাপটা, পাঞ্জাবির নিচে কিলবিল করা ঘাম, কপালের দু'পাশে চিনচিনে ব্যথা আর আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মোড় ঘুরে দেখি মসজিদের দেয়ালের পাশে খানিকটা ছায়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কায়েসের অতি ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়তম বন্ধুদের কয়েকজন। নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে কথা বলছিল তারা এবং হয়ত প্রসঙ্গগুণেই তাদের আলাপচারিতায় কিছু চপল কথাবার্তও চলছিল।

আমাকে তাদের চিনতে না পারার কথা নয়, সুতরাং কাছাকাছি যাবার আগেই সরব অভ্যর্থনা কানে এল, আর সেখানে গিয়ে পৌঁছেই শুনতে পেলাম এক সময় গল্প লিখত এমন একজন কেরানি চরিত্রের ব্যাংক ম্যানেজার সবিস্ময়ে বলছে, কী ব্যাপার কামাল ভাই, আপনার দেখছি একটু চুলও পাকেনি।

আমার খুব চমকে যাওয়া হতভম্ব মুখের চেহারা দেখে শাকের চৌধুরী অপ্রস্তুত বোধ করেছিল হয়ত, দেখলাম বেশ দক্ষতার সাথে সে প্রসঙ্গটা পালটে দিল এবং আমার কাছে সর্বশেষ রিপোর্ট দেয়ার মতো করে বলল যে, হাসপাতালের মর্গ থেকে লাশ নিয়ে আসতে এগারোটার মতো বেজে গিয়েছিল। এর মধ্যে গোসল আর কাফন পরানো হয়ে গেছে। নামাজ শেষ হলেই জানাজা পড়ানো হবে। তারপর আবার লাশ যাবে কাকরাইলের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে।

ঈদের ছুটি তখনও শেষ হয়নি, তবু পত্রিকা আর টিভিতে খবর পেয়ে কায়েসের কয়েকজন সহকর্মী আর ছাত্র এসে জড়ো হয়েছিল কাকরাইলের স্কুল বিল্ডিঙে। নীলুর সাথে যোগাযোগ করে ওখানেও আরেকবার কায়েসের নামাজে জানাজার ব্যবস্থা করে রেখেছিল তারা।

~ www.amarboi.com ~

সুশান্ত, এখন মনে করার যত চেষ্টাই করি না কেন, সেদিন দুপুরে ঢালকানগরের সেই মসজিদের পাশে গনগনে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার মনে কী কী চিন্তা এসেছিল তার অবিকল বর্ণনা দেয়া কি সম্ভব ; তবে হ্যাঁ, একটা কথা মনে আছে যে অনেক লোকের সেই ভিড়ের মধ্যে একা একা দাঁড়িয়ে আমি সেদিন একান্তভাবে চাইছিলাম যেন নীলুর সাথে আমার কিছুতেই চোখাচোখি না হয়ে যায় এই অদ্ভুত অনীহার কারণ কী তা আমি জানি না। আর একথাও ঠিক যে, বাসায় ফাতেমা, লিপি ওদের বিস্ফারিত চোখের সামনে অস্বস্তিতে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে আমি হয়ত সামাজিক জীবের মতো এই মৃত্যু-পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিতে আসতামই না। ক্রোধ কিংবা ধিক্কার নয়, অভিমান তো নয়ই, আসলে আমাদের সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে হতভাগা এত অবলীলায় স্বেচ্ছামৃত্যুর মতো ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল, তার দেহাবশেষের সদগতির ব্যাপারে আমার অন্তত শুনতে খারাপ লাগলেও বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

এক সময় তাকে মসজিদের ভেতর থেকে বাইরে রাস্তার ওপর আনা হলো আমরা সবাই পুতুলের মতো সার বেঁধে দাঁড়ালাম। তারপর শওকত আলী, হায়াৎ মামুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শফিউল আলম আর আমাদের মতো আরো অনেক চেনা-অচেনা লোকের উপস্থিতিতে ওর জানাজার নামাজও শেষ হতে দেখলাম এখন ট্রাকে তুলে কায়েসকে আবার উইলস লিটল ফ্লাওয়ারে নিয়ে যাওয়া হবে।

তখন শওকত আলী সাহেব না হায়াৎ মামুদ ঠিক মনে নেই, প্রস্তাব দিলেন, ছোট্ট ওই ট্রাকে গাদাগাদি করে কাকরাইল পর্যন্ত না গিয়ে আমরা বরং ততক্ষণ কাছেই হায়াৎ মামুদের বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নেই। স্কুলের জানাজা শেষে কায়েসকে আবার ফিরিয়ে আনা হলে না হয় একসাথে পোস্তগোলার কবরস্থানে নিয়ে দাফনের কাজটা সেরে ফেলা যাবে

সেই হার্দ্য, স্নিগ্ধ আর আন্তরিক সমাদরে ভরা আশ্চর্য দুপুরটির কথা আমার বহুদিন মনে থাকবে। হায়াৎ মামুদদের গাছপালা ঘেরা বিশাল বাড়ির বনেদি ড্রয়িংরুমের শীতল আরামের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র আমাদের চেহারা আর আচরণ থেকে শোকের বিষণ্নতা ঝরে গেল। শব্দহীন সিলিংফ্যানের নিচে ফোমে মোড়া সোফায় বসে তারপর সেই কোল্ড ড্রিংকসের আয়েসী আড্ডায় খুব ক্যাজুয়ালি বার কয়েক কায়েসের প্রসঙ্গ এসেছিল। তবে আমাদের আলাপচারিতার প্রধান বিষয়গুলো ছিল রাজনীতি, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্প সংস্কৃতি প্রভৃতি এবং কখনো কখনো ব্যক্তিগত সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার বিবরণ।

ইতিমধ্যে হায়াৎ মামুদের স্ত্রী তার কর্মস্থল থেকে ফিরে আসায় অবধারিতভাবেই দুপুরের খাবার সেরে নেয়ার নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল এবং

পুনরায় পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অল্পক্ষণের মধ্যেই মিসেস হায়াৎ মামুদের লক্ষ্মীমন্ত অতিথিপরায়ণতার মধ্যে দিয়ে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি সহকারে দারুণ একটা মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা হলো।

আবার ড্রয়িং রুমে ফিরে এসে যথারীতি বিশ্রম্ভালাপের আয়োজন শুরু হলেও আমাদের মধ্যেই কেউ একজন হঠাৎ কবরস্থানের উল্লেখ করায় ভীষণ অপ্রস্তুতভাবে আমরা সবাই লাফ দেয়ার মতো করে উঠে দাঁড়ালাম এবং রাস্তায় এসে তড়িঘড়ি রিকশা নিয়ে পোস্তগোলার উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

ফরিদাবাদ মাদ্রাসার কাছাকাছি এসে দেখা গেল একটা স্কুটারে শামসুর রাহমান ফিরে যাচ্ছেন অর্থাৎ কায়েসের আর দেরি করার তর সয়নি, আমরা যেয়ে পৌঁছুবার অনেক আগেই সে তার সদ্যরচিত অন্তিম শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমরা অবশ্য তবু কবরস্থান পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কী জানি, নইলে কায়েস হয়ত নিশ্চয়ই মাইন্ড করত।

৪.

প্রিয় সুশান্ত, একজন মৃতব্যক্তির সবচাইতে বড় অসহায়ত্ব হচ্ছে যে, তার পক্ষে কোনো ভুল তথ্যের সংশোধন কিংবা প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। ফলে কোনো লোকের মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে স্মৃতিচারণের নামে অসম্পূর্ণ, অসত্য কিংবা আংশিক সত্য তথ্য ব্যবহার করে তার ভাবমূর্তিকে অন্যায়ভাবে মহিমান্বিত কিংবা বিবর্ণ করে দেবার অবাধ স্বাধীনতা পাওয়া যায়। কেউ তো আর কৈফিয়ত চাইতে আসছে না, তাহলে আর বাধা কোথায়।

১৪ জুনের ঘটনার পর চিরাচরিত নিয়মের মতোই কায়েস আহমেদকে নিয়ে যে এলোপাতাড়ি আবেগ আর উচ্ছ্বাসের ঝড় বইতে শুরু করেছিল এবং যেভাবে জীবনানন্দকে উদ্ধৃত করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল কায়েসের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, এতদিনে তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। এই সুযোগে আমার বলতে সাহস হচ্ছে যে, তখন ওই সময়ের আকস্মিক আবেগে বিপর্যস্ত হয়ে কায়েস আহমেদের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী, সুহৃদ আর বন্ধু ওর সাহিত্য প্রচেষ্টা, জীবন সংগ্রাম, রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং এমনকি দাম্পত্য জীবন সম্পর্কেও খুব অসতর্ক কিছু মন্তব্য করে ফেলেছেন। কায়েসের মতো তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন একজন লোককে নিয়ে আলোচনার সময় ভালো করে খোঁজ-খবর না নিয়ে এ ধরনের লেখালেখি করা উচিত হয়নি। স্ত্রীর নিরাময়হীন অসুস্থতা কিংবা আর্থিক অনটনের জন্য সে জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছিল—এ কথা মোটেও সত্য নয়, আর শিকড়হীনতার মতো এক ধরনের যন্ত্রণাবোধ ওকে আত্মহননে উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে যে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে সেটাও অন্ধের হাতি দেখার মতো ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি কায়েস আহমেদের যে প্রখর পুরুষকার ওকে আর দশজনের চাইতে আলাদা ভাবতে বাধ্য করত, এই সব স্থূল এবং অদূরদর্শী মন্তব্য সেই

~ www.amarboi.com ~
পুরুষকারকে অপমানিত করার অক্ষম চেষ্টারই নামান্তর মাত্র। এ দেশের অকৃতজ্ঞ, কূপমণ্ডুক এবং স্বার্থপর বিদ্বৎসমাজেই দুই নম্বরি ডক্টরেট সংস্কৃতির পক্ষে কায়েস আহমেদের প্রকৃত মূল্যায়ন কখনোই সম্ভব হবে না। যেসব নামিদামি লোক আজ কায়েস সম্পর্কে নানা ধরনের কথা বলছেন আমি জানি, ভালো করেই জানি, কায়েসকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি দেয়া তো দূরের কথা, তাদের আজকের এই সুখী সন্তুষ্ট জীবন এবং পৌনঃপুনিক পুরস্কার প্রাপ্তির ভিত্তি রচনায় অবদানের জন্য কায়েসের কাছে তাদের যতটা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল তার এক শতাংশও তারা স্বীকার করেননি। কায়েস বেঁচে থাকতেও না, আর মৃত্যুর পরে তো নয়ই। বলতে গেলে কায়েসের কৃত উপকারের বিনিময়ে তারা বরং কায়েসের ক্ষতিই করেছিল বেশি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কায়েসের বিশেষ ধরনের দুর্বলতার কথা জানতেন বলেই হয়ত ইউপিএল-এর মহিউদ্দিন আহমদ তাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর কাজ করার একটা দুর্লভ সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথিতযশা মানিক বিশেষজ্ঞদের রচনা দিয়ে কায়েসের সম্পাদনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন, সাহিত্যকর্ম, ভাষারীতি, আঙ্গিক, ডায়েরি, চিঠিপত্র এবং রচনাপঞ্জি সংক্রান্ত একটা প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল তখন। মনের মতো কাজের সুযোগ পেয়ে খুব সঙ্গত কারণেই কায়েস দারুণভাবে ইনভলভ্ড হয়ে গিয়েছিল প্রকল্পটার সাথে। ক্রিয়েটিভ কাজ মুলতবি রেখে কায়েস তার সমস্ত মেধা, সৃজনশীলতা আর শ্রম বিনিয়োগ করে রাতের পর রাত জেগে প্রস্তাবিত গ্রন্থটির সম্ভাব্য বিষয় ও লেখকসূচি তৈরি করল। ঠিকানা যোগাড় করে দুই বাংলার মানিক বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করা হলো এবং বহুদিন সময় নিয়ে একটু একটু করে গ্রন্থটির জন্য একটা ভূমিকাও লিখে ফেলল সে। কিন্তু দীর্ঘ চার বছর ধরে একটানা মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত, অবসন্ন হওয়া সত্ত্বেও কায়েসের সেই দিবারাত্রির আরাধ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

ওপার বাংলার লেখকরা তাদের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের লেখাগুলো সময় মতো পাঠিয়ে দিলেও এই ঢাকা শহরে যেসব মহামান্য লেখক ছিলেন কায়েসের একেবারে হাতের কাছের মানুষ এবং যারা দেখা হলেই প্রকল্পটি সম্পর্কে অকৃপণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন শুধুমাত্র তাদের লেখার অভাবেই গ্রন্থটি আজো পর্যন্ত অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। দেখা করে, টেলিফোনে, চিঠি দিয়ে যখন যেভাবে সম্ভব হয়েছে কায়েস তাদের অনবরত তাগাদা দিয়ে গেছে, প্রয়োজনীয় রেফারেন্সের জন্য নিজের সঞ্চয় থেকে দুর্লভ আর বিরল সব বইয়ের যোগানও দিয়েছে ; কিন্তু তাদের পক্ষে সময় করে লেখাটা আর লেখা হয়ে ওঠেনি, চার বছরেও না।

~ www.amarboi.com ~

কায়েস আহমেদ যে খুব লোকপ্রিয় লেখক ছিলেন তা নয়। সাহিত্যচর্চার পরিধি হিসেবে তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও অন্যান্য অনেকের চাইতে কম। পাঠকের মনোযোগ পেতে হলে যেসব উপাদানের প্রয়োজন কায়েস বরাবর তা সচেতনভাবে পরিহার করে গেছে বলে সামান্য ক'জন সিরিয়াস পাঠক ছাড়া কায়েসের নামও হয়ত অনেকে শোনেননি। পাঠক সমাজে ওর পরিচয়ের এ স্বল্পতার দরুনই এখনকার কৃতি বোদ্ধাদের মূল্যায়ন তেমনি কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে না।

কয়েকজনকে দেখলাম কায়েসের গল্প উপন্যাসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ওর মধ্যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের অবলম্বনহীনতা, শ্রেণী সংঘাতের তীব্রতা, উদ্বাস্তু জীবনের টানাপড়েন আর দেশ বিভাগজনিত মানসিক সংকটই দেখতে পেয়েছেন বেশি, আর কিছু নয়। হ্যাঁ, কায়েস আহমেদের অনেক লেখাতে বিষয়বস্তুর তাগিদে অনিবার্যভাবেই শ্রেণী চেতনা, শিকড়হীনতার অনিশ্চিত আর রাজনীতি চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, ঘটতেই পারে ; কিন্তু তাই বলে কি সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম প্রতিভাধর কথাশিল্পী কায়েস আহমেদের তাবৎ সাফল্য আর কৃতিত্ব শুধু এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ?

অত্যন্ত পরিশ্রমী অথচ বিরলপ্রজ এই কমিটেড কথাশিল্পীর প্রখর সমাজমনস্কতা, যুগ সচেতনতা, মানব চরিত্র সংক্রান্ত নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং সর্বোপরি তার নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে ধীরে ধীরে অথচ খুব নিশ্চিতভাবে স্বীকৃতি অর্জনের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। হয়ত এমনিভাবে একদিন সে শুধু যে প্রথম সারিতে উঠে আসত তা নয় হয়ত বা সে সবার পুরোভাগেই চলে যেতে পারত সে রকম সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা দুটোই তার ছিল, অথচ ঘটনা ঘটল সম্পূর্ণ অন্যরকম। কী আর করা যাবে।

নিজের লেখার ব্যাপারে প্রচণ্ড রকমের রক্ষণশীল ছিল কায়েস আহমেদ। নতুন কোনো গল্পের চিন্তা মাথায় এলে মাসের পর মাস, এমনকি কখনো কখনো তার চাইতেও বেশি সময় নিয়ে চিন্তাটাকে মনের মধ্যে নানাভাবে নেড়ে চেড়ে ঝাড়াই বাছাই করার পর তা লিখিত আকারে কাগজে নিয়ে আসত। প্রাথমিক খসড়া দাঁড় করাবার সময় বারে বারে কাটাকুটি তো করতই কখনো কখনো অনেকটা লিখে ফেলার পর মনের মতো হচ্ছে না বলে পুরো লেখাটাকেই বাদ দিতে দেখেছি তাকে। কিন্তু একবার কোনো লেখার চূড়ান্ত কপি করা হয়ে গেলে এবং সেটা তার নিজের মনোনয়ন পেলে তারপর আর কারো কথায় সে লেখার ব্যাপারে দ্বিতীয় চিন্তা করতে রাজি হতো না।

দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে, অ্যান্ড ইটস ফাইনাল। কোনো কথায় খানিকটা দৃঢ়তা মেশাতে হলে ইংরেজি বাক্য ব্যবহারের একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কায়েসের যদিও ইংরেজি সাহিত্য পড়ার ব্যাপারে তার যে খুব আগ্রহ আছে তা কিন্তু আমার মনে হয়নি কখনো।

মনে ক্ষোভ আছে, বেদনাও আছে, তবু খুব সিরিয়াস কোনো তাত্ত্বিক আলোচনায় আমি যাব না। তার ক্ষেত্র ভিন্ন, পরিবেশও আলাদা। আমার এই একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ কোনো সাহিত্যিক বাদানুবাদে পর্যবসিত হোক তাও আমার উদ্দেশ্য নয়, তবু যে কথাটা আমি বলতে চাই এবং বলার জন্য দারুণ প্ররোচনা বোধ করছি, তাহলো রাজনীতি নয়, প্রেম নয়, কিংবা অর্থসংকটও নয়, কায়েসকে আর তার লেখাকে যদি সত্যি কোনো কিছু প্রভাবিত করে থাকে তবে তা হলো ওর সর্বগ্রাসী জীবনতৃষ্ণা, এই জীবনতৃষ্ণাই ওকে দিনরাত্রি কুরে কুরে যন্ত্রণা দিচ্ছিল এবং একটু একটু করে ক্রমাগতভাবে গ্রাস করে ফেলছিল।

সুশান্ত, সুযোগ থাকলেও আমার এই মন্তব্যকে স্থূল অর্থে নেবেন না। আমি ঠিকমতো বোঝাতে পারছি কি না জানি না, তবু বলি, কায়েসের মধ্যে প্রথম থেকেই আমি যে অস্থিরতা আর টানাপড়েন লক্ষ করেছি তা যেমন শুধু অর্থনৈতিক কারণে নয়, তেমনি স্খলন, ব্যর্থতা বা হতাশার জন্যেও নয়, মনের এই অবস্থাটাকে ভাষায় অনুবাদ করা আমার সাধ্যের অতীত। এই ব্যাখ্যাহীন শূন্যতাবোধই ওকে কখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে দেয়নি বরং ওর লেখালেখিকেও এক ধরনের দুর্বোধ্য মধুরতা দিয়ে আপ্লুত করে রেখেছে। কায়েসের জীবনের এই অনালোকিত দিকটি কেন যে তার সাম্প্রতিককালে সার্বক্ষণিক বন্ধুদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না তা বুঝতে পারছি না। আপনার কাছে লেখা চিঠিতে ওকে 'হতভাগা' অভিধায় বিশেষিত করায় আপনি আহত হয়েছিলেন ; কিন্তু আপনিই বলুন, আমি কি সত্যি সত্যিই ভুল করেছিলাম ?

৫.

এ লেখার প্রথম দিকে কায়েসের জীবনের নানা ধরনের কালো অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম তা হয়ত লক্ষ করেছেন। এখন সে সম্পর্কে অর্জিত ধারণার কথা কিছু বলি।

ষাট দশকের শেষের দিকে, সম্ভবত : সাতষট্টি কি আটষট্টিতে গৃহ শিক্ষকতার সূত্রে একটি হিন্দু মেয়ের (অপর্ণা ?) সাথে কায়েসের কিছু সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পারিবারিক স্নেহ ও মমতাহীন যান্ত্রিক মেসজীবনে হাঁফিয়ে ওঠা মাত্র ফার্স্ট ইয়ারের একটি তরুণ, হোক না সে টিউটর, কিংবা হোক না সে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য, যদি মোটামুটি সংস্কারমুক্ত এক পরিবারের একটি কোমলমতি ছাত্রীর চোখে মুগ্ধতার ছায়া দেখে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তারপরও ক্রমাগত প্রশ্রয় পায় তাহলে তো অনুরাগ জন্মাতেই পারে। অপর্ণার সাথে (নামটা ভুল হলে ক্ষতি নেই) সে রকমই একটা গভীর বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছিল কায়েস। শুধু যে জড়িয়ে গিয়েছিল

~ www.amarboi.com ~

তা নয়, একেবারে মনপ্রাণ সঁপে দেবার মতো অবস্থা হয়েছিল কায়েসের। অপরপক্ষ থেকেও আগ্রহের অভাব ছিল না। ফলে কাঁচা বয়সের সেই বোধবুদ্ধিহীন আবেগের তাড়নায় এক পর্যায়ে ও দুটি ছেলে আর মেয়ে গৃহত্যাগ করে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গিয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবারও পরিকল্পনা করেছিল।

কিন্তু দীর্ঘদিনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা আর আনাড়িগোছের যোগাড়যন্তর সত্ত্বেও ঘটনাটি শেষপর্যন্ত ঘটেনি। সাধ্যমতো প্রস্তুতি আর বুকভরা উত্তেজনা নিয়ে কায়েস সময়মতোই আগে থেকে ঠিক করে রাখা এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে অস্থির প্রতীক্ষায় ছটফট করেছে। ঘর থেকে রাস্তা আবার রাস্তা থেকে ঘরে করতে করতে ঘড়ির কাঁটা তার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে ; কিন্তু অপর্ণা শেষপর্যন্ত তার সংকল্পে অটল থাকতে পারেনি। কায়েসের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় হয়ত ওর ওপর পারিবারিক নজরদারি কড়া হয়ে গিয়েছিল, কিংবা এমনও হতে পারে যে তখনকার সাম্প্রদায়িক চেতনা আর আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কাছে অপর্ণার আবেগ ও কল্পনা শেষপর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারেনি বলেই সে অনিশ্চিত জীবনের পথে নেমে আসতে দ্বিধা করেছে।

কয়েক দিনের মধ্যেই খবর পাওয়া গেল যে, অপর্ণার বাবা-মা তাকে সীমান্তের ওপারে পশ্চিমবঙ্গের নিরাপদ দূরত্বে কোনো এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের আশ্রয়ে নির্বাসনে পাঠিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

বিশ্বাস ভঙ্গের এই অকল্পনীয় দুর্ঘটনা তখন কায়েসের মনকে দুমড়ে মুচড়ে কিম্ভুত করে দিলেও তার স্বল্পভাষী চরিত্র আর অদ্ভুত ধরনের চাপা স্বভাবের দরুন খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ছাড়া এ ব্যাপারটা পরিচিত মহলে খুব বেশি প্রচার পায়নি। ফিরু (ছোটগল্পের শাকের চৌধুরী) আর তাপস মজুমদার হয়ত এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত কিছু তথ্য দিতে পারে

এরপর থেকে কায়েস যেন আপাদমস্তক বদলে গেল। জীবন থেকে সমস্ত রকম স্বপ্নবিলাস আর রোমান্টিকতা ঝেড়ে ফেলে একটানা কয়েকটা বছর শুধু জীবিকানির্বাহ আর সাহিত্যচর্চা নিয়ে মগ্ন থাকল সে। মোহাম্মদপুরের কোথায় যেন ওর এক মামা থাকতেন। মাঝে মাঝে সেখানেও যেতে দেখছি তাকে। ঊনসত্তর সালে দেশ থেকে বাবার মৃত্যু সংবাদ আসার ক'দিন পর একদিন কায়েস এসে বলল, সম্পর্কটা চুকিয়ে দিয়ে এলাম কামাল ভাই, ওই ভদ্রলোকের বাসায় আর কখনো যাব না আমি।

জীবনের কঠিন বাস্তবতার সাথে ক্লান্তিহীন লড়াইয়ে ব্যস্ত কায়েস সমস্ত রকম মানসিক বিলাসকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও দুয়েকজন মুগ্ধ পাঠিকা কিংবা উৎসাহী

আমার বই
বুলিবার পড়ুন এক হও

~ www.amarboi.com ~
তরুণী যে ওর জীবনের আশপাশে ঘুরে বেড়ায়নি তা নয়, কিন্তু তার আপাত নিরাসক্তি আর নির্বিকার আচরণকে কেউই শেষপর্যন্ত জয় করতে পারেনি।

এই নিষ্ঠুর নির্বান্ধব শহরে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কঠোর তাপসের মতো একটা নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিস কায়েস। একমাত্র সাহিত্য আর জীবিকার অবলম্বন হিসেবে মাস্টারি ছাড়া আর কিছুর প্রতি আগ্রহ ছিল না। সময়ও ছিল না। বলত, নাম করতে চাই না, বড় মাপের লেখক হতে চাই না, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত পয়সার প্রতিও লোভ নেই আমার, আমি শুধু লিখে যেতে চাই, শুধু লিখতে চাই, আর কিছু নয়।

হ্যাঁ, তখন কিছুদিন ধরে লিখছিল সে, প্রচুর লিখছিল। গেণ্ডারিয়া স্কুলে মাস্টারির পাশাপাশি মৌলিক গল্প, সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম, ছোটগল্প, পত্রিকার জন্য সাক্ষাৎকার, গ্রন্থ সমালোচনা, আলোচনা প্রভৃতি অনেক কিছু লিখেছে কায়েস। এই সময়েই তার 'খঞ্জরোদে শালিক ফড়িং', 'অন্ধ তীরন্দাজ', 'সম্পর্ক', 'নির্বাসিত একজন', 'গন্তব্য', 'জগদ্দল', 'পরাণ', 'মহাকালের খাঁড়া' ও 'কুষ্ঠব্যাধির' মতো অসাধারণ গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছে আর সেই সুবাদে তার পরিচিতির পরিধিও বেশ খানিকটা বিস্তৃত হয়েছে।

জীবনের এ রকম এক সৃষ্টিমুখর পর্যায়ে মগ্ন থাকা অবস্থায়ই গেন্ডারিয়া স্কুলের দশম শ্রেণীর কিশোর নীলুর (বেলায়েত হোসেন) সাথে পরিচয় ঘটার সুবাদে কায়েসের জীবনে আবার একটা বড় ধরনের বাঁক নেয়ার সমূহ লক্ষণ স্পষ্ট হতে শুরু করে। ক্লাস টেনের পড়ুয়া এক সাহিত্যমনস্ক কিশোর, পত্রিকা পাঠের অভ্যাসের দরুন ইতিমধ্যেই যার কাছে কায়েস আহমেদের নাম পরিচিত হয়ে গেছে, এমনকি এক ধরনের মুগ্ধতাও সৃষ্টি হয়েছে, নিজের ক্লাসেই তার প্রিয় লেখককে আবিষ্কার করে রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়েছিল। লেখক এবং তার ভক্ত পাঠকের মধ্যে একরকম কাকতালীয় যোগাযোগ ঘটেছিল বলেই হয়ত সে সময় কায়েসের জীবনে আবার একটা পালাবদলের প্রক্রিয়া শুরু হতে পেরেছিল। বয়ঃসন্ধি পেরুনো এক সাহিত্যমনা কিশোর অনুরাগীর হৃদয়ে তার প্রিয় লেখকের সান্নিধ্য গভীরভাবে দাগ কাটতে পারে। সংখ্যায় অল্প হলেও এরকম ঘটনা কখনো কখনো ঘটে ; কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রের স্বাভাবিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও কায়েসের জন্য নীলুর মনে যে তীব্র আকর্ষণ জন্ম নিয়েছিল তার সাথে তুলনা করার মতো কোনো ঘটনা আমার অভিজ্ঞতায় আর নেই।

সময় পেলেই 'স্যারে'র বাসায় চলে যাওয়া, তাকে এটা সেটা উপহার দেয়া, অনুগত শিষ্যের মতো স্যারের ঘর ঝাঁটি দিয়ে দেয়া, কাপড় কাচা, বিছানা পাতা, রান্না করা এমনকি হয়ত সম্ভব হলে স্যারের মুখটা শেভ করে দিতেও দ্বিধা ছিল না নীলুর। ভাবলে ঈর্ষা লাগে ; কিন্তু অবস্থাটা প্রায় এরকমই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম

~ www.amarboi.com ~

দিকে বিব্রত, হতভম্ব ও রীতিমতো আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া কায়েস নীলুর এই আতিশয্যকে নিরুৎসাহিত করার বহু চেষ্টা করেছে, সংকোচও বোধ করেছে নিশ্চয়ই, তবু মরিয়া নীলুর সেই উদ্দাম আগ্রহকে বেশিদিন আর এড়িয়ে থাকা সম্ভব হয়নি, মনে হচ্ছিল যেন কায়েস নিজেও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিল তার জীবনের এই নতুন পরিস্থিতির সাথে।

প্রিয় সুশান্ত, ব্যাপারটা নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনার মূল উদ্দেশ্য কি আপনি বুঝতে পারছেন ; আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই এই কথাগুলো একটু খোলাখুলিভাবে বলতে চাচ্ছি। ১৪ জুনের ঘটনার পর নীলুকে এবং তার পরিবারকে জড়িয়ে এমন কিছু কথা বলাবলি হয়েছে যাতে বাইরের একজন তৃতীয়পক্ষ হয়েও লজ্জায় ক্ষোভে আমারও যেন মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। নীলু অবশ্য এখন আর সেদিনের সেই কিশোর ছেলেটি নেই। গত পনেরো বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে, অনেক পরিবর্তন এসেছে নীলুর জীবনে। আর এখন তো সে রীতিমতো হোমড়া চোমড়া একজন বিবাহিত পুরুষ। কিশোর বয়সের সেই বিহ্বলতার মোহে কায়েসকে তাদের বাসায় নিয়ে যাওয়া এবং তার মাস কয়েকের মধ্যে আশ্রয়চ্যুত কায়েসকে ভাড়ার বিনিময়ে নিজেদের বাড়িতে ঠাঁই দেয়ার মধ্যে যারা সুদূরপ্রসারী অভিসন্ধির সন্ধান করেন তাদের কথা কী আর বলব। কায়েসের তখনকার জীবনের বেশ কিছু ঘটনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকার ফলে আমি এমন কিছু খবর জানি যা এদের অনেকে জানেন না, জানা সম্ভবও ছিল না।

যা হোক, নীলুদের পরিবারে আসা-যাওয়া এবং পরবর্তীকালে ভাড়াটে হিসেবে থাকার সূত্রেই কায়েসের সাথে ওর বোনের পরিচয় ঘটে, আর সে সময়ের দীঘল চোখের সেই ছিপছিপে মায়াবী মেয়েটিকে একবার দেখলে ভালো না লেগে উপায়ও ছিল না। কিন্তু আমি অবাক হয়েছিলাম অন্য কারণে। এতদিন যে কায়েসকে দেখতাম হৃদয়ঘটিত ব্যাপার স্যাপারের প্রতি দারুণ উদাসীন, খুব কৌশলের সাথে মেয়েদের সঙ্গ এড়িয়ে চলে, সেই লোকটিই যে কীভাবে বয়সের এত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও জানুর সাথে মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়ল তা আমার কাছে আজও পর্যন্ত বুদ্ধির অগম্য থেকে গেছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর নীলু যে অস্বস্তিবোধ করছে তা আমি টের পেতাম। ওর বাবা-মাও যে কায়েসকে এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়তে দেখে উসখুস করতেন তা বুঝতেও অসুবিধে হতো না। তাছাড়া কায়েস নিজেও আমাকে বলেছে যে, জানুর সাথে ওর কথা বলাটা ওদের আত্মীয়-স্বজনরাও ভালো চোখে দেখতেন না। এমনকি নীলুর বোনটি যে ছোটবেলা থেকে এক ধরনের হিস্টিরিয়ায় ভুগছে তাও তার জানা ছিল। তবু নীলুর অস্বস্তি, ওর বাবা-মা'র স্পষ্ট আপত্তি, আত্মীয়-স্বজনদের অসন্তোষ এবং বন্ধুমহলের বিরোধিতা সত্ত্বেও কায়েসের মতো অমন

সুন্দরার পাঠকে এক হও

~ www.amarboi.com ~
আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষটি কেন যে নিজের ভালোলাগাকে সংযত রাখতে পারল না সেটা অবশ্যই একটা অবাক হবার মতো কারণ এবং তার চাইতেও বেশি অবাক হতে হয় যখন কায়েসের মতো একজন বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক লেখক ভালোবাসা দিয়ে ব্যাধি নিরাময়ের সংকল্পের কথা বলে।

নীলুদের পারিবারিক অনাগ্রহ, পরিচিতদের প্রতিকূল মনোভাব আর বন্ধুমহলের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কায়েস জানুকে বিয়ে করার প্রশ্নে অটল থাকায় একদিন খানিকটা ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলায় কায়েস বলেছিল, কাম নয়, মোহও নয়, জানুর ব্যাপারে এক ধরনের ফাদারলি মমতা কাজ করে ওর মধ্যে। জানুকে ও একটা ডিপেন্ডেবল শেলটার দিতে চায়, সারিয়ে তোলার নামে যেভাবে ওঝা ডেকে ঝাড়-ফুঁক আর টর্চার করা হচ্ছে তা থেকে রক্ষা করে ওকে বাঁচিয়ে তুলতে চায় সে।

এরপর থেকে ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আর জড়িত না থাকার সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে কায়েসের সাথে আমার এক ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হলেও তখন থেকে কীভাবে যেন নীলুর সাথে আমার একটা আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। ফলে ওর কাছ থেকেই কায়েসের বিয়ে আর বিয়ের পরের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ-খবর পাচ্ছিলাম।

৬.

বেঁচে থাকতে যে মানুষটিকে কখনো তার প্রাপ্য মনোযোগ দেয়া হয়নি আজ তাকে প্রচারের বন্যায় ভেসে যেতে দেখে বাঙালি চরিত্র সংক্রান্ত সেই ব্যবহার জীর্ণ উপমাটা ব্যবহার করব কি উলটো দেখছি আমার মধ্যেও মাঝে মাঝে স্বেচ্ছামৃত্যুর ব্যাপারে এক ধরনের মোহ সৃষ্টি হচ্ছে। চেষ্টা করলে তার জন্য কিছু উপযুক্ত পশ্চাৎপট তৈরি করে নিতেও অসুবিধা হবার কথা নয়, তবু তা হয়ত আর হবে না। আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা তৈরি করে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করার জন্য যে পরিমাণ সাহসের প্রয়োজন হয় আমার মধ্যে তার প্রচুর ঘাটতি রয়ে গেছে।

নিতান্ত অবেলায় কায়েসের এভাবে চলে যাওয়া নিয়ে দুঃখ করার জন্য বাংলাদেশে যে এত লোক ছিল তা ভাবতেও এখন খুব ভালো লাগছে। কায়েসের জন্যে আপনারা স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। এত বিদগ্ধ বিদ্বজ্জন কায়েসের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নের জন্য পরিশ্রম করছেন, চারদিকে এত হা হুতাশ হচ্ছে, এ তো ভালো লাগারই কথা। হয়ত সামনেও আরো একটা-দুটো মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হবে এবং তারপর সময়ের স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন আপনাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেলে কায়েস আহমেদ তার সমস্ত স্মৃতি নিয়ে বিস্মরণের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। তবু, এটাই বা কম কী ? কায়েস তো আর এমন

~ www.amarboi.com ~
কেউকেটা ধরনের কোনো লেখক ছিল না যে তাকে বছরের পর বছর ধরে মনে রাখতে হবে

স্বেচ্ছামৃত্যুর যে কোনো ঘটনাই অপ্রত্যাশিত এবং দুঃখজনক ; কিন্তু এটা নতুন নয়। নগর সভ্যতার সূচনা পর্ব থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে কয়েক কোটি মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই নিজের জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন। এর পেছনে নানা ধরনের কারণ থাকতে পারে। খুব সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে না গিয়েও তৃতীয় বিশ্বের আমাদের মতো সমাজগুলোতে স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য যে যে কারণগুলোকে মোটা দাগে চিহ্নিত করা যায় তা হলো :

ক. জীবিকার অনিশ্চয়তা

খ. আর্থিক সংকট

গ. পারিবারিক অশান্তি

ঘ. অচিকিৎস্য ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষা

ঙ. মানসিক বিপর্যয়

চ. সামাজিকভাবে অপদস্থ হবার আশংকা এবং এই ধরনের আরো কিছু কিছু বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ব্যাখ্যাসাধ্য উপলক্ষ। তাছাড়া এমন কিছু মানুষ আছেন যাদের মধ্যে জন্ম থেকেই আত্মহত্যা করার একটা প্রবণতা সুপ্ত থাকে, যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই তারা ঝোঁকের বশে আত্মহত্যা করে থাকেন।

কায়েসের স্বেচ্ছামৃত্যুর কারণ সন্ধান করতে গিয়ে আমরা শেষপর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌছব ? কারো কারো লেখায় দুটি অত্যন্ত স্থূল কারণের প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ করেছি। ওকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন কিংবা বুঝতে চেষ্টা করেছেন তাদের কাছে এসব ইঙ্গিতকে অশ্লীল মনে হওয়া স্বাভাবিক। সমস্যার এরকম সরলীকরণে আপাত দায়মুক্তি থাকলেও তাতে প্রকৃত সত্যের উদঘাটন হয় না

অর্থনীতির প্রচলিত নিরিখে সচ্ছল না হলেও একেবারে নিঃস্বও ছিল না কায়েস। শিক্ষকতার স্বল্প আয়ের সাথে লেখালেখির সামান্য উপার্জন যোগ করে কোনোমতে টিকে থাকার মতো একটা সংসার গড়ে তুলেছিল সে উপার্জিত অর্থের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তার পাঠতৃষ্ণার খাই মেটাতে খরচ হয়ে গেলেও ওরই মধ্যে সে একটু একটু করে তার সংসারটাকে গুছিয়ে তুলেছিল। তাছাড়া প্রথম জীবনের কালো অভিজ্ঞতাগুলোও ওকে কখনো বেহিসেবি হতে দেয়নি। আর জীবনের প্রায় সবখানি জুড়ে নীলুর অবারিত সাহচর্য তো ছিলই। অতএব অর্থকষ্টের ইঙ্গিতটা ধোপে টেকে না।

কায়েসের স্ত্রীর আবাল্য অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অশান্তির যে প্রসঙ্গটা অনেকে তাদের আলোচনায় এনেছেন তার ভিত্তিও খুব মজবুত নয়। নিজের স্ত্রীর সম্পর্কে কোনো সংবাদই অজানা ছিল না কায়েসের। ওই অত্যন্ত অল্প

~ www.amarboi.com ~
বয়সের স্বল্পভাষী স্নিগ্ধ মেয়েটি যে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার মধ্যে যে হিস্টিরিয়ার মতো কিছু কিছু লক্ষণ আছে সে সম্পর্কে সব কিছু অবহিত ছিল বলেই ওই পরিবারের সবার স্পষ্ট অনীহা এবং শুভার্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাকে ভালোবাসার তীব্র আবেগ দিয়ে সুস্থ করে তোলার একটা সংকল্প নিয়েই ঘর বেঁধেছিল সে।

ভালোবাসা দিয়ে সত্যি সত্যি ব্যাধিকে জয় করা যায় কি না সে ব্যাপারে আমি মোটেও বিশেষজ্ঞ নই। তবে সবচাইতে কাছের মানুষটি যদি চূড়ান্ত দুঃসময়ে বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে আমাকে আগলে রাখে আর মমতার স্পর্শ দিয়ে আমাকে সুস্থ রাখার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করে যায় তাহলে তা আমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। হয়ত এরকম একটা ভালোবাসার আশ্রয় পেলে একজন অসুস্থ মানুষের মধ্যে ভেঙে পড়া আত্মবিশ্বাস, মনের জোর এবং সুস্থ হয়ে ওঠার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হতেও পারে। আর হয়ত সে জন্যেই জানুর পক্ষে কায়েসের মতো একজন বড় মাপের মানুষকে দ্বিধাহীন প্রেম দিতে, তার সন্তান ধারণ করতে এবং পরিপাটিভাবে তার সংসার চালিয়ে যেতে অসুবিধা হয়নি।

মনে আছে, শেষবার এক একুশের মধ্যরাতে দোয়েল চত্বরের মোড়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কায়েস, জানু, অনীক আর নীলুর সাথে দেখা হয়ে গেলে জানু আমাকে ওদের বাসায় যাবার অনুরোধ করেছিল। শেষপর্যন্ত পুরোপুরি নীরোগ হয়ে উঠতে না পারলেও জানু কখনো এতটা অসুস্থ ছিল না যে ক্লান্তিতে, হতাশায়, ব্যর্থতায় কায়েসের মতো এমন শক্তমনের একটা মানুষ এভাবে ভেঙে পড়বে।

তাহলে ? এমন কোনো কারণই তো খুঁজে পাচ্ছি না যার সাথে যোগসূত্র মেলানো যায়। সংযম ও সংগ্রামের মধ্যে বড় হয়ে ওঠা কায়েসের তো এমন কোনো দুরারোগ্য অসুখ ছিল না যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকে আত্মহননের মতো চরম পন্থা বেছে নিতে হবে তাছাড়া পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সটা এমন কোনো দুর্বল সময় নয় যে, মানসিক আঘাতের প্রচণ্ডতা সামলে নেবার মতো শক্তির অভাব ঘটবে। আর কায়েসের মতো একজন নীতিবাগিশ মানুষের পক্ষে তো এমন কোনো দুর্নীতি অথবা অপরাধ করাও সম্ভব নয় যার জন্য সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত কিংবা অপদস্থ হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

এরপর আর বাকি থাকে মানসিক অসুস্থতার বিষয়টা। প্রিয়বরেষু সুশান্ত, এইখানে এসে সঙ্গত কারণেই আমাকে কিছুটা থমকে যেতে হচ্ছে এবং পাল্টা একটা প্রশ্ন মনে জেগেছে যে, আজকের দিনে, আমাদের এই দেশে এমন বিশৃঙ্খল আর্থ-সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার মরিয়া সংগ্রামে লিপ্ত কোনো মানুষই কি মনের দিক দিয়ে পুরোপুরি সুস্থ, কিংবা সুস্থ থাকা কি সম্ভব ? আমার তো মনে হয় শুধু আমি কিংবা কায়েস কেন, আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যাদের সাথে দেখা হয়, যাদের সাথে কথা বলি, সে রকম প্রায় প্রতিটি মানুষই

~ www.amarboi.com ~
মনের মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণ ইনস্যানিটি নিয়ে বেঁচে আছে। কোনো অনুকূল পরিবেশে সেই সুপ্ত ইনস্যানিটি যদি জেগে উঠে আকস্মিক কোনো ঘটনা ঘটিয়েই ফেলে তাহলে তাতে অবাক কিংবা বিব্রত হবার কী আছে ?

মানসিকভাবে যদি আমরা সত্যি সত্যিই পুরোপুরি সুস্থ থাকতাম তাহলে ঝুঁকিহীন নিরাপত্তার জন্য সরকারি চাকরি, লাইসেন্স, পারমিটের ব্যবসা, কমিশনের দালালি কিংবা লজ্জাহীন চাটুকারিতার সাথে যুক্ত না হয়ে কেন সাহিত্য সাংবাদিকতার মতো অর্থ ও প্রতিপত্তিহীন, নিষ্ফল, ব্যর্থ আর অনিশ্চিত একটা জীবিকার সাথে জড়িয়ে পড়লাম ? সমাজ সংসারের প্রতি আমাদের এই দায়িত্বহীন আচরণও কি এক ধরনের মানসিক বিকৃতি নয় ?

৭.

সেই ১৪ জুনের মধ্যরাত থেকে শুরু করে এখনকার এই মুহূর্ত পর্যন্ত কায়েসকে নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি ; কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ওর এই পরিকল্পিত স্বেচ্ছামৃত্যুর পক্ষে সাফাই দেবার মতো যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না।

জীবনের অনেক ঘটনা ও দুর্ঘটনার সাথে আমরা দু'জন খুব নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলাম। আমার সমস্ত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও হাসি আর দীর্ঘশ্বাসের সাথে ওর স্মৃতি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যা থেকে আমি কোনোদিনই মুক্তি পাব না। অভিমানবশত শারীরিকভাবে দূরে সরে গেলেও মানসিকভাবে আমি এক মুহূর্তও ওর ভাবনা থেকে বিযুক্ত ছিলাম না।

কায়েসকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনতাম। তাই ওর সম্পর্কে আজকাল যেসব খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ আলোচনা হচ্ছে তার প্রায় সবই যেন দায়সারা গোছের মনে হয়। বয়সে ছোট হয়েও যে মানুষটা চিরদিন আমাকে জীবনের আশা ও সম্ভাবনার কথা বলে বেঁচে থাকার শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে, যে বলেছে সুস্থ জীবনবোধই হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর শিল্প, সেই মানুষটাই যে নিজের বিশ্বাস ও ভালোবাসার কাছে মার খেয়ে এভাবে আত্মসমর্পণ করবে তাও আমার মেনে নিতে ইচ্ছে হয় না।

তাহলে কি সেই বহুবার শোনা কথাটাকেও আবার নতুন করে বলব যে মানুষের জীবনে একেকটা সময় এমন আসে যখন যুক্তিহীন অথচ অমোঘ কোনো সংকটের মুখোমুখি হয়ে তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়, যখন তার পক্ষে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, আর পিছু হটে ফিরে আসার তো প্রশ্নই ওঠে না। হয়ত 'লাশকাটা ঘর' কবিতার সেই নায়কের মতো এ পৃথিবীতে সত্যি সত্যি এমন কিছু মানুষ আছে যাদের অন্তর্গত রক্তে ক্রিয়াশীল থাকে অদ্ভুত এক বোধ। ভাষায় যার বর্ণনা দেয়া যায় না অথচ যা জীবনের মতো সত্য এবং মৃত্যুর মতো অবধারিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিকারহীন যে বোধের তাড়নায় সেসব মানুষেরা হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া কোনো এক মধ্যরাতে মায়াবী কুহকের ডাক শুনে ভালোবাসার স্ত্রী, আদরের সন্তান আর সাজানো সংসারের আকর্ষণ ছিঁড়ে খুব চুপিসারে, কাউকে না ডেকে অজানার পথে চলে যায়, চলে যেতে হয়, যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না বলে, কে জানে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খঞ্জ মানুষ ও মৃত্যুর উৎসব

সুশান্ত মজুমদার

জীবন আত্মসাৎ করেও অসময়ের মৃত্যু মেনে নেয় কায়েস আহমেদের সাহিত্যের চরিত্রসমূহ। হোক সর্প দংশনে অস্বাভাবিক মৃত্যু, দাঙ্গা বা প্রতিবাদ জ্ঞাপনে মৃত্যু— কায়েস আহমেদের সাহিত্যে লেগে থাকে উপর্যুপরি মৃত্যুর উৎসব। যারা বেঁচে থাকে তাঁরা জীবন্মৃত, মন ও মননে খঞ্জ এবং আত্মপীড়ক কেন এই অস্বাভাবিক অস্তিত্ব ; কেন জীবনের নেই ফলবান সম্ভাবনা, আর কেনই বা জীবনকে অর্থবহ করে তোলা দুরূহ ! এটা অস্বীকারের নয় যে, জীবনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে বৈরী দুঃসময়— সমাজভূমি থেকে যার উত্থান। ব্যক্তিমানুষ নিয়ে রচিত যে সমাজ তাঁর তলদেশ খোড়ল করে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষয়-পতন ও বিনাশের সংকট। বিকাশরহিত মানুষের পায়ে পায়ে বজ্র আঁটুনি— কোথায় নিষ্কৃতি, তাঁর দখলে নেই প্রয়োজনীয় মুক্তি। যে পরিপ্রেক্ষিতে, বিভাজনে যে শ্রেণীতে মানুষের বাস তা মানুষের জন্য ছড়িয়ে রেখেছে গ্লানি ও ব্যর্থতা। রুগ্নতা এবং অমোচনীয় দুঃখই বুঝি মানুষের ভবিতব্য। মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বে যে অনিবার্য সমর-সম্পর্কের উদয় সেখানেও কতক্ষণ লড়ে যেতে পারছে ভুক্তভোগী মানুষ। এসব প্রশ্ন, চিন্তা ও বক্তব্যে গড়া কায়েস আহমেদের কথাসাহিত্য। তবে কি তিনি নিজস্ব সাহিত্যশিল্পে ব্যক্তিমানবের বিনাশই ধারণ করতে চেয়েছেন ; না, নানা আবরণে জীবনের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেননি তিনি— কোনো তত্ত্বীয়, কেতাবি বা লেখকমনের আশাবাদ চড়িয়ে দেননি তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রে। চরিত্ররা অনাবশ্যক লড়াকু নয়— লেখকের ইচ্ছাপূরণ তৎপরও নয়। যে রূপে মানুষের অবস্থান-জীবনমন্থনের বিশদ হলাহল, ক্ষোভ, প্রতিবাদ, কোলাহল তাঁর সারাৎসার নিয়ে কায়েস আহমেদের কথাসাহিত্য। বড় নির্মম কাজ— মোহ ভক্তি উচ্ছ্বাস খারিজ করে নির্দয় কঠিন বাস্তব নিয়ে মোকাবেলা। সদর-অন্দরের বিরুদ্ধ ভ্রুকুটির সামনে চরিত্রের এবং স্বয়ং লেখকের বোঝাপড়া। খানিকটা দয়ামায়া লেখকের যা ছিল তা প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্ধ তীরন্দাজ*-এ। চরিত্রে এবং পশ্চাৎপট বর্ণনায় কিছুটা ছিল মিষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমেজ— মানুষ উদ্দেশ্যহীন এবং ভেতরের ধস অপ্রকাশিত। কোনো কোনো গল্প বিদেশি সাহিত্যের পঠন-পাঠন দ্বারা প্রভাবিত। তারপর গল্প বলার মুখরতা ত্যাগ করে রুক্ষ, কর্কশ, জলশূন্য এবং ভস্মীভূত পটভূমিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কায়েস আহমেদ আর প্রশ্রয় দেননি ভাবাবেগ। রীতিমতো চরিত্রের ময়নাতদন্ত এবং তাঁর অবস্থানের কাটাছেঁড়া করে কায়েস আহমেদ এই বিবেচনা পাঠকের কাছে গচ্ছিত রাখেন যে জীবন আজ শাঁসশূন্য, জীবনের আবশ্যক শর্ত পূরণও দুঃসাধ্য— প্রতিপক্ষ দমন ও রক্তপাত ছাড়া মানুষের জন্য আর কিছু বরাদ্দ করেনি।

প্রচলিত দশকওয়ারি ভাগে কায়েস আহমেদের সাহিত্যচর্চা ষাটের দশকে। তাঁর আগে অগ্নি-অশ্রু-মৃত্যুর ভেতর দিয়ে সংঘটিত হয়েছে দেশভাগ। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তুমুল জঙ্গি জোশে শিল্প-সাহিত্য বিকাশের পরিবেশ ছিল অনুপস্থিত। তমুদ্দনি প্রেরণায় যে সাহিত্য রচিত হয় তার মধ্যে না ছিল শিল্প, জীবন, বাস্তবতা এবং সৃষ্টিশীল লেখকের খোঁজ। ভাষা আন্দোলনে মোহমুক্ত মানুষ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নাকচে অর্জন করে উপলব্ধি ও জাগরণ। এর আলো ও উত্তাপ পতিত হয় সাহিত্যের হৃৎপিণ্ডে। পশ্চাৎপদ, অনাধুনিক ও সাহিত্যাদর্শ শাসন করেছে সিংহভাগ। বিভাগোত্তর সাহিত্য ষাটের দশকে এসে তাঁর ব্যাপক রূপান্তর। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের যে মুষ্টিমেয় সচেতন লেখক জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ায় ধাক্কা দিয়েছিলেন তাঁদেরসহ ষাটের সম্মিলিত প্রয়াসে ভেঙে পড়ে চিন্তার দাসত্ব। ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকে লেখকরা গ্রহণ করেন অসাম্প্রদায়িক প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। ভাঙতে থাকে সামাজিক জাড্য। ওপর কাঠামোর মেরুকরণে গ্রামের শরীরে যাতায়াত চালু করে শহর, যে শহর রং পালিশ পেয়ে গড়ে ওঠে। মাটির পৃথিবী থেকে বিতাড়িত মানুষ অন্নসংস্থানে এবং উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত সুযোগসন্ধানী মানুষ এসে আশ্রয় নেয় ইটকাঠের লোভনীয় শহরে। মানুষের ভেতর থেকে সুস্পষ্ট আকার-প্রকার পেয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে মধ্যবিত্ত। পঞ্চাশের কথাসাহিত্যেও যেখানে গ্রামীণ পটভূমি ছিল মুখ্য, সেখানে ষাটের দশকে শহর পরিপ্রেক্ষিত দখল করে সাহিত্যের জায়গা। এই পরিবর্তন ও গ্রহণ-বর্জনে মনোযোগ রেখে কায়েস আহমেদের সাহিত্যচর্চার সূচনা। এখানকার জলহাওয়া, অস্থিতিশীল সমাজ ও ক্ষুব্ধ আবহে তিনি ক্রমবর্ধিত হলেও আমৃত্যু তিনি লালন করেছেন পশ্চিম বাংলার হুগলি জেলার বড়তাজপুর গ্রামের পটভূমি যে পারিপার্শ্বিকতা ছিঁড়ে শৈশবে এপার বাংলায় তাঁর আগমন। দেশভাগজনিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার তাঁর পরিবার। তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ এবং বেদনা নিয়ে তিনি বিবেচনা করেছেন দেশভাগ। মর্মবেদনায় জর্জর হয়েও উদ্বাস্তুর দুঃখবাদ ক্রিয়া করেনি কায়েস আহমেদের লেখক মানসে। তাঁর চিন্তায় ছিল না বাসভূমিবিচ্যুত উন্মূল মনোবৃত্তি। কোন রাজনীতির ছুরিতে বিভক্ত সীমানা, কোন স্বার্থে—এ সম্পর্কে ধারণাযোগে কায়েস আহমেদ তাঁর

~ www.amarboi.com ~
সাহিত্যে ধারণ করেছেন দেশভাগের দাঙ্গা, মৃত্যু এবং মাটি হারাবার যন্ত্রণা। সেই রক্তাক্ত ঘটনা নিজের সাহিত্যে স্থান দিয়ে তিনি আমাদের ইতিহাসের একটি নির্মম ট্রাজেডিকে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

দু'টি গল্পগ্রন্থ *অন্ধ তীরন্দাজ*, *লাশকাটা ঘর*, দুটি মিত কলেবরের উপন্যাস *নির্বাসিত একজন*, *দিনযাপন*-এ কায়েস আহমেদ ছড়িয়ে রেখেছেন মানুষের বিভিন্ন তরঙ্গ। হত, আহত, বিষণ্ন, লাঞ্ছিত মানুষের পাশাপাশি দাঙ্গাবাজ, ঘাতক, উগ্র মানুষ— একদিকে মূল্যবোধ হারানো বিপন্ন মানুষ, আরেকদিকে বিনাশকারীর অবস্থান তাঁর সাহিত্যে শনাক্ত করা যায়। এসব মানুষের বসবাস কোনো না কোনো শ্রেণীতে। শ্রেণীতে বাস করে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে চরিত্র অস্বীকার করতে পারে না। কায়েস আহমেদের আছে সরাসরি রাজনীতি সংশ্লিষ্ট গল্প, তেমনি আছে ব্যক্তিবিশেষের নিঃসঙ্গতা : নিজ বৃত্তে ঘাড় গুঁজে জমে থাকার তৎপরতার গল্প। 'অন্তর্লীন চখাচখী', 'যাত্রা', 'বন্দি দুঃখসময়', 'খঞ্জ রোদে শালিক ফড়িং', 'বিবমিষা', 'সম্পর্ক', 'গন্তব্য' গল্পের নিরুত্তাপ চরিত্রসমূহের মানসিক অসুখ, কারো ব্যক্তিজীবনে রয়েছে সমস্যা, কেউ স্বপ্নে দেখে জলের বৃত্তে বন্দি পিঁপড়ার আঁকুপাকু, কারো মাথার ভেতর বিমর্ষ ভাবনা, কেউ নিজের চৌহদ্দিতে খুঁজে পায় স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা, কেউ অনন্ত শীতল নৈঃশব্দ্যের ভেতর থেকে খুঁজে আনে অনুভব। বিচ্ছিন্ন, নিষ্প্রভ ও নিষ্কৃতিসন্ধানী এসব সীমাবদ্ধ মানুষও কোনো না কোনোভাবে সমাজসংলগ্ন। সমাজই তাদের ভেতর যোগান দিয়েছে সিদ্ধান্তহীনতা এবং নিরাময় অযোগ্য মনোব্যাধি। এটাও এক রাজনীতি যে রাজনীতি মানুষকে দেবে না মেরুদণ্ড, সংঘ এবং নিজেকে বদলানোর উৎসাহ। আত্মরক্ষার জরুরি কৌশল হিসেবে মানুষের তাই অধিক প্রিয় আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপ। সুস্থতা, জীবনস্বপ্ন, লড়াই, ভালোবাসার প্রত্যাশায় খণ্ডিত ও হতশ্রী জীবন প্রত্যাখ্যানে মানুষের নেই নিরন্তর ভাঙার প্রয়াস। কিন্তু যারা পুরনো ও প্রচলিত জীবন প্রবাহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, সাংগঠনিক বা ব্যক্তিগত শ্রেণীক্রোধে শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাঁরা হারিয়েছে অস্তিত্ব। এমন প্রত্যক্ষ রাজনীতি উপস্থিত কায়েস আহমেদের 'মহাকালের খাঁড়া', 'নিয়মিত আলীর জাগরণ', 'দুই গায়কের গল্প'-এ। শিহরণ ও উত্তেজনা তুঙ্গে নিয়ে যায় 'মহাকালের খাঁড়া' গল্পটি। এই গল্পে কায়েস আহমেদ নকশালী কার্যকলাপ গৌরবমণ্ডিত করেননি, আবার তুচ্ছাতিতুচ্ছ করে তোলেননি। লেখকের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করে তুমুল আলোচিত ও রোমাঞ্চকর একটি শক্তিশালী বিষয় তিনি পাঠকের বিবেচনার কাছে পেশ করেন মাত্র। গল্পটি রচনায় লেখক কায়েস আহমেদেরও শিল্পের সংযম রক্ষার পরীক্ষা হয়ে যায়। পরোক্ষ রাজনীতি আছে 'পরাণ' ও 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে ও মালপদিয়ার রমণী মুখুজ্জে' গল্পে। 'পরাণ' গল্পে জেলে সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, নেতৃত্ব নিয়ে দলাদলির মধ্যে হরেন্দ্র মাঝির বোধোদয়— 'না, এই দ্যাশে আর থাকন যাইবো না। শ্যাক সাবরে ভোট দিলাম সুকে থাকনের

~ www.amarboi.com ~

লেইগ্যা। নয়টা মাস কুত্তা বিলাইয়ের মতন পরান লইয়া পলাইয়া পলাইয়া কাটালাম। দ্যাশ স্বাধীন ওইলো। অহন দাখতাছি চোর দাউরের রাজত্ব। খাইয়া সুখ নাই, পিন্দা সুখ নাই, ঘুইরা ফিইরা সুখ নাই, মানুষের চোখগুলাও কেমুন ব্যাকা ওইয়া গেছে।' তীব্র সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা ও চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত অর্থনীতির কবলে পতিত মানুষ কি হরেন্দ্র মাঝি থেকে পৃথক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে ? 'খাইয়া সুখ নাই, পিন্দা সুখ নাই, ঘুইরা ফিইরা সুখ নাই'—এটা তো সর্বজনীন জবানি। মানুষের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা তাড়িত আহাজারির সঙ্গে যোগ হয় আশাভঙ্গের বেদনাও। আর, 'না, এই দ্যাশে আর থাকন যাইবো না'— এটা বানানো তথাকথিত সংখ্যালঘুর শরণার্থী ভাবের মনোসংবাদ নয়। সম্প্রীতি ও মানবতার জন্য অপমান যার প্রণেতা বিশেষ স্বার্থান্ধ শ্রেণী এবং এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে শক্তি, দল ও সরকার। মালপদিয়ার বৃদ্ধ রমণী মুখুজ্জের জীবনাবসানের অপেক্ষা করছে পুত্র-জমিজমা বিক্রি করে দিয়েছে, পিতার মৃত্যুর পর দেশত্যাগ করবে কেন নিজ জন্মভূমি ছেড়ে পরবাস ? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে দেখার প্রবল টানে লেখক ওই মালপদিয়া পৌছান এবং রমণী মুখুজ্জের পুত্রবধূর প্রশ্নোত্তরের পরিচয় দেন— তারা মুসলমান তখন চমকে যায় বধূটি। কেন ? ভেদবুদ্ধিশাসিত মানসিকতা সাধারণ মানুষের ভেতর কারা সরবরাহ করে ; সেই একই স্বার্থান্ধ সাম্প্রদায়িক শ্রেণী যারা রাজনীতিতে ও সমাজে সক্রিয়। কিন্তু নির্ভুল প্রতিক্রিয়া প্রকাশে কায়েস আহমেদ দ্বিধা করেন না— 'মনে মনে বলি, পরিচয় পেয়ে ওই যে তিনি হঠাৎ রান্নাঘরের দরজার খুঁটি ধরলেন, ওই যে চোখের তারা কেঁপে উঠল, ওই যে দৃষ্টিতে ছায়া পড়ল— ওসব দেখে আহত হয়ো না, লজ্জিত হও। এ তোমার এ আমার পাপ।' একই পাপের শিকার হয়েছে *নির্বাসিত একজন* উপন্যাসের খোকাও। দেশভাগের সময় পশ্চিম বাংলার খোকার বোন ধর্ষিতা, বড়ভাই নিহত, মা মৃত্যু বসতবাড়ি ভস্মীভূত। নিরীহ, সরল জীবনযাপনকারী নির্দোষ মানুষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁর ওপর হামলে পড়েছে ধর্মের ছবি সহায়-সম্বলহীন খোকাকে তাই পালাতে হয় অচেনা-অজানা বিদেশ বিভূঁইয়ে। এখানে তাঁর নতুন নাম, নতুন পরিচয়— রিফ্যুজি। পরিত্রাণের সন্ধানে পলাতক, নিজের জগৎ থেকে বিতাড়িত খোকা রিফ্যুজি হওয়ার মর্মান্তিক পরিণতি এবং এর পেছনের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে 'রিফ্যুজি মানে কী ? উদ্বাস্তু ? তাঁর মানে যার বাড়িঘর নেই ? কিন্তু আমার তো বাড়িঘর আছে। তবু আমি রিফ্যুজি, কেননা আমি দেশহারা। এই তো ? তাহলে সেই যে ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীনতা-হিন্দুস্তান, পাকিস্তান— সে কি মানুষকে রিফ্যুজি বানাবার জন্যেই ? না হলে হিন্দস্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে পাকিস্তানে আসছে কেন ? কিংবা হাজারে হাজারে মানুষ একইভাবে কেন পাকিস্তান থেকে চলে যাচ্ছে হিন্দুস্তানে ?' খোকার এই বোধ উত্থানে প্রকাশ হয়ে পড়ে দেশভাগের অসারত্ব। কিন্তু দেশত্যাগ না করেও মানুষের ভেতর থেকে যায়

~ www.amarboi.com ~
উদ্বাস্তুর অসহায়ত্ব, ভীত মানসিকতা এবং হারাবার আশঙ্কা, এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায় পুরনো ঢাকার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবনের চালচিত্র নিয়ে কায়েস আহমেদের লেখা *দিনযাপন* উপন্যাসে। মনোতোষের রাজনীতি করা অপছন্দ করে তাঁর স্ত্রী জয়া— 'থাকি হ্যাকেগো দ্যাশে, হ্যাগো মাথা গরম, কুনসুম কি অয় কওন যায় ? আমরা অইলাম গিয়া ইন্দু মানুষ, আমাগো অত মাথা ব্যথা ক্যান ? হ্যাগো দেশ হ্যারা যেমনে মনে লয় চালাউ গা, তোমার অত রাজনীতির আউস ক্যান ?' মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা জয়ার এই বক্তব্য যতই সমর্থনের অযোগ্য হোক তবু এটাই বাস্তবতা। ধর্মের বিভক্তি রচনা করে যাদের আপত্তিকর সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য করা, পরিচয় চাপিয়ে দেয়া, তাঁরা মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে নিজেদের দেশ মনে করতে দ্বিধাগ্রস্ত। কেন এই বিভ্রান্তি ; কায়েস আহমেদ থেকে ঋণ করে এর উত্তর— 'আহত হয়ো না, লজ্জিত হও। এ তোমার এ আমার পাপ।'

এখন প্রশ্ন যে-সব ছোটগল্পে এবং উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনীতি উপস্থিত তা কি লেখক কায়েস আহমেদের বিশেষ ইচ্ছা বা নির্দিষ্ট আইডিয়া পূরণের উপায় মাত্র ? এমন অভিযোগ দাঁড়াত যদি বিষয় উপযুক্ত লিপিকৌশলে গল্প উপন্যাস না হয়ে উঠত, কিংবা শিল্পের মান ক্ষুণ্ন হতো। তাই বলে কায়েস আহমেদের সাহিত্যে রয়েছে শিল্পের চূড়ান্ত উৎকর্ষ— এমন গোঁয়ার ও অন্ধ দাবিও যৌক্তিক নয়। বিষয়কে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করার যে সচেতন প্রয়াস তা কায়েস আহমেদ আয়ত্ত করেছিলেন। বিষয়কে গড়েপিটে নেয়ার এই কাজে বাবুআনা নেই। বিশেষ করে কায়েস আহমেদ সেই বিষয় নির্বাচন করেছেন আদৌ যা বন্য জনরুচির অনুকূলে নয়। রূঢ় ও নিষ্ঠুর বাস্তব এবং দুঃসহ কঠিন বর্তমান শিল্পে রূপদান রক্তপাতের সামিল। লুণ্ঠিত, শোষিত, অপমানিত তৃতীয় বিশ্বের এই দেশের একজন সজাগ লেখকের দায়িত্ব পালনে কায়েস আহমেদ কেবল রাজনীতিমনস্কই ছিলেন না, মানুষের সূক্ষ্ম ও মোটা বোধ, অনুভূতি, বৃত্তিও গুরুত্ব দিয়ে অনুমোদন করেছেন। মানুষের ভেতর তিনি সম্ভাবনাও খুঁজেছেন এবং তা প্রকাশ করে জানাতে চেয়েছেন জীবনের জন্য এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। 'দুই গায়কের গল্প' গল্পে নকশালদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযানকালে গুলিতে হরিদাস মারা যায় তাঁর সঙ্গী অন্ধ গায়ক জগন্নাথ তখন সমস্ত দুনিয়াকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য হারমোনিয়ামটা হ্যামারের মতো করে দু'হাতে উঁচিয়ে ধরে। 'নিয়ামত আলীর জাগরণ' গল্পে পাগলাটে স্বভাবের নিয়ামত আলীকে নকশাল সন্দেহে পুলিশ গ্রেফতার করে। নিয়ামত আলীর ঊর্ধ্বমুখী হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, গ্রীবায়, দুই চোয়ালে এবং চোখে অখণ্ড শানানো দৃঢ়তা এসে যায়। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে ও মালপদিয়ার রমণী মুখুজ্জে'তে বিমল যেখানে দেশত্যাগের জন্য পিতার মৃত্যু প্রতীক্ষায় বসে থাকে, সেখানে ডাকাতের বল্লমের খোঁচা খেয়েও মোহান্ত মণ্ডল বলে, 'নিজের বাড়িঘর নিজের জায়গা জমিন থাকতেই হবে।' খাঁটি কৃষক মোহান্ত মণ্ডল মৃত্তিকানির্ভর, তাঁর মধ্যে নেই সেন্টিমেন্ট, কৌলীন্যের অহঙ্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চ্যালেঞ্জ দিয়ে সে লড়ে যেতে চাইছে। রূপকাশ্রিত গল্প 'নিরাশ্রিত অগ্নি'তে ফজর আলী দংশিত হয়েও লাঠির আঘাতে চন্দ্রবোড়া সাপের মুকুটপরা রাজকীয় মস্তক ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এইসব চরিত্রে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধসহ বিভিন্ন সম্ভাবনা চকিতে উপস্থিত হয় বটে—চরিত্রের প্রয়োজনীয় তাপও সঞ্চার করে, কিন্তু স্থায়ী হয় না। অচিরেই চরিত্র নিজেই তাঁর অক্ষমতার কারণে নিজেকেই শাস্তি দেয়। নিজের উন্মেষ ও অযোগ্যতার ঘাটতি পূরণে অনাচার, কি স্বেচ্ছাচারে আশ্রয় নেয়। 'জগদ্দল' গল্পে শ্মশানঘাটে বসে মদপানরত যুবকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের সিদ্ধান্ত গাড়ি ছিনতাই, ব্যাংক লুট, মেয়ে হাইজ্যাক, চিতার আগুনে ঝাঁপ। নিজেদের ভেতর থেকেই এই কাজের রায় দেয়া হয়—'পারবি না।' শেষাবধি স্বমেহনের কথা ওঠে যার মধ্যে নেই পৌরুষত্ব। নিজেকে পীড়িত করার অর্থ শক্তি ও উদ্যোগের অপচয়। *নির্বাসিত একজন* উপন্যাসের নায়ক খোকাও সবল চরিত্র নয়। ব্যর্থতার গ্লানি তাঁর ভেতর তেজ এনে দেয় না। এক সময় সে আত্মহত্যায় প্ররোচিতও হয়েছিল। মাত্রাতিরিক্ত চাপ বহনে অক্ষম খোকা শেষপর্যন্ত একটি নাটকীয় হত্যাকাণ্ড করে পালিয়ে আসে। রিফ্যুজি হবার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সে ঋজু চরিত্র ধারণ করে না। *দিনযাপন* উপন্যাসের বাসুদেব তাঁর অক্ষমতাকে রূপান্তরিত করে রমণে 'রাইতদিন ঠাকুর পো ! ঠাকুর পো ! ক্যান, অতো মাখামাখি ক্যান' বলে, বসুদেব স্ত্রী সর্বাণীর বস্ত্র অপহরণ করে আর তাদের মধ্যম পুত্রটি ঘুম ভেঙে বাবার কংস মূর্তি, চাপাগর্জন এবং উলঙ্গ মাতৃদর্শন করে। কায়েস আহমেদের চরিত্রদের এই প্রতিক্রিয়া লেখকের বানোয়াট, কোনো আকস্মিক ঘটনা বা নৈরাজ্য থেকে সৃষ্টি নয়। সমাজে ব্যক্তির যে তীব্র সংকট, চরিত্রের যে অপরিণাম, অনির্দিষ্ট অসম্পূর্ণ জীবন, বিঘ্নিত সংহতি, রুগণতা তারই স্বাভাবিক প্রকাশ। এমন গলদঘর্ম শিল্প সৃষ্টিতে কায়েস আহমেদ নিশ্চিত করেছেন তাঁর সাফল্য। নিজ জীবন পোড়ানো ভস্মে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সমষ্টির জীবনালেখ্য। দুর্বিনীত বাস্তবের কেশর ধরে নিরন্তর মোকাবেলার কাজ যে সুবিধা ও সুখের নয় তার প্রমাণ তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন দুটি উপন্যাস ও দুটি গল্পগ্রন্থে। পরিপূর্ণ বিকাশের আগে, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির প্রত্যাশা না করে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অন্যতম সৎ, জীবনবাদী ও শক্তিশালী লেখক কায়েস আহমেদ নিজ হাতে সাঙ্গ করেছেন জীবন। শারীরিকভাবে তিনি আজ অতীতের অংশ হলেও তাঁর আয়ুষ্মান সাহিত্যের কাছে বর্তমান এবং ভাবীকালের সজ্ঞান পাঠককে ফিরে যেতে হবে নিজেদের চরিত্র ও অবস্থান উপলব্ধির জন্য, প্রতিরোধের জায়গাটি খুঁজে পাবারও জন্য।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঠপ্রসঙ্গ

উপন্যাস

কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ। চলচ্চিত্র ও সাহিত্য মাসিক *জোনাকী*র ঈদ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা : অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১-তে প্রকাশিত। ছাপা হয়েছিল : ৬৫ পৃষ্ঠা থেকে ৬৯ পৃষ্ঠা ; এরপর '১০৮ পৃষ্ঠায় দেখুন', ১০৮ পৃষ্ঠা থেকে ১২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। মিতায়তন এই উপন্যাসটি কায়েস আহমেদ গ্রন্থিত করেননি, পরিচিত কারও কাছে এটির উল্লেখও করেননি। তবে এটি কোনোক্রমেই গল্প নয়, গল্পের আকৃতির সঙ্গে মিল থাকলেও। এই পর্বের অন্য গল্পের সঙ্গে এই রচনার মিল আছে কমবেশি, বিষয় ও লিপিকৌশলে। অন্তত *অন্ধ তীরন্দাজের* (১৯৭৮) গল্পগুলোর সঙ্গে তো বটেই।

সম্প্রতি একটি সূত্র পাওয়া গেছে। দূর থেকে হলেও *জোনাকী* পত্রিকায় *কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ* মুদ্রিত হওয়ার বেশ কাছাকাছি যাওয়া যায় তাতে। *সমকালের* শুক্রবারের সাময়িকী কালের খেয়ায় (২৩ জুন ২০০৬) 'সময়ের বয়স' শিরোনামে একটি লেখায় কথাসাহিত্যিক বুলবুল চৌধুরী কায়েস আহমেদ ও আবুল হাসানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের স্মৃতিচারণ করেছেন : 'হাসানের ছিল বোহেমিয়ান স্বভাব। নিজের মাঝে তার কতেক আঁচড় ছিল বিধায় অমন সঙ্গ পেয়ে আমিও উড়তে থাকি। ফলে পরিবার ছেড়ে বংশাল রোডে আলাদা বাসায় উঠে যাই। *জোনাকী* নামের একটি মাসিক সিনে পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের চাকরি পাওয়া নিজের আয়ে ব্যয়ভার ভালোই চলে যাচ্ছিল।' সম্ভবত এই সময়ে বুলবুল চৌধুরীর অনুরোধে কায়েস আহমেদ উপন্যাসটি রচনা করেন, তাঁর বন্ধুর কাগজের জন্য। উল্লেখ্য, এই লেখাতে বুলবুল চৌধুরী জানিয়েছেন, কায়েস আহমেদের প্রথম মুদ্রিত গল্পের নাম 'চোর'। ছাপা হয়েছিল বাংলাবাজারস্থ কে এল জুবিলী হাই স্কুলের বার্ষিকীতে। কায়েস আহমেদ তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র।

প্রাবন্ধিক মাসুদ রহমান এ প্রসঙ্গে ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪ : ১৩ জুন ১৯৯৭-এর *ভোরের কাগজ* সাময়িকীতে বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ প্রবন্ধ লিখেছেন। বিস্মৃতি আর অজ্ঞাত অবস্থা থেকে এই রচনাটিকে উদ্ধার করেছেন তিনিই। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে সম্পূর্ণ রচনাটি উদ্ধৃত করা হলো :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কায়েস আহমেদের অগ্রন্থিত উপন্যাস
'কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ'

মাসুদ রহমান

১৪ জুন ১৯৯২ কথাশিল্পী কায়েস আহমেদের (১৯৪৮-১৯৯২) আত্মহত্যা ছিল সকলের কাছে সপ্রশ্ন শোকের, কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত জীবনবাদী লেখক। নিরীক্ষাপ্রবণ কায়েস শিল্পের সীমানায় কখনো বৈশ্যচিন্তাকে স্থান দেননি। আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল তাঁর। শিল্পীসত্তাকে একটু আপস করিয়ে জনরুচির সঙ্গে মেলালেই উদ্ধার পেতে পারতেন, তা করেননি। এসব কারণে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ স্বল্প। দু'টি করে গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস এবং একটি জীবনীগ্রন্থ– মোট ৫টি গ্রন্থ তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* শীর্ষক সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মৃত্যুর পর। এছাড়া পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল মুষ্টিমেয় রচনা।

মৃত্যুর কয়েক মাস বাদে (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩) সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম নিয়ে বের হয়েছিল *কায়েস আহমেদ সমগ্র*। সংকলনটির সম্পাদকের নাম ছিল অনুল্লিখিত। তাঁর দক্ষতাও অনস্বীকার্য। তবে দ্রুততাজাত অসম্পূর্ণতা সে গ্রন্থে অনিবার্যভাবেই ছিল। ১৯৯৪ সালে সুশান্ত মজুমদারের সম্পাদনায় বের হয়েছিল স্মারকগ্রন্থ *কায়েস আহমেদ : নিরাবেগ বোঝাপড়া*। সম্পাদকের তাতে বিশেষ প্রয়াস ছিল অপ্রকাশিত রচনা উদ্ধারের।

কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ উপন্যাসটি *কায়েস আহমেদ সমগ্র*-এ স্থান পায়নি, স্মারক গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়নি। এটি প্রকাশিত হয়েছিল সিনেমা মাসিক *জোনাকী* পত্রিকার ১৯৭৪ সালের ঈদ সংখ্যায়। পাঠক-সমালোচকদের এটি এড়িয়ে যাওয়ার কারণ অজ্ঞাত। সম্ভবত সিনে-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হওয়ায় লেখাটি কায়েস আহমেদের মূল পাঠকদের অলক্ষ্যে থেকে গেছে। লেখক নিজেও মনে হয় তাঁর এই সৃষ্টিকে পরবর্তীকালে উপেক্ষা করে গেছেন। আমরা 'উপেক্ষা' শব্দটি এই কারণে ব্যবহার করলাম যে, উপন্যাসটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *অন্ধ তীরন্দাজ* (১৯৭৮) প্রকাশেরও ৪ বছর আগে পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেননি।

কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ-এ কায়েস আহমেদের উপন্যাসচিন্তার প্রায় সকল লক্ষণই উপস্থিত। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতোই এটি ক্ষুদ্রকায়। বলা যায় ক্ষুদ্রতম। পত্রিকার মাত্র ১৮টি পৃষ্ঠা এর জন্য ব্যয়িত হয়েছে। এর মধ্যেই কায়েস একটি সামগ্রিক জীবনচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন এবং তা প্রচলিত গল্পকথার রীতিতে নয়। কায়েস সাধারণত বর্তমান নামের ক্যানভাস গ্রহণ করেন। মাত্র একটি গাঢ় রঙের কয়েকটি আঁচড়ে আঁকেন ছবি। বহুবর্ণিল মনোলোভা দৃশ্য অঙ্কনের চিত্রকর তিনি নন। ঘটনার ঘনঘটা তাতে থাকে না। যতটুকু থাকে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনাও পাওয়া যাবে। মনে হবে কাহিনী যেন শ্লথ হয়ে পড়ছে, গল্পরস পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে কাহিনী রয়েছে। আর তা বাস্তব জীবনের মতোই সাদাটে, শ্লথ। গল্পরসও আছে; আরো গভীরে, উষরতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনেক নিচে। সেখানেই পাঠককে পৌঁছুতে হবে নিজের যোগ্যতায়– এ উপন্যাসেও তাই-ই দেখি।

'ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে মেজো ছেলে তার বউকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।' এই একটি বাক্যই প্রথম অনুচ্ছেদ। বেশ ঝাঁজালো বাক্য, গুরু-বর্ণনা, ঘটনাবিরল কায়েসের উপন্যাসে এটিই বড় ঘটনা। আর যা আছে তা সব এই কাণ্ড-কাহিনীর শাখা-প্রশাখার মতো নরম শীর্ণ। অবশ্য সব মিলিয়েই বৃক্ষের বিস্তার। এই মেজো ছেলের বাবা আশফাক চৌধুরী কেন্দ্রীয় চরিত্র, যিনি হঠাৎ ঐ রকম দৃশ্য দেখে প্রথমত অস্থিরতা বোধ করলেন। সেই সঙ্গে গ্লানি। গ্লানি এ কারণে যে 'অন্যমনস্ক হলেও খোলা জানালার দিকে তাকানো তার মোটেই উচিত হয়নি– ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে তাদের বিয়ে হয়েছে এখন তো সবসময় সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে।' এবং এক সময় মনে মনে ঐ নাজুক দৃশ্যটি থেকে স্বস্তি ও তৃপ্তি আদায়ও তিনি করে নিলেন। কারণ ছেলের ও বউয়ের মধ্যে যে সদ্ভাব আছে তার তো প্রমাণ পাওয়া গেল। যেন তার কোনো আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হলো। তাদের সুখী হওয়ার আশীর্বাদ দিলেন মনে মনে। এই সমীকরণ ও সিদ্ধান্ত যে সরলভাবে হলো তা নয়। পরিস্থিতি পুরোযায়ী প্রবোধ দিলেন মাত্র। তিনি তো 'যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-হানাহানি-দেশভাগ তারপর '৭১-এর ন'মাস' ইত্যাদি কম দেখেননি। আশফাক চৌধুরী এসবের মধ্য দিয়ে একটি জীবন কাটিয়ে আজ বার্ধক্যে। ভালো করেই জানেন, 'সুখ বড় লাজুক– দুঃখ অশেষ।'

বাকি ঘটনা বা বর্তমানতা এরই তথ্যগত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা। তার মেয়ে ছবি দুই পুত্রের পর এই তৃতীয় সন্তান জন্ম নেয়ার সময় জননীকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল। সে আজ বি এ পাশ করেছে। চাকরিও করে। কিন্তু পিতার দীর্ঘশ্বাসেরও উৎস। অজ্ঞাত কারণে সে বিয়ে করেনি। সে কারণ জানিয়ে একটি কাহিনী ফাঁদা যেত। কায়েস আহমেদ উপন্যাসে সে মেদ জন্মাতে দেননি। আবার এও বলতে পারি, একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ও কারণের অপরিহার্যতা কোথায়? কত কিছুই তো ঘটতে পারে একজীবনে, যে জন্য একটি মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিতা স্বেচ্ছায় আইবুড়ি থেকে যায়। আসলে এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র আশফাক চৌধুরীর বেদনাবোধটাই মূল বিষয় এবং তিনি বিস্মিত বিপন্ন হচ্ছেন জীবনের এই রহস্যময়তা দেখে যে, 'এতোটুকু মাংসের একটা পিণ্ডের মতো, রাত জেগে কোলে নিয়ে পায়চারি করে করে কান্না থামিয়েছেন, সেই মেয়েকে তিনি পিতা হয়েও যেন নাগাল পাচ্ছেন না।'

তাই বলে ছবি গুরুত্বহীন চরিত্র নয়। আশফাক চৌধুরীও আবার স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্র নয়। সমগ্র পরিবারের স্থিতি তিনি। তাই ছবির চিত্রটি আরো এক পরতে এঁকেছেন লেখক। ছবিকে দেখা যায় জ্যোৎস্নারাতে ঘর থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছে উঠোনের ডালিম গাছের তলায়, একাকী। লেখক বলছেন, নীল-নরম জ্যোৎস্না, অর্থাৎ সে নৈঃসঙ্গ্যের বেদনায় আনত। মধ্যবিত্ত জীবনে এই একাকিত্ব যেমন আছে, তেমনই আছে পারিবারিক প্রীতি-প্রেমের ধারা।

~ www.amarboi.com ~

তাই ছোটো ভাই টিপুর বুকটা ব্যথায় টন টন করতে থাকে। ভীষণ কষ্ট পায় সে বোনের জন্য। এই তো, কিছুদিন আগেও তারা এক ঘরে শুতো। পরদিন সে ছবির ঘরে শুতে আসে। ছবি বোঝে তার ভাইটি এবার ভয় পেয়ে তার কাছে থাকতে আসেনি। এসেছে বুবুকে পাহারা দিতে, যদি সে সুইসাইড করে। পুরো ৪টি পরিচ্ছেদ জুড়ে তো লেখক এঁকেছেন এই পরিবারের একটি সানন্দ সময়ের ছবি। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা সেই পারিবারিক আবহকে কিছুটা হলেও আঘাত করেছে। বড় ছেলে ভিন্ন জায়গায় সংসার পেতেছে। মেজো ছেলে আলতাফের কথাবার্তা পিতা আশফাক চৌধুরীকে ভাবিয়ে তুলেছে যে, তার অবর্তমানে দুঃখী মেয়েটা ভয়ংকর অসহায় অবস্থায় পড়ে যাবে। এভাবে দেখি, একজন আশফাক চৌধুরী, আধুনিক উপন্যাসের একজন নায়ককে, যিনি দুই যুগের সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছেন বিচলিত ভঙ্গিতে। তাঁর আত্মদহন আরো তীব্র। ছবির কাছে এসেছে ছোট ভাই টিপু। আর আশফাক চৌধুরী? তারও রাতে ঘুম আসে না। একরাতে পাশের বিছানা থেকে ডেকে তোলেন স্ত্রীকে। কিন্তু স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলতে পারেন না। স্ত্রীও স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো উত্তর না পেয়ে বিস্ময়বোধ করেন। এক সময় অবশ্য বিস্ময় অন্তর্হিত হয়। বেদনার ভার তার বুকেও অনুভূত হয় কিন্তু আমরা দেখি, 'অতঃপর দুজন এক সঙ্গে জানালার বাইরে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে বসে থাকলেন চুপচাপ।'

পরবর্তী রাতে আশফাক চৌধুরী স্ত্রীকেও ডাকতে পারেন না। পঁয়ত্রিশ বছর হয় যার সঙ্গে সংসার বেঁধেছেন, তাকে নতুনভাবে বিবেচনা করেন। দেখেন, তিনি 'ভীষণভাবে ঠকে গেছেন।' এই মহিলা অন্য কারো সাথে যদি ঘর বাঁধত তাহলেও এভাবে সন্তান জন্ম দিত, ঘুমোতো, কিছু সামাজিক অনুশাসন, পারিবারিক অভ্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবন কাটিয়ে দিত। তেমনই এই স্ত্রী তাঁকে কিছু অভ্যাস ছাড়া আর কিছু দেয়নি। অন্তরের গভীরের তীক্ষ্ণ, তীব্র, সূক্ষ্ম যে একটি তৃষ্ণার্ত প্রত্যাশা আছে, সেদিকে চেয়েও দেখেনি। নিজের বেদনাকে তুলনা করলেন তিনি কন্যার বেদনার সাথে। কোনো একটা ভিত্তি ওপর তার প্রত্যাশা সে লালন করেছিল। সাধ লতিয়ে উঠেছিল, স্বপ্নপত্র নড়ে উঠেছিল। সেই স্বপ্ন পরিপূর্ণতা পায়নি। তবু তার তো অন্তত স্মৃতি আছে সেই স্মৃতির মধ্য দিয়ে, সেই ব্যথার ভেতর দিয়ে প্রতি মুহূর্তে সে অনন্তকে পাচ্ছে। আশফাক চৌধুরী দেখলেন তার কোনো স্মৃতি পর্যন্ত নেই যার মাধ্যমে তিনি অনন্তকে ছুঁতে পারেন। তবুও নিজের বেদনার সাথে কন্যার সেই ব্যর্থ বাসনাটি একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে। তারপর হৃদয়ে তিনি আরও ক্ষরণ অনুভব করেন। উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদের পুরোটিই আমরা তুলে দিচ্ছি–

> চোখের সামনে থেকে আলো নিভে আসতে থাকলে তিনি প্রাণপণে ডাকতে চাইলেন, পারলেন না। খাটের ওপরে শুয়ে থাকা আমেনা বেগমকে মনে হলো যোজন যোজন দূরে পড়ে থাকা একটি স্তূপের মতো। চেতনার প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে মনে হলো জ্যোৎস্না অন্ধকার হয়ে আসছে আর তার ভেতরে বহু দূরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়ে থাকা চোখের সামনের বস্তুটি সেই জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে!

এভাবে দেখি মাত্র দুটি দিনরাতের বর্ণনায় লেখক উপন্যাসোচিত একটি সামগ্রিক জীবনকে উপস্থাপন করলেন। উপসংহার তাঁর প্রকরণরীতিতে নেই। জীবনের আবার উপসংহার কী, বর্তমানতার মধ্য দিয়ে তার চলা। তবে হঠাৎ সে প্রচণ্ড বাঁক নিতে পারে, কারণ চেতনায় চলে নিত্য টানাপড়েন। এই চেতনার চিত্রাঙ্কনই কায়েসের শিল্পসূত্র। তাই তার ভাষা সূক্ষ্ম, গভীর, ইঙ্গিতময়। ঘটনা সাজানোয় কালক্ষেপণ করেন না, আলোক নিক্ষেপ করেন হৃদয়-প্রকোষ্ঠে। জীবনের অভিব্যক্তির সূত্রগুলো চেতনার বিশেষণেই পাওয়া যাবে; প্রতিপার্শ্বকে সেই-ই তৈরি করে। তাই জ্যোৎস্না হঠাৎই অন্ধকারে পরিণত হয়, ঘরের বাতাস অসমাপ্ত মনে হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসকে ট্রেনের শব্দের মতো ভারী-কর্কশ লাগে।

চেতনারাজ্যে আলোড়ন এত তীব্র হলে কী হয়? আশফাক চৌধুরীর কী হলো, জানাননি লেখক। আপাত অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটতে পারে, কায়েস আহমেদের আত্মহননের মতো। তাঁর চেতনার চিত্রটি আমরা পাইনি। তবে তাঁর রচনাসম্ভার আছে। একজন লেখক বলেছিলেন, কায়েস আহমেদের আত্মহত্যার সূত্র-সন্ধান তাঁর সাহিত্যের মধ্যেই করতে হবে। আমরাও তাই মনে করি। কারণ জীবন ও শিল্পে তিনি ছিলেন একাত্ম ও অকপট।

গল্প

ফেরারি বসন্তকে খুঁজে। কামাল বিন মাহতাব সম্পাদিত ছোটগল্পের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৬ থেকে ৮৯। এই সংখ্যায় প্রথম ও শেষ প্রচ্ছদে দুইভাবে তারিখ : বর্ষা ১৩৭৪, শ্রাবণ 1374। প্রথম প্রচ্ছদে উল্লিখিত : 'ছোটগল্প সমিতির প্রথম সংকলন', যা পরে আর কখনো উল্লেখ ছিল না। দাম : ১ টাকা।

'ফেরারি বসন্তকে খুঁজে' কায়েস আহমেদের সাহিত্যিকজীবনের একেবারেই প্রথম দিককার রচনা। মুদ্রিত গল্পে লেখকের নাম : কায়েস আহমদ। অর্থাৎ, তখনও তিনি আজকের পরিচিত নামে সাহিত্য রচনার ব্যাপারে স্থিরচিত্ত নন। আর, ছোটগল্প-এ এর পরের প্রায় এক যুগ অবিরাম লিখে যাওয়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, সম্পাদনা পর্ষদে যুক্ত হওয়ারও এই শুরু। (দ্র. কামাল বিন মাহতাব, 'চলে যাওয়া')।

ছোটগল্পে 'ফেরারী বসন্তকে খুঁজে'-তে ফেরারি বানান দীর্ঘ ঈ ছিল, এখানে হ্রস্ব করা হয়েছে। *সমকাল* ২ নভেম্বর ২০০৫ বিশেষ ঈদ আয়োজন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রতারক জোস্না। *ছোটগল্প*-এর সপ্তম সংকলন প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬ থেকে ২৩। প্রচ্ছদে এই সংখ্যার লেখকদের ছবি। সম্পাদকীয় নেই। নেই প্রকাশ তারিখও। আনুমানিক ১৩৭৫-এ প্রকাশিত। এই সংকলনে *ছোটগল্পের* পাঠ গৃহীত হয়েছে।

~ www.amarboi.com ~

'প্রতারক জোস্না' *কায়েস আহমেদ সমগ্রে* (১৯৯৩) গ্রন্থিত হয়েছে। জিয়া হাশান গ্রন্থিত *ছোটগল্পের নির্বাচিত সংকলনেও* (২০০৬) অন্তর্ভুক্ত। সেখানেও সম্পাদক সপ্তম সংকলন উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রকাশ সাল নেই।

অপূর্ণ তুমি ব্যর্থ বিশ্ব। *ছোটগল্প*-এর ৯ম সংকলনে বৈশাখ ১৩৭৭-এ প্রকাশিত। *ছোটগল্পে* এইটিই কায়েস আহমেদের শেষ প্রকাশিত গল্প। মৃত্যুর পরে তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ লিখেছিলেন কায়েস আহমেদ এই নামে প্রথম গল্প সংকলনের নাম স্থির করেছিলেন, পরে সিদ্ধান্ত বদল করেন। 'অপূর্ণ তুমি ব্যর্থ বিশ্ব' পরে দৈনিক *যুগান্তর* ১৫ জুন ২০০৭ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতীক্ষিত লণ্ঠন। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে।

নচিকেতাগণ। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬-তে *সচিত্র সন্ধানীর* সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত। এখানে নিজের গল্প সম্পর্কে তাঁর অভিমতও ছিল (দ্র. 'আমার লেখা')। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে।

পারাপার। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

নৈঃশব্দ্যের ভার। ঈদসংখ্যা *বোরবার* ১৯৮০-তে প্রকাশিত। এই সংখ্যায় আরও গল্প লিখেছিলেন : শওকত আলী, শহীদ আখন্দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, তাপস মজুমদার, বারেক আবদুল্লাহ, সৈয়দ ইকবাল। পরে দৈনিক *যুগান্তরের* ১৮ জুন ২০০৪ প্রকাশিত হয়েছে।

গোপাল কামারের তলোয়ার। বিজয় দিবস সংখ্যা *সংবাদ* ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০-এ প্রকাশিত *কায়েস আহমেদ সমগ্রে* (১৯৯৩) গ্রন্থিত। এখানে *সংবাদের* পাঠ গৃহীত হয়েছে।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

ক্ষুধার্ত জাগুয়ার। *ছোটগল্প* ৮ম সংকলন ১৩৭৬-এ প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৭। এটি শওকত আলীর প্রথম গল্পগ্রন্থ *উন্মূল বাসনার* আলোচনা। প্রকাশক : বইঘর, চট্টগ্রাম। দাম : ৪ টাকা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। একটি গ্রন্থের আলোচনা হলেও *ছোটগল্পে* এটি প্রবন্ধের গুরুত্বে মুদ্রিত হয়েছিল। এই সংকলনেও প্রবন্ধ হিসেবে মুদ্রিত হলো। *ছোটগল্পের* এই সংখ্যার সহযোগী সম্পাদক : কায়েস

~ www.amarboi.com ~

আহমেদ ও শাকের চৌধুরী ৮ম পৃষ্ঠায়: 'সদ্য প্রকাশিত জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের *সিতাংশু তোর সমস্ত কথা*, হাসান আজিজুল হকের *আত্মজা ও একটি করবী গাছ*, শওকত আলীর *উন্মূল বাসনা*, সিরাজউদ্দীন আহমেদের *বন্ধুর জন্য শোক*, আহমদ ছফার *নিহত নক্ষত্র*, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত নজরুল বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন *তোমার সাম্রাজ্যে*, *যুবরাজ* এবং আবুবকর সিদ্দিকের *ধবল দুধের স্বরগ্রাম*'-এর কলামব্যাপী বিজ্ঞাপন।

ডানের কলামে :

পূর্ব পাকিস্তানের নব সাহিত্যান্দোলনের এক জ্বলন্ত ফেস্টুন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গ্রহণ-আক্রান্ত সময়, যার নিষ্ঠুর বলাৎকারে ভেঙে পড়েছে আজন্ম কালের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ভালোবাসা।

চারিদিকে শুধু নৈরাশ্য, যন্ত্রণা, অবিশ্বাস, লোভ, পাপ, গ্লানি, বিক্ষোভ আর মৃত্যুর পাখোয়াজ।

নির্বাসিত একজন

সমকালীন জীবনের রক্তাক্ত মানচিত্র। খোকা, রফিক, নৃপেন, শঙ্কর, ধীরেনদা, কাশেম ভাই, নুরী, পিয়ারু ভাই, অজিত, রহমত ভাইয়া, রাবেয়া যেন একেকটি আতঙ্কিত দিগন্ত– ধূসর, নিঃসঙ্গ।

'নির্বাসিত একজন' আশাভঙ্গের ইতিহাস। ব্যর্থতার পাঁচালী। 'নির্বাসিত একজন' আগুন আর রক্তের আলপনা। কান্নার স্বরলিপি। দীর্ঘশ্বাসের সানাই।

তীক্ষ্ণ সামাজ সচেতন তরুণ কথাশিল্পী কায়েস আহমেদ-এর এই দুঃসাহসিক প্রথম উপন্যাস অচিরেই বেরুচ্ছে।

উল্লেখ্য, *নির্বাসিত একজন* প্রকাশিত হয়েছে এই বিজ্ঞাপনের প্রায় দেড় যুগ বাদে, ১৯৮৬-তে

ছোটগল্পের দুঃসময়। *ছোটগল্প* নবপর্যায়ে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৮০ : জানুয়ারি ১৯৭৪-এ প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮১ থেকে ৮৪। সম্পাদকীয় শেষে আন্ওয়ার আহমদ সম্পাদিত *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যা* ৩৮ বর্ষ : ১ম সংখ্যায় (২০০৩) মুদ্রিত। এখানে *ছোটগল্পের* পাঠ গৃহীত হয়েছে।

আমি ও আমার লেখা। ঈদসংখ্যা *সচিত্র সন্ধানী* ১৯৮৭-তে প্রকাশিত এই সংখ্যার অন্যান্য রচনা অংশে 'আমি ও আমার ছবি', 'আমি ও আমার লেখা', 'আমি ও আমার নাটক' এইসব বিষয়ে বিভিন্ন অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের মন্তব্য ছাপা হয়েছিল। 'আমি ও আমার লেখা'য় আরও ছাপা হয়েছিল : সৈয়দ শামসুল হক, হুমায়ূন আহমেদ, শওকত আলীর লেখা। কায়েস আহমেদের একটি হাস্যোজ্জ্বল ছবি ছাপা হয়েছিল এখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার লেখা। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬-তে *সচিত্র সন্ধানীর* সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প 'নচিকেতাগণ'-এর সঙ্গে এই লেখাটি লেখকের ছবিসহ অভিমত হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু *কায়েস আহমেদ সমগ্রে* (দ্র. পৃ. ২০১) লেখাটি গল্পের ভিতরে ঢুকে গেছে। দেখতে মনে হবে যেন গল্পের অংশ, কিন্তু পড়তে পরম্পরাহীন। দ্বিতীয় সংস্করণেও বদল করা হয়নি।

কঠিন মাটি ও শক্ত ফ্রেম। সুশান্ত মজুমদার সম্পাদিত *কায়েস আহমেদ : নিরাবেগ বোঝাপড়ায়* (১৯৯৪) প্রকাশিত। প্রকাশক : সন্দেশ, ঢাকা। প্রচ্ছদ : শিশির ভট্টাচার্য্য। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ হিসেবে সম্পাদক এই একটি লেখা এই সংকলনে গ্রন্থিত করেছেন। কোনো সূত্রের উল্লেখ করেননি।

নিজের সঙ্গে আলাপ। *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যায়* (২০০৩) প্রকাশিত।

লিটল ম্যাগাজিনের সমস্যা। *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যায়* (২০০৩) প্রকাশিত। এর আগে *রূপম* ডিসেম্বর ২০০২-এ বেরিয়েছিল। এখানে *রূপম : কায়েস আহমেদ* (২০০৩) সংখ্যার পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাসান আজিজুল হক। এ রচনাটির শিরোনাম : অন্য অবলোকন [হাসান আজিজুল হক]। সম্ভবত এটি *সংবাদে* (সংবাদ সাময়িকী) অন্য অবলোকন শিরোনামে কায়েস আহমেদের অনিয়মিত রচনাগুলোর একটি। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে

প্রতিকৃতি আত্মপ্রতিকৃতি। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে।

স্বপ্ন আশার আসমানদারী। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে।

শিল্পের দাবি, শিল্পীর দায়। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘূর্ণির টান ও নিরাবেগ বোঝাপড়া। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে।

সাহিত্যে বাস্তবতা। এটিও *সংবাদ সাময়িকীতে* কায়েস আহমেদের অনিয়মিত কলাম হিসেবে রচিত। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে।

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে।

গ্রন্থালোচনা

চাবি খুঁজছি গো মহারাজ। *ছোটগল্প* ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত। উল্লেখ ছিল : VOL. VI ও সুলভ সংখ্যা। সূচিপত্র ছিল না। আনুমানিক ১৩৭৬-এ এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ আলোচনাটি পৃষ্ঠা ৯৯ থেকে ১০৩ পর্যন্ত ; আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম গল্পগ্রন্থ *সত্যের মতো বদমাশের* আলোচনা প্রকাশক : পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন। প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা : গোলাম সরোয়ার এবং মুহম্মদ খসরু। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫। দাম : চার টাকা।

আত্মজৈবনিক প্রতিকৃতি। *ছোটগল্প* ৯ম সংকলন ১৯৭৭-এ প্রকাশিত পৃষ্ঠা ৮০ থেকে ৮৫। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গল্পগ্রন্থ *সিতাংশু, তোর সমস্ত কথার* আলোচনা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। বইঘর। চট্টগ্রাম। দাম : তিন টাকা।

'হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোন খানে'। *ছোটগল্প* ৯ম সংকলনে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬। 'আত্মজৈবনিক প্রতিকৃতি'র সঙ্গে টানা মুদ্রিত। ৮৫ পৃষ্ঠার মাঝখানে হঠাৎ বোল্ড হরফে শিরোনাম দিয়ে বিভক্ত পাদটীকায় উল্লিখিত এটি মুর্তজা বশীরের প্রথম গল্পগ্রন্থ *কাঁচের পাখীর গান*-এর আলোচনা প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। প্রকাশক : সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা। দাম : পাঁচ টাকা।

চলো যাই পরোক্ষে। *ছোটগল্প* ৮ম বর্ষ : ৩-৫ সংখ্যা, মার্চ-মে ১৯৭৪-এ প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮১ থেকে ৮৪। উল্লেখ্য, এটি সম্ভব ছিল *ছোটগল্পের* দ্বিতীয় পর্যায়। আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্পগ্রন্থ *চলো যাই পরোক্ষের* আলোচনা। প্রকাশক : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮+৮৭। দাম : পাঁচ

আমার বই
মুক্তির পথের এক ঠিকানা

~ www.amarboi.com ~

টাকা। *ছোটগল্পের* এ সংখ্যায় আরও মুদ্রিত হয়েছিল কায়েস আহমেদের নেয়া হাসান আজিজুল হকের সাক্ষাৎকার।

কবিতা

বোঝাপড়া। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* (১৯৯৩) পাঠ গৃহীত হয়েছে আন্ওয়ার আহমদ সম্পাদিত *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যায়* (২০০৩) মুদ্রিত হয়েছে। রচনাকাল : দুপুর/ ১৪. ২. ৮০।

বউ। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* পাঠ গৃহীত হয়েছে। *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যায়* (২০০৩) মুদ্রিত। রচনাকাল : রাত/ ৩১ শে জুলাই '৮০।

চোখ। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* পাঠ গৃহীত হয়েছে। *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যায়* (২০০৩) মুদ্রিত। রচনাকাল : রাত/ ৩১ জুলাই। সাল অজ্ঞাত।

পাখিরা সব জানে। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* পাঠ গৃহীত হয়েছে। *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যায়* (২০০৩) মুদ্রিত।

কাকে খোঁজো। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* পাঠ গৃহীত হয়েছে। *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যায়* (২০০৩) মুদ্রিত।

নিজের সঙ্গে কথা। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* পাঠ গৃহীত হয়েছে *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যায়* (২০০৩) মুদ্রিত

দ্বৈরথ। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* পাঠ গৃহীত হয়েছে। *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যায়* (২০০৩) মুদ্রিত।
দুপুর। *কায়েস আহমেদ সমগ্রের* পাঠ গৃহীত হয়েছে। *রূপম : কায়েস আহমেদ সংখ্যায়* (২০০৩) মুদ্রিত

কুষ্ঠব্যাধি। প্রকাশ কাল ও সাময়িক পত্রের নাম অজ্ঞাত। কায়েস আহমেদের আত্মীয় বেলায়েত হোসেন নীলু ও কায়েস আহমেদের একমাত্র পুত্র অনীক আহমেদের সূত্রে প্রাপ্ত।

~ www.amarboi.com ~

গৃহীত সাক্ষাৎকার

রংরাজ ফেরে না। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের সাক্ষাৎকার *ছোটগল্প* ৮ম সংকলন মাঘ ১৩৭৬-এ প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৭ থেকে ৬৭ এর আগে একটি নম্বরহীন আলাদা পৃষ্ঠায় জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের ছবিসহ পরিচিতি : 'তা'ঠিকই রংরাজরা সব আকাশে পালাচ্ছে! একজন না হয় খোঁয়াড়ে বসে জাবর কাটছে। আরগুলো তো পালালো। আর যে আছে সে-ও তো পালাবেই এদের কাছ থেকে আসলে দড়ি খোলা রংরাজ নাকি আর ফেরে না!'

এরপর পাঞ্জাবি পরিহিত জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের পাসপোর্ট-সাইজ ছবি

'জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। জন্ম : ১৯৩৯, বগুড়া। পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক গল্পান্দোলনের এক স্বাতন্ত্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *দুর্বিনীত কাল* ; *বহে না সুবাতাস* ; *সীতাংশু, তোর সমস্ত কথা*। সাংবাদিকতার ওপর পড়াশোনার জন্যে সম্প্রতি তিনি আমেরিকা গেছেন। গত ৬ই সেপ্টেম্বর *ছোটগল্পের* পক্ষ থেকে বর্তমান সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন কায়েস আহমেদ।'

অন্ধকারে ঘোড়সওয়ার। শওকত আলীর সাক্ষাৎকার। *ছোটগল্প* ৯ম সংকলন ১৩৭৭-এ প্রকাশিত। সহকারী সম্পাদক : কায়েস আহমেদ ও শাকের চৌধুরী। ৩৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ৩৭ পৃষ্ঠায় শওকত আলীর পাসপোর্ট-সাইজ ছবিসহ পরিচিতি : 'তার শিথিল অবশ শরীর এবং ছিন্নভিন্ন দমবন্ধ অনুভূতি ঘিরে চেতনার শেষ প্রান্তে শুধু জেগে থাকে সেই ইচ্ছেটা– কখন একবার ঘর ছেড়ে বাইরে যাবে। বাইরে নিশ্চয় অনেক স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা বেগবান বাতাস বয়ে যাচ্ছে।'

শওকত আলী। জন্ম : ১৯৩৬, পশ্চিম দিনাজপুর। পঞ্চাশ এবং ষাট দশকের ক্রান্তিলগ্নে তিনি মঞ্চে এসেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *পিঙ্গল আকাশ* (উপন্যাস), *উন্মূল বাসনা* (গল্পগ্রন্থ) *অন্ধকারের ঘোড়সওয়ার* (প্রকাশিতব্য গল্পগ্রন্থ)। ছোটগল্পের জন্যে সম্প্রতি তিনি বাঙলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে জগন্নাথ কলেজে বাঙলার অধ্যাপক।' ৩৮ পৃষ্ঠা ফাঁকা।

অফুরন্ত অন্ধকারে মরাচাঁদ। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সাক্ষাৎকার। *ছোটগল্প* প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা কার্তিক ১৩৭৭ : নভেম্বর ১৯৭০-এ প্রকাশিত। সম্পাদকীয় নেই। লক্ষ করার বিষয়, এ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে, 'প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা কার্তিক ১৩৭৭'! কেন এমন মুদ্রিত হলো, তা আজ আর জানার ও বোঝার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপায় নেই। বর্ষা ১৩৭৪-এ যে সাময়িকপত্রের সূচনা, তাতে তিন বছর পরে আবার কেন প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত ?

সাক্ষাৎকারটি মুদ্রিত হয়েছে ১৪ থেকে ২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ১৪ পৃষ্ঠায় বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ছাবিসহ পরিচিতি : 'শিল্পীর জ্ঞান দিয়ে আমি সময়কে বুঝতে চাই। সময় যে-সব ঘটনার গাঁথা তার স্বরূপ আর জিজ্ঞাসা আমার কাছে যেন গভীরভাবে উন্মোচিত হয়ে ওঠে।'

এরপর ছবি, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর লিখছেন ; এমন ভঙ্গি।

'বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। জন্ম : ৯ই জানুয়ারী ১৯৩৬, গুলবাহার (কুমিল্লা)। পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক গল্পের অন্যতম পথিকৃত। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : *অবিচ্ছিন্ন* (১৯৬০) *দূর দূরান্ত* (১৯৬৮), *বিশাল ক্রোধ* (১৯৭০)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীরূপে জীবন অতিবাহিত ক'রে এখন শুধুমাত্র সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত।'

ক্ষমাহীন বিশ্বের স্থপতি। হাসান আজিজুল হকের সাক্ষাৎকার। ৮ম বর্ষ : ৩-৫ সংখ্যা : মার্চ-মে ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ২৫ থেকে ৩৪। এ সংখ্যায় হাসান আজিজুল হকের ছবি ব্যবহৃত হয়নি। ১৯৯৫-এ সিলেট থেকে প্রকাশিত *প্রতিশ্রুতি* প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় শুভেন্দু ইমাম এটির পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। এরপর দৈনিক *যুগান্তরে* ১৮ জুন ২০০৪ প্রকাশিত হয়েছে। *ছোটগল্পের* এই সংখ্যার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন : কায়েস আহমেদ, শাকের চৌধুরী, আলমগীর রহমান। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কন : আবুল মনসুর। আরও যা উল্লেখ ছিল : দামের ক্ষেত্রে— প্রতি সংখ্যা দুই টাকা আর, বিজ্ঞাপনের পরে আখ্যাপত্রের আগে পৃষ্ঠা ৬-এ উল্লেখ ছিল নিয়মাবলি ও বিজ্ঞাপনের হারসহ *ছোটগল্পের* সম্পাদকীয় কিছু নীতি। শুধু গল্পকে কেন্দ্রে রেখে একটি সাময়িক পত্রকে টিকিয়ে রাখার এই প্রচেষ্টাও এক প্রকার লড়াই। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে তা উদ্ধৃত করা হলো :

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

নিয়ামাবলী

ছোটগল্প মূলতঃ মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হলেও কাগজ, বিজ্ঞাপন, প্রেস ইত্যাদির সংকট ও কতিপয় বাস্তব অসুবিধার জন্য বর্তমানে এ পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না।

গল্প চর্চায় স্বাধীন ক্ষেত্র হিসেবে আত্মবিশ্বাসী তরুণ গল্পকারদের জন্য এ-পত্রিকার দ্বার অবারিত। মনোনীত রচনা যে-কোনো সংখ্যায় প্রকাশিত হতে পারে। অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিলিপি রেখে গল্প পাঠানোই শ্রেয়।

প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র আমরা নিজেদের উদ্যোগেই দিয়ে থাকি।

বিজ্ঞাপন ও এজেন্সী সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য যথাক্রমে সম্পাদক ও পরিবেশকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ভি. পি.-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৩/১২, জনসন রোড, (২-তলা) ঢাকা ১
ফোন : ২৫০৭০২

বিজ্ঞাপনের হার

৪র্থ প্রচ্ছদ (২ রঙে)	৫৫০.০০
৪র্থ প্রচ্ছদ (সাধারণ)	৫০০.০০
২য় প্রচ্ছদ ( )	৩৫০.০০
৩য় প্রচ্ছদ ( )	৩০০.০০
১ম পাতায়	৩০০.০০
সূচীপত্রের বিপরীতে	৩০০.০০
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫০.০০

বিশেষ ব্যবস্থা

বাৎসরিক চুক্তিভুক্ত বিজ্ঞাপনের জন্য ২০% হারে রেয়াত দেয়া হয়

বই, পত্র-পত্রিকার জন্য ১৫% হারে রেয়াত দেয়া হয়।

বিজ্ঞাপন এজেন্সী সমূহকে ১৫% হারে কমিশন দেয়া হয়। যে কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ অথবা বাতিলের সম্পাদকীয় অধিকার সংরক্ষিত।

ছোটগল্পের চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সৈয়দ ইকবাল
১০৮২, ধনিয়ালা পাড়া, ঢাকা ট্রাংক রোড, চট্টগ্রাম

একমাত্র পরিবেশক
বর্ণবীথি প্রকাশন
৩/৩ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা ২

আমার বই
পুস্তকের পাঠক এক হও